বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার
[২১ ও ২২তম খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী শিহাবুদ্দীন খান

প্রথমরেখ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারী : ২০১৮
প্রকাশক	মাওলানা শহীদুল ইসলাম দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল	০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : 500 ...
500 ...

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-২১

- خوف (ভয়) خشيت (শঙ্কা) ও خشوع (বিনয়)
- এর স্বরূপ /২৫
- দীনের দাওয়াতের স্তর /৭৯
- আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন /১৪৩
- ফেতনা থেকে বাঁচব কীভাবে /১৯৩

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-২২

- আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট /২৩১
- আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া /২৭৩
- আল্লাহর ভয়ে কাঁদা /৩১৫
- পরিপূর্ণ বিশ্বাসের গুরুত্ব /৩৪৩
- অধিক পরিমাণে যিকির করার উপকারিতা /৩৭৭
- তাছাওউফ ও সুলুক /৪০৫

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-২১

خوف (ভয়) خشیت (শঙ্কা) ও خشوع (বিনয়) এর স্বরূপ /২৫
তিনটি সমার্থবোধক শব্দ /২৫
خوف ভয়, خشیت আশঙ্কা, خشوع বিনয় সবকটির মধ্যকার পার্থক্য /২৭
خشوع এর স্তর /২৯
পবিত্র কুরআনে خشوع শব্দের ব্যবহার /২৯
উম্মতের বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে বিনয় /৩২
خشیت এর স্তর /৩৩
পবিত্র কুরআনে خشیت শব্দ /৩৩
علم ও خشیت /৩৪
হাদীছের আলোকে خشیت /৩৫
বিজ্ঞ মনীষীদের দৃষ্টিতে خشیت/৩৭
চিন্তা ও ভয় /৩৮
خوف এর স্তর /৩৮
একটি ইল্‌মি সূক্ষ্মতা /৩৯
কুরআন তেলাওয়াতের সময় অবস্থা কেমন হওয়া উচিত /৩৪১
আল্লাহওয়ালাদের কুরআন তেলাওয়াতের ধরন /৪৪
ভয়ের মধ্যে কল্যাণ /৪৬
ভয়কারীদের নিদর্শন /৪৭
ভীতদের অবস্থা /৪৯
خوف-এর স্তরসমূহ /৫১
ভয়-এর ফলাফল /৫৩
সাহাবায়ে কেরামের ভয় /৫৪
হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভয় /৫৭
হযরত ওছমান (রাযি.)-এর ভয় /৫৮
হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.)-এর ভয় /৬০
হযরত আবুযর গিফারি (রাযি.)-এর ভয় /৬০

হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর ভয় /৬১
হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)-এর ভয় /৬১
হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.)-এর ভয় /৬২
হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-এর ভয় /৬২
হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-এর ভয় /৬৩
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ভয় /৬৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.)-এর ভয় /৬৫
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর ভয় /৬৫
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর ভয় /৬৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ভয় /৬৬
হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযি.)-এর ভয় /৬৬
হযরত ফুজালা ইবনে উবায়েদ (রাযি.)-এর ভয় /৬৭
হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর ভয় /৬৭
তাবেয়ীগণের ভয় /৬৯
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভয় /৭১
নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের ভয় /৭১
নবীজির ভয় /৭২
হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ভয় /৭২
কান্না জরুরি /৭৩

দীনের দাওয়াতের স্তর /৭৯
তিন প্রকারের মানুষ /৭৯
বিবেকের পরিধি /৮০
দুনিয়া হচ্ছে উপকরণের ঘর /৮১
আল্লাহ সমস্ত উপকরণের মূল /৮৩
উপকরণ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর সত্তার ওপর ভরসা করা /৮৪
সফলতা ও সম্মান আল্লাহর আদেশের ওপর নির্ভরশীল /৮৫
আল্লাহর নেয়ামতের প্রাচুর্য তাঁর সন্তুষ্টির দলিল নয় /৮৬
দার্শনিক সূক্ষ্মতা /৮৭
শাস্তি ও পরীক্ষা /৮৮
এই উম্মতের ওপর পরীক্ষা এসেছে অধিক /৮৯
আল্লাহর সন্তুষ্টি সবকিছুর উর্ধ্বে /৮৯
আল্লাহর সাহায্য সবচেয়ে ভারী /৯০

যেমন কর্ম তেমন ফল /৯০
সাহাবাগণের ঈমানের ওপর নবীজির মেহনত /৯৫
যুদ্ধের ময়দানে সাহাবায়ে কেরামের প্রশিক্ষণ /৯৬
বদর যুদ্ধের শিক্ষা /৯৬
উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা /৯৮
খন্দক যুদ্ধের শিক্ষা /৯৯
হোদাইবিয়ার সন্ধির শিক্ষা /১০০
হোনাইন যুদ্ধের শিক্ষা /১০১
সাহাবায়ে কেরামের যুগ উম্মতের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত /১০২
হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর যুগ,/১০২
হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগ /১০৪
হযরত ওছমান (রাযি.)-এর যুগ /১০৫
হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগ /১০৭
সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যের মধ্যে উম্মতের শিক্ষা /১০৮
সরকারি দল ও বিরোধী দলের জন্য শিক্ষা /১০৯
গবেষকদের জন্য শিক্ষা /১০৯
জাতির নেতৃস্থানীয়দের জন্য শিক্ষা /১০৯
মান্যবর ওলামায়ে কেরামের জন্য শিক্ষা /১১০
জাতীয় কল্যাণের ব্যাপারে শিক্ষা /১১০
শরীয়তের মেজাজ ও সীমারেখা /১১১
ওলামায়ে কেরাম ও দাওয়াতে দীন /১১১
দাওয়াতে দীনের স্তর /১১২
প্রথম স্তর : দাওয়াতের বিদ্যমানতা /১১২
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের ধরন /১১৩
দ্বিতীয় স্তর : প্রশিক্ষণের অবকাশ /১১৫
আগেকার উম্মতদেরও পরীক্ষা করা হয়েছে /১১৬
তৃতীয় স্তর : আল্লাহর সাহায্য /১১৬
চতুর্থ স্তর : আল্লাহর শক্তি /১১৭
কুরবানির গুরুত্ব /১১৯
গ্রহণযোগ্যতার পাঁচটি অবস্থা /১২০
পর্যবেক্ষণ ও ঈমানের পার্থক্য /১২১
দাওয়াতদাতার রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে /১২৩
জান্নাত পবিত্র লোকদের জন্য /১২৫

দীনের দাওয়াত ঘর থেকে আরম্ভ করবেন /১২৬
দীন বুদ্ধিতে নয়– বর্ণনায় বিস্তার হয় /১২৬
দীনের দাওয়াত ও হিংসুকের দল /১২৭
আমাদের পূর্বপুরুষদের কুরবানির দৃষ্টান্ত /১২৭
হযরত কা'ব (রাযি.)-এর ঘটনার প্রশিক্ষণমূলক প্রেক্ষাপট /১২৭
শরীয়তের ওপর অটল থাকাও দাওয়াত /১৩৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর দৃঢ়তা /১৩৬
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.)-এর দৃঢ়তা /১৩৭

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন /১৪৩
পার্থিব সম্পর্কের ভিত্তি উদ্দেশ্যের ওপর /১৪৩
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক /১৪৩
ছাত্র ও ওস্তাদের সম্পর্ক /১৪৪
ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক /১৪৪
মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক /১৪৪
বন্ধুত্বের সম্পর্ক /১৪৪
পীর ও মুরীদের সম্পর্ক /১৪৪
দুটি উদ্দেশ্যহীন সম্পর্ক /১৪৫
পার্থিব ভালোবাসার অবস্থা /১৪৬
আল্লাহর ভালোবাসার অবস্থা /১৪৭
স্রষ্টাও সৃষ্টির ভালোবাসার পার্থক্য /১৪৮
মহব্বতের দলিল /১৫১
আল্লাহর বন্ধু কে? /১৫২
আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলাফল /১৫৪
এক তওবাকারীর মাথার ওপর রহমতের ছায়া /১৫৫
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর ফরমান /১৫৭
আল্লাহর জিম্মাদারি /১৫৮
আল্লাহর হেফাযতের অদ্ভুদ ঘটনা /১৫৯
রিযিকে বরকত /১৬০
বেবরকতির দৃষ্টান্ত /১৬০
কুরআনের ঘোষণা /১৬১
বরকতের দৃষ্টান্ত /১৬১
সূক্ষ্ম বিষয় /১৬৪

আল্লাহর ওকালতি /১৬৫
চিন্তার মাঝে সান্ত্বনা /১৬৭
জান ও মালের সংরক্ষণ /১৭০
ইবরাহীম (আ.)কে আগুন থেকে সংরক্ষণ /১৭২
সম্মানের হেফাযত /১৭৩
সাহায্য ও সহায়তা /১৭৩
আল্লাহর সাহায্যের অবস্থা /১৭৪
সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ /১৭৬
দু'আ কবুল হয় /১৭৬
মাখলুকের অন্তরে তার ভয় ঢেলে দেওয়া /১৭৭
বাদশাহ আল্লাহওয়ালাদের খাদেম /১৭৭
সৃষ্টিজীব তার অনুগত হয়ে যায় /১৭৮
স্বজন ও প্রিয়জনের ওপর রহমত /১৮০
মৃত্যুর সময় উত্তম আচরণ করা হবে /১৮১
হাশর দিনের অভ্যর্থনা /১৮২
বিনা হিসাবে জান্নাত দেবেন /১৮২
বংশধরদের সঙ্গে বিশেষ নমনীয়তা /১৮৪
জান্নাতে আপ্যায়ন করা হবে /১৮৫
বন্ধুর সন্তুষ্টি /১৮৬
দিদারে এলাহী /১৮৬
আল্লাহ বন্ধুত্ব পূর্ণ করেন /১৮৮
প্রশিক্ষণের মজলিসের অর্জন /১৮৯

ফেতনা থেকে বাঁচব কীভাবে /১৯৩
ইসলাম সর্বশেষ ধর্ম /১৯৩
দীন হেফাযত করা ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব /১৯৩
দীনের শাখা ৪টি /১৯৪
খোলাফারে রাশেদীনের আমলে দীনের প্রচার-প্রসার /১৯৫
মুহাদ্দিছীন ও ফুকাহায়ে কেরামের যুগ /১৯৫
সূফী-সাধকদের যুগ /১৯৬
যুগের বাদশাহগণ মাশায়েখগণের দরজায় /১৯৭
হযরত আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)-এর সঙ্গে
মাহমুদ গজনবি (রহ.)-এর মহব্বত /১৯৭
সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুমিশ ও খাজা কুতুবুদ্দীন

বখতিয়ার কাকি (রহ.) /২০০
বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগির ও
খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রহ.) /২০১
একটা অভ্যন্তরীণ ফেতনা আকবরি ধর্ম /২০২
ফেতনার দ্বার বন্ধ হলো কীভাবে? /২০৩
বহিরাগত ফেতনা ইংরেজদের আধিপত্য /২০৪
ইংরেজদের প্রথম চাল /২০৪
ওলামায়ে কেরামের আন্দোলন /২০৫
ওলামায়ে দেওবন্দের ত্যাগ /২০৫
ইংরেজদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ /২০৭
বহিরাগত ফেতনার খারাপ প্রভাব /২১০
দাওয়াতের কাজ শুরু হলো কীভাবে /২১১
হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সোনালি বাণী /২১২
দু-প্রকারের মানুষ /২১৩
সাইবার ফেতনা একটা আন্তর্জাতিক ফেতনা /২১৩
সাইবার ফেতনার হাতিয়ার দুটি /২১৩
মুসলমানদের ঈমানবিধ্বংসী প্রথম হাতিয়ার ইন্টারনেট /২১৩
দ্বিতীয় হাতিয়ার সেলফোন /২১৪
গুগলের অনুসারী /২১৫
তিন মহিষের কাহিনি /২১৬
ঈমানের আত্মসম্ভ্রম বাকি রয়েছে /২১৭
যুবকের দাদির জন্য অদ্ভুত দু'আ /২১৭
বৈশ্বিক ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় কী? /২১৮
সূরা কাহ্‌ফের শিক্ষা /২১৮
মক্কা-মদিনার গুহা /২১৯
মাদরাসার গুহা /২১৯
তাবলীগ জামাতের গুহা /২১৯
খানকার গুহা /২২০
মাদরাসার ছাত্রদের সৌভাগ্য /২২০
ইল্‌ম না থাকা এটিও একটি গুণ /২২২
দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা খেলাফতের দায়িত্ব /২২২
দুই প্রকারের সৈনিক /২২৩
সকল শাখার উদ্দেশ্য এক /২২৪
ছাত্রদের প্রতি উপদেশ /২২৪

খুতুবাতে যুলফিকার-২২

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট /২৩১
তোমার শক্তি পবিত্র /২৩১
আল্লাহ সবচেয়ে বড় /২৩২
আগুনের শক্তি /২৩২
পানির শক্তি /২৩৩
বাতাসারে শক্তি /২৩৩
মাটির শক্তি /২৩৪
আল্লাহর ইচ্ছা সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ /২৩৪
মুশরিক ও অহংকারীদের পরিণাম /২৩৫
আল্লাহর মাহাত্ম্যের সামনে জিবরাঈল (আ.)-এর অবস্থান /২৩৬
একটি আশ্চর্য বিষয় /২৩৭
অধিক পরিমাণে যিকির করার উদ্দেশ্য /২৩৭
আল্লাহর রেজিস্ট্রার্ড বান্দা হয়ে যাও /২৩৮
প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর ওপর দৃষ্টি রাখা চাই /২৩৮
আল্লাহ অবস্থা পরিবর্তনকারী /২৩৯
অসহায় অবস্থায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি /২৪০
আল্লাহর প্রতি হযরত নূহ (আ.)-এর দৃষ্টি /২৪০
বনী ইসরাইল ও আল্লাহর অনুকম্পা /২৪২
আল্লাহর প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টি /২৪৩
হযরত মূসা (আ.) ও আল্লাহর হেফাযত /২৪৭
শেষ নবী ও আল্লাহর হেফাযত /২৪৮
সত্য প্রভুর সত্য ওয়াদা /২৫০
ইয়ারমুকের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য /২৫২
বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য /২৫৩
শাহনামায়ে ইসলাম /২৫৪
আহযাব যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য /২৫৬
আমাদের জন্য এক আল্লাহই যথেষ্ট /২৫৭
আল্লাহর সিদ্ধান্ত /২৫৮

আল্লাহর কাছে চাওয়ার পদ্ধতি /২৫৯
ফজরের সুন্নতের ওপর তিনটি পুরস্কার /২৬০
সারা দিন আল্লাহর সাহায্য অর্জন করার আমল /২৬১
ফরজের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া /২৬১
নফলের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া /২৬২
এরপরও পেছনে থাকছ কে? /২৬৪
হে মালিকের পথভোলা ব্যক্তি; একটু শোনো /২৬৪
সফলতার মাত্র একটি রাস্তা /২৬৫
আল্লাহর বন্ধু হওয়ার ফায়দা /২৬৬
একটি প্রশংসনীয় বাক্য /২৬৭
দশটি শব্দ পাঠকারীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট /২৬৭
আমার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট /২৬৯
প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো /২৬৯
শৈশবের সবক /২৭০

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া /২৭৩

قبول শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ /২৭৩
কোনো বস্তু পছন্দ হওয়ার সাধারণ কারণ /২৭৩
গুণে ত্রুটি হলেও পছন্দ হয় /২৭৪
আমাদের আমল কি গ্রহণযোগ্যতার উপযোগী? /২৭৪
হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)-এর ব্যাখ্যা /২৭৮
ইবাদত করার হক /২৭৯
শান অনুযায়ী ইবাদত না করলে প্রতিদান হবে কীভাবে? /২৮০
মুক্তির ভিত্তি আল্লাহর রহমত /২৮০
আল্লামা ইবনে জাওযি (রহ.)-এর ব্যাখ্যা /২৮১
একটি মারফু হাদীছ দ্বারা সত্যায়ন /২৮২
বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সামঞ্জস্য /২৮৪
আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার আলামত /২৮৫
আমল গ্রহণ হওয়ার জন্য নবীগণের চিন্তা /২৯১
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আমল কবুল না হওয়ার ভয় /২৯৩
হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযি.) /২৯৪
হযরত ওমর (রাযি.) /২৯৭
হযরত ওছমান (রাযি.) /২৯৮

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) /২৯৯
হযরত আবুযর গেফারি (রাযি.) /৩০০
হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রাযি.) /৩০১
হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) /৩০১
হযরত হুয়ায়ফাতুল ইয়ামান (রাযি.) /৩০২
হযরত হাসান (রাযি.) /৩০২
হযরত আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম
হযরত সালিম (রাযি.) /৩০৩
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) /৩০৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) /৩০৫
হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) /৩০৬
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) /৩০৭
হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযি.) /৩০৭
হযরত মু'আজ বিন জাবাল (রাযি.) /৩০৮
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) /৩০৯
হযরত ফুজালা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযি.) /৩০৯
পছন্দ হওয়ার দু'আ /৩১০
অপরাধী ও বৃদ্ধরা নিরাশ হবেন না /৩১০
তোমার একটা পলকের ব্যাপার /৩১০

আল্লাহর ভয়ে কাঁদা /৩১৫
بكاء এর আভিধানিক অর্থ /৩১৫
কান্নার বিধান /৩১৯
ওই ব্যক্তির কল্যাণ হোক /৩১৯
সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন দিন /৩২০
জাহান্নাম থেকে নিরাপদ দুটি চোখ /৩২০
কান্না আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কেন? ৩২১
আল্লাহর খাজানায় চারটি বস্তুর স্বল্পতা /৩২১
ঝরনা ও চোখের পানির মধ্যে পার্থক্য /৩২২
হৃদয় কীভাবে ধৌত করা যায় /৩২৩
আল্লাহর জন্য কান্নার ফযিলত /৩২৩
দুটি প্রিয় ফোঁটা ও দুটি প্রিয় চিহ্ন /৩২৪
চোখ প্রবাহিত হবে; হৃদয় অস্থির হবে /৩২৪

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল সুন্নত /৩২৫
জাহান্নাম থেকে কীভাবে বাঁচব /৩২৫
ক্রন্দনকারী একজন; মুক্তি সকলের! /৩২৬
অনুতপ্তের অশ্রুর ওজন /৩২৭
অধিক হাসার নিন্দা /৩২৭
তিনটি চোখ কেয়ামতের দিন কাঁদবে না /৩২৮
অন্তর বিনষ্ট হওয়ার কারণ তিনটি /৩২৮
আল্লাহওয়ালাদের উপদেশের প্রভাব /৩২৮
নিষ্ঠার সাথে ক্রন্দকারী এমন ছিলেন /৩২৯
সূর্যগ্রহণের নামাযে নবীজির কান্না /৩২৯
রহমতের নবী পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন! /৩৩০
কান্নার তিন কারণ /৩৩০
কান্নার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের উক্তি /৩৩১
চিন্তাগ্রস্তদের আলামত /৩৩২
একটিমাত্র বাক্যের মাধ্যমে যুবকের পরিশুদ্ধি /৩৩৩
আল্লাহর অভিযোগ /৩৩৩
কান্নার একটি আশ্চর্য কারণ /৩৩৪
হৃদয়কাঁপানো একটি বর্ণনা /৩৩৫
আল্লাহর অদৃশ্য গ্রেফতারি থেকে বাঁচার চিন্তা /৩৩৫
জিবরাইল (আ.)-এর অস্থিরতা /৩৩৫
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অস্থিরতা /৩৩৭
হযরত ওমর (রাযি.)-এর অস্থিরতা /৩৩৭
কেয়ামতের দিন মানুষের স্ক্যানিং /৩৩৭
একটি অদ্ভুত সুপারিশ /৩৩৮
আজ গোনাহের ওপর কেঁদে নাও /৩৩৯

পরিপূর্ণ বিশ্বাসের গুরুত্ব /৩৪৩
আল্লাহর রীতি ও তাঁর শক্তি /৩৪৩
উপকরণ ও উপকরণের সত্তার ওপর ভরসাকারী /৩৪৪
বাহ্যিক উপকরণ বরতনের মতো /৩৪৫
অপমানের চিত্রে সম্মানের সিদ্ধান্ত /৩৪৬
সম্মানের চিত্রে অপমানের সিদ্ধান্ত /৩৪৬
দুধের দ্বারা সুস্থতা ও মৃত্যু /৩৪৭

আরোগ্য আল্লাহর হুকুমে পাওয়া যায় /৩৪৭
নবীগণের পথ সম্মানের পথ /৩৪৭
হযরত আলী (রাযি.)-এর বিশ্বাস /৩৪৮
শরীয়তের বিধানে উপকার আর উপকার /৩৪৮
ভয় নবুওতের পরিপন্থী নয় /৩৪৯
আল্লাহর প্রতি হযরত ওমর (রাযি.)-এর বিশ্বাস /৩৫১
বদর যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সাহায্য /৩৫২
অজেয় দুর্গের বিজয় /৩৫৪
শোনা পথেই সফলতা /৩৫৬
জনৈক তাবেয়ীর বিশ্বাস /৩৫৯
বিশ্বাস অর্জনের জন্য মেহনত জরুরি /৩৬০
দুটি অমূল্য কথা /৩৬০
যেমন কর্ম তেমন ফল /৩৬৭

অধিক পরিমাণে যিকির করার উপকারিতা /৩৭৭
অধিক পরিমাণে যিকিরের নির্দেশের রহস্য /৩৭৭
অপাত্রে অভিযোগ /৩৭৮
চিন্তার পঙ্কিলতা কীভাবে দূর করা যায় /৩৭৯
কল্যাণ সংগ্রহ করার জন্য অন্তরের যোগ্যতা অর্জনের নিয়ম /৩৭৯
নকশবন্দি তরিকা অবশ্যই পৌঁছানেওয়ালা /৩৮২
প্রাথমিক অবস্থায় আমল ও অযীফার অবস্থা /৩৮৩
আল্লাহর ভালোবাসা পরিমাপের বাটখারা /৩৮৪
মোরাকাবার জন্য সময় নির্ধারণ করা জরুরি /৩৮৪
বিভিন্ন ধারণার উদ্রেক হলে ঘাবড়াবে না /৩৮৫
চামড়ার কোমলতা ও হৃদয়ের কোমলতা /৩৮৬
অধিক পরিমাণে যিকিরের প্রভাব /৩৮৭
কারামাতের অবস্থা /৩৮৯
যিকিরের গুরুত্ব বোঝো /৩৮৯
যিকিরের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা আবশ্যক /৩৮৯
মোরাকাবা কেন করা হয়? /৩৯০
যিকিরের বিশেষ দুটি উপকার /৩৯১
মাশায়েখে এযাম ও অধিক পরিমাণে যিকির /৩৯২
মাশায়েখে কেরামের নির্জনতার জিন্দেগি /৩৯২

মোরাকাবা সর্পদংশনের খাঁটি প্রতিষেধক /৩৯৩
যিকির কখন থেকে চলে আসছে? /৩৯৩
মনের চোখ খোলো বাবা! /৩৯৪
খোলাফায়ে রাশেদীন ও সারাক্ষণ যিকির /৩৯৪
খেলাফতের ধারাবাহিতার মধ্যে ওলামায়ে কেরামের দলিল উত্থাপন /৩৯৬
আল্লাহর স্মরণে সবকিছু ভুলে যাও /৩৯৭
আল্লাহর ভালোবাসায় অস্থিরতা জরুরি /৩৯৭
সম্পর্কের পরিবর্তনও আত্মশুদ্ধি /৩৯৮
বর্তমান যুগের আশেকের অবস্থা /৩৯৯
মাশায়েখগণ থেকে তাওয়াজ্জুহ্ গ্রহণের পদ্ধতি /৩৯৯
হযরত মনি শাহ (রহ.) ও আল্লাহর যিকির /৪০০
আমরাও এমন যিকির করব /৪০১

তাছাওউফ ও সুলুক /৪০৫
প্রত্যেক ফুলের রং ও সুবাস ভিন্ন /৪০৫
ভালো-মন্দের পরিবেশ /৪০৫
পরিবেশের প্রভাব /৪০৫
দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধিসমূহ /৪০৭
দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসাসমূহ /৪০৭
দৈহিক ও আত্মিক রোগ-ব্যাধির ওপর পুস্তকাদি /৪০৭
চিকিৎসার প্রয়োজন ও গুরুত্ব /৪০৭
দৈহিক ও আত্মিক চিকিৎসার পদ্ধতি /৪০৯
দৈহিক ও আত্মিক খাবারসমূহ /৪০৯
সঠিক চিকিৎসা না করার ক্ষতি /৪০৯
শারীরিক ও আত্মিক রোগের লক্ষণ /৪১০
ওস্তাদহীন ভিত্তিহীন /৪১১
তাছাওউফ কি বিদয়াত? /৪১১
আত্মার ব্যাধির কুরআনি প্রেসক্রিপশন /৪১২
রুহানি ব্যাধিসমূহের হাকীকত /৪১৪
ফিকহে যাহের ও ফিকহে বাতেন /৪১৭
আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব /৪১৭
তাছাওউফ একটি হাকীকত /৪১৯
নামায শিক্ষা করে পড়ো /৪২০

ইল্‌মে শারায়ে' ও ইল্‌মে ইহ্‌সান বা তাছাওউফ /৪২২
মুনাফিকির ভয় /৪২২
একটি প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক জবাব /৪২৩
ফেকাহ্‌ ও তাছাওউফের ঈমান /৪২৩
রংবিক্রেতা ও রংমিস্ত্রী /৪২৩
যিকিরকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার হুকুম /৪২৪
শরীয়ত ও তাছাওউফ উভয় ক্ষেত্রে ইমাম চারজন কেন? /৪২৫
ইল্‌মুল ইহ্‌সান বা তাছাওউফের প্রমাণ /৪২৫
হাদীছে জিবরাঈল-এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর ওপর এক নজর /৪২৮
মৃত্যুকালে শয়তানের আক্রমণ /৪২৯
শরীয়তই হচ্ছে মূল /৪৩০
পুণ্যবানদের সান্নিধ্য রিয়াবিহীন ইবাদত থেকে উত্তম /৪৩০
নিয়তের এখলাছের নাম তাছাওউফ /৪৩১
তাছাওউফের সেলসেলাগুলোর স্তর /৪৩২
গোসল করার মধ্যে নিয়তের প্রভাব /৪৩২
অন্তরের স্থিরতার মধ্যে সাহায্য আসে কীভাবে? /৪৩৩
মাশায়েখগণের নিকট ইল্‌মের মূল্যায়ন ও স্তর /৪৩৪
মাশায়েখগণের ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন? /৪৩৪
পূত-পবিত্র মাশায়েখে কেরামের পক্ষে প্রতিরোধ /৪৩৫
মধ্যম পন্থা /৪৩৬
তাছাওউফের উদ্দেশ্য /৪৩৭
মাশায়েখে কেরামের দরজায় ওলামায়ে কেরাম /৪৩৭
চরিত্রের ওপর অধিক পরিমাণে মেহনত চাই /৪৩৮
মৃত অন্তর অন্তর নয় /৪৩৯

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে যুলফিকার

২১তম খণ্ড

خوف (ভয়) خشيت (শঙ্কা) ও خشوع (বিনয়) এর স্বরূপ

'ওলামায়ে কেরামের অন্তরে তাদের ত্রুটি ও অপরাধের দরুন ভয় থাকে। তবে এর চেয়ে বেশি থাকে শঙ্কা। তারা ওই সমস্ত লোক, যারা সুন্নতের ওপর আমল করার চেষ্টা করেন। তবে আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার কথা ভালো করেই জানেন। আল্লাহর সেই গুণের ওপর ভয় করে যে, কি জানি কখন কোন অদৃশ্য বিপদ এসে আমাকে পাকড়াও করে। কোন সময় জানি আমার দ্বারা এমন কিছু সংঘটিত হয়ে যায়, যার ফলে আমার মালিক আমার ওপর নারাজ হয়ে যান।

এজন্যই ইল্‌ম যত বৃদ্ধি পায়, ভয় তত বাড়ে। কেন? কারণ, ইল্‌ম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আল্লাহর মাহাত্ম্যও বৃদ্ধি পায়। ইল্‌ম বৃদ্ধির দরুন নিজের ত্রুটি ধরা পড়ে। এবার বুঝতে পারে যে, আমি এত অধম আর আমার মালিক এমন মহান। সুতরাং তার ভয় বৃদ্ধি পায় যে, কি জানি কখন আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হয়। অত্রএব, মহব্বতের সঙ্গে যদি ভয় থাকে, তাহলে একে خشيت বা শঙ্কা বলে।'

خوف (ভয়) خشيت (শঙ্কা) ও خشوع (বিনয়) এর স্বরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝٣

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

তিনটি সমার্থবোধক শব্দ

পবিত্র কুরআনে খুবই নিকটতম অর্থবোধক তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১. خوف (ভয়) ২. خشيت (শঙ্কা) ৩. خشوع (বিনয়)।

এই তিনটি শব্দ এমন নিকটতম অর্থবোধক যে, ছাত্র-ওস্তাদগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটির স্থানে অন্যটির অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। তবে এগুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

خوف (ভয়) : ভয় মানে মানুষ তার নিজের ভুলের জন্য শাস্তি পাওয়ার ভয় করে। এর দৃষ্টান্ত এরকম মনে করুন যে, ওস্তাদ ছাত্রকে হস্তলিপির নির্দেশ দিলেন। একছাত্র সেই কাজ না করে শুয়ে রইল। ওস্তাদ যখন তাদের খাতা চেক করতে বললেন, তখন ওই ছাত্র ভয় করছে, যদি আমার খাতায় হাতের লেখা না পান, তাহলে আমাকে মার খেতে হবে। একে বলে ভয়। সাধারণত এটা মানুষের নিজের ভুলের কারণে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

خشیت (শঙ্কা) : একটি হলো শঙ্কা। এর মধ্যে ভয়ের সঙ্গে সম্মানও থাকে, ভালোবাসাও থাকে। যেমন– একব্যক্তি তার আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করেছে। এমন এক রমণী, যার রূপ, গুণ, বিবেক, বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। সাথে-সাথে দৈহিক গঠনও আকর্ষণীয় নয়। কিছুদিন পর আবার প্রমাণিত হয়েছে যে, সে বন্ধ্যাও। তখন মহিলা তার স্বামীকে ভয় করতে শুরু করেছে যে, কী জানি স্বামী আমার ওপর রেগে গিয়ে আমাকে বিদায় করে দেন কিনা। এটা মারপিটের ভয় নয়। এটা হচ্ছে বিচ্ছেদের ভয়। রেগে যাওয়ার ভয়। এমন ভয়কে خشیت বা শঙ্কা বলে।

ওলামায়ে কেরামের অন্তরে তাদের ত্রুটি ও অপরাধের দরুন ভয় থাকে। তবে এর চেয়ে বেশি থাকে শঙ্কা। তারা ওই সমস্ত লোক, যারা সুন্নতের ওপর আমল করার চেষ্টা করেন। তবে আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার কথা ভালো করেই জানেন। আল্লাহর সেই গুণের ওপর ভয় করে যে, কি জানি কখন কোন অদৃশ্য বিপদ এসে আমাকে পাকড়াও করে। কোন সময় জানি আমার দ্বারা এমন কিছু সংঘটিত হয়ে যায়, যার ফলে আমার মালিক আমার ওপর নারাজ হয়ে যান।

এজন্যই ইল্‌ম যত বৃদ্ধি পায়, ভয় তত বাড়ে। কেন? কারণ, ইল্‌ম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আল্লাহর মাহাত্ম্যও বৃদ্ধি পায়। ইল্‌ম বৃদ্ধির দরুন নিজের ত্রুটি ধরা পড়ে। এবার বুঝতে পারে যে, আমি এত অধম আর আমার মালিক এমন মহান। সুতরাং তার ভয় বৃদ্ধি পায় যে, কি জানি কখন আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হয়। অত্রএব, মহব্বতের সঙ্গে যদি ভয় থাকে, তাহলে একে خشیت বা শঙ্কা বলে।

দেখুন, মানুষ সাপকে ভয় করে। কিন্তু কারো অন্তরে সাপের প্রতি কোনো ধরনের ভালোবাসা থাকে না। বরং ক্ষতির ভয় থাকে। সুতরাং خوف (ভয়)-এর সম্পর্ক ক্ষতির সঙ্গে। পক্ষান্তরে خشیت (শঙ্কা)-এর সম্পর্ক ভালোবাসার সঙ্গে। আমার প্রিয়তম যেন আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেন। আমি যেন প্রিয়তমের দৃষ্টি থেকে সরে না যাই। তাঁর দরবার থেকে যেন আমাকে তাড়িয়ে না দেন। একে বলে خشیت বা শঙ্কা।

خشوع (বিনয়) : তৃতীয়টি হলো خشوع বা বিনয়। বিনয় বলা হয় কারো সম্মানার্থে তার প্রভাব ও ভয় অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া, তার দাপট অন্তরে বিরাজ করা। এর দৃষ্টান্ত হলো, এক খাদেম– বাদশাহ তাকে তাঁর নিকটে রেখেছেন।

এখন সে বাদশাহর সামনে যাওয়ার সময় প্রভাবান্বিত হয়। কেননা, সে নিজের সময়েরও হিসাব রাখে এবং বাদশাহর চাহিদার প্রতিও দৃষ্টি রাখে। সুতরাং বাদশাহর সম্মান ও তাঁর অধিকারের প্রতি লক্ষ রেখে তার অন্তর সর্বদা প্রকম্পিত থাকে। সে কথা আস্তে বলে, অন্যকেও জোরে কথা বলতে দেয় না। চুপ কর, চুপ কর বলে। তার অন্তরের এই অবস্থাকে خشوع বা বিনয় বলে।

خوف ভয়, خشيت আশঙ্কা, خشوع বিনয় সবকটির মধ্যকার পার্থক্য

خوف-এর স্তরে সাধারণ মানুষও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সে প্রভাবান্বিত ও আজ্ঞাবহ। জিন-ইনসান সকলেই এর শামিল। কারণ, তারা গোনাহ করে। আর গোনাহের কারণে শাস্তি পাওয়ার ভয় থাকে। পক্ষান্তরে خشيت ও خشوع এর উভয়ের স্তর خوف এর ঊর্ধ্বে। সেটা এমন স্তর, যেখানে ওলামায়ে কেরাম ও নৈকট্যশীলগণ শামিল। সংক্ষেপে বুঝে নিন যে, সাধারণ মানুষের জন্য হলো ভয়ের স্তর। কারণ, সে গোনাহ করে এবং গোনাহের দরুন শাস্তি পাওয়ার ভয় থাকে। আর ওলামায়ে কেরাম গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন এবং আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করেন। তবে তারা জানেন, আমার আমল আল্লাহর শান অনুযায়ী হচ্ছে না। কেননা, তিনি অমুখাপেক্ষী। সুতরাং মনে এই ভয় থাকে যে, আমার আমল কবুল হলো কি না।

এই স্তর خشيت-এর। এটা ওলামায়ে কেরামের জন্য। এর চেয়ে ঊর্ধ্বে হচ্ছে خشوع-এর স্তর। সেটি নৈকট্যশীলগণের জন্য। নবীগণের ওপরও خشوع-এর অবস্থা প্রকাশ পেত। আপনারা দেখে থাকবেন, বাহ্যিকভাবে অবস্থা একই হয়; কিন্তু বাস্তবে তার মধ্যে পার্থক্য থাকে। এর উদাহরণ হলো, বাড়িতে অতিথি এলে ছোট-বড় সবাই আনন্দিত হয়। আগামী কাল দাদা বা আব্বা হজ থেকে আসবেন, আম্মু-নানু হজ থেকে আসবেন। তবে এক্ষেত্রে ছোট ও বড় উভয়ের খুশির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বড়দের আনন্দ হলো, তিনি আসবেন; সাক্ষাৎ করব, সফরের হাল-হাকীকত জিজ্ঞেস করব, আর ছোটদের খুশি হলো, আগামী কাল উত্তম খাবার পরিবেশন করা হবে। মজার-মজার খানা খাব। উভয়েই তো খুশি হয়েছে; কিন্তু উভয়ের খুশির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

অতএব خشيت কেও ভয় বলে, خوف কেও ভয় বলে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, خوف এর মধ্যে শাস্তি পাওয়ার ভয় থাকে আর خشيت এর মধ্যে নারাজ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আমি যেন আমার মালিকের রোষানলে পতিত না হই। এই ভয় পূর্বের ভয়ের ওপর প্রাধান্য পায়। আপনারা লক্ষ করুন, জড় বস্তু আল্লাহর নাফরমানি করে না। সুতরাং জড় বস্তুর ব্যাপারে কোথাও خوف শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। পবিত্র কুরআনে জড় বস্তুর ক্ষেত্রে خشيت ও خشوع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে, خشيت শব্দ ব্যবহৃত হলো কেন? তাহলে শুনুন, সে আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় করে। পাথরের ভয় আছে যে, কী জানি আমাকে জাহান্নামের ইন্ধন বানানো হয় কিনা। আল্লাহ বলেছেন–

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'ওই আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।'[১]

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। এক বুযুর্গ একটি পাথরকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? পাথর বলল, আমার ভয় হচ্ছে, কি জানি আল্লাহ আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেন। বুযুর্গ সেই পাথরের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিলেন, ঠিক আছে; ওকে আমি জাহান্নামে দেব না। বুযুর্গ পাথরকে সুসংবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। কিছুদিন পর বুযুর্গ এস্থান দিয়ে অতিক্রম করলে দেখলেন, পাথরটা পুনরায় কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলে এবার পাথর জবাব দিল, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার খুশিতে কাঁদছি।

সুতরাং خشيت এর ক্ষেত্রে পাথরও শামিল। সে আল্লাহর মাহাত্ম্য জানে। মহান স্রষ্টার আসন আরশেও خشيت-এর অবস্থা প্রকাশ পায়। ফেরেশতাদের মধ্যেও خشوع এর অবস্থা বিরাজ করে আল্লাহর মাহাত্ম্যের কারণে। সুতরাং সুস্পষ্ট পার্থক্য এটাই যে, সাধারণ মানুষের জন্য خوف আর ওলামায়ে কেরামের জন্য خشيت আর নৈকট্যশীলদের জন্য خشوع এর স্তর।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪

خشوع এর স্তর

আসুন, এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা আমরা কুরআন-হাদীছে দেখি। خشوع শব্দের মূল বর্ণ خ - ش - ع। বাবে فتح يفتح যথা خشع يخشع এর মাসদার। অর্থ অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়া, আল্লাহর মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ করে অন্তর প্রকম্পিত হওয়া। আল্লাহর সম্মানের নূর অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া। এজন্যই অধিকাংশ স্থানে خشوع শব্দের সঙ্গে আল্লাহর সত্তাগত নাম الله শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ

পবিত্র কুরআনে خشوع শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআনে خشوع শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা–

১. اَلذُّلُّ নীচুতা হওয়ার অর্থে। যেমন-

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

'মহামহিম প্রভুর সামনে সকল আওয়াজ নীচু হয়ে যাবে। তখন তোমরা ফিসফিস কথা ছাড়া কিছু শুনবে না।'[১]

অন্য আয়াতে এসেছে–

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

'তারা অধঃমুখী হয়ে কাঁদে এবং আল্লাহ তাদের বিনয় বাড়িয়ে দেবেন।'[২]

২. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিস্তব্ধতার অর্থে : মানুষ যখন কারো প্রতি ভীত হয়, তখন সে তার সম্মুখে একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

'সেই মুমিনরা সফলকাম, যারা নিজেদের নামাযে ভীত।'[৩]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১০৮
২. সূরা ইসরা : আয়াত ১০৯
৩. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১, ২

'মুফরাদাত' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর যে প্রভাব হয়, তাকে خشوع বলে।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের প্রত্যেকটি চুলে ও লোমে বিনয় না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিনয়ী হতে পারবে না।

এক হাদীছে এসেছে, নবীজি এক নামাযীকে নামাযের মধ্যে দাড়ির সঙ্গে খেলতে দেখে বললেন–

لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ

'যদি তার অন্তরে خشوع (বিনয়) থাকত, তাহলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিস্তব্ধ হয়ে যেত।'

ইমাম গাযযালি (রহ.)-এর বিশ্লেষণ করেন–

اَلْمَحَبَّةُ شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَثِمَارُهَا تَظْهَرُ فِي الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ

'মহব্বত' একটি পবিত্র গাছ, যার শিকড় নিচ পর্যন্ত এবং যার শাখা আকাশ পর্যন্ত এবং তার ফল অন্তর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও জবানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই আলামত প্রকাশ পাওয়া মহব্বতের দলিল। সুতরাং মানুষের কথায়, আচরণে ও কর্মে প্রকাশ পায় তার অন্তরে অবস্থা কেমন? যেমন ধোঁয়া প্রমাণ করে তার নিচে আগুন জ্বলছে।

এমনিভাবে যখন মানুষের অন্তরে ভালোবাসা থাকে, তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আচরণ প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে ভালোবাসা রয়েছে। ফল যেমন তার গাছের পরিচয় দেয়, অন্তরের এই অবস্থা অন্তরে ভালোবাসার পরিচায়ক, অন্তরের বিনয়ের লক্ষণ।

সুতরাং خشوع (বিনয়) অর্জিত হলে সে তাকবীরে উলার সময় মসজিদে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবে এবং মসজিদে থেকে বের হলেও তার মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য বিরাজমান থাকবে। সায়্যিদুনা আলী (রাযি.) মসজিদে প্রবেশ করলে তাঁর চেহারা হলদে বর্ণ হয়ে যেত। কেউ জিজ্ঞেস করল, জনাব! সংকটময় যুদ্ধের সময়ও আপনার চেহারা বিবর্ণ হয় না, আপানি ভীত হন না; অথচ এখানে আপনার চেহারাটা হলদে বর্ণ হয়ে যায়। কারণটা কী?

তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি কোন বাদশাহর দরবারে হাজিরা দিচ্ছি।

তাঁর অন্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্যের অনুভূতি হতো। তাই জায়নামাযে দাঁড়ালে তাঁর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেত। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, নবীজি ঘরে বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করছেন। হঠাৎ বেলালের আযানের ধ্বনি বেজে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি এমনভাবে মসজিদে চলে যেতেন, যেন আমাদের চিনতেই পারেননি। আল্লাহর মাহাত্ম্য অন্তরে এসে যেত যে, আমার মালিক আমাকে ডাকছেন। যদি অন্তরে বিনয় আসে, তাহলে চোখে পানি আসা তার ফসল। আল্লাহর ভয়ে কান্নায় চোখ ভেসে যাবে।

কোনো কবি বলেন-

کیوں دل جلوں کی لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو
ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو

অন্তরে জ্বালাপোড়া করবে কেন যদি মুখে তার শোরগোল না হয়?
এটা তো সম্ভব নয় যে, আগুন জ্বলবে আর ধোঁয়া আসবে না।

পবিত্র কুরআনে خشوع প্রকম্পনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন–

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ

'তারা আশা ও ভীত অবস্থায় আমাকে ডাকছে। তারা আমার জন্য প্রকম্পিত।'[১]

বিনয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

'নিশ্চয় তা অনেক বড়। তবে বিনয়াবনতদের জন্য নয়।'[২]

সুতরাং خشوع এর সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা প্রকাশ করে। হাদীছ শরীফে এসেছে আল্লাহ নবীজিকে বললেন,

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৯০
২. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৫

إِذَا دَخَلَتِ الصَّلَاةُ فَهَبْ لِيْ مِنْ قَلْبِكَ الْخُشُوْعَ وَمِنْ بَدَنِكَ الْخُضُوْعَ وَمِنْ عَيْنِكَ الدُّمُوْعَ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ.

যখন তুমি নামাযে দণ্ডায়মান হবে, তখন তোমার অন্তর থেকে আমাকে বিনয় দেবে, দেহ থেকে নম্রতা দেবে এবং চোখ থেকে পানি দেবে। কেননা, আমি নিকটেই থাকি।

উম্মতের বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে বিনয়

উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এই শব্দটির বিশ্লেষণকল্পে অনেক শব্দ বলেছেন, অনেক বাক্য বলেছেন। যেমন–

১. হযরত ওমর (রাযি.) বলেন–

لَيْسَ الْخُشُوْعُ فِي الرِّكَابِ إِنَّمَا الْخُشُوْعُ فِي الْقَلْبِ

'বিনয় বাহনে নয়– বিনয় হচ্ছে অন্তরে।'

২. হযরত আলী (রাযি.) বলেন–

اَلْخُشُوْعُ فِي الْقَلْبِ اَنْ تَلِيْنَ كَتِفَكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

'অন্তরের বিনয় থাকলে মুসলমান তার অপর ভাইয়ের জন্য কাঁধ অবনত করে দেয়।'

৩. হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেন–

اَلْخُشُوْعُ تَذَلُّلُ الْقُلُوْبِ لِعَلَّامِ الْغُيُوْبِ

'বিনয় অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী সত্তার জন্য অন্তরকে নমনীয় করা।'

৪. ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন–

اَلْخُشُوْعُ يَلْتَئِمُ مِنَ التَّعْظِيْمِ وَالْمَحَبَّةِ

আল্লাহর সম্মান ও ভালোবাসায় উত্তম হয়ে যাওয়া।

৫. সাহ্‌ল তসতরি (রহ.) বলেন–

مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

যার অন্তরে বিনয় থাকে, শয়তান তার নিকটে আসতে পারে না। কারণ, যার অন্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্যের কারণে ভয় ও বিনয় থাকবে, সে গোনাহের কথা কল্পনাও করবে না। সুতরাং শয়তান তার নিকটে আসবে কী করে?

৬. আবু ইয়াযীদ মাদানি (রহ.) বলেন–

إِنَّمَا أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوْعُ

এ উম্মত থেকে সর্বপ্রথম যা অপসারণ করা হবে, তা হলো বিনয়। কাজেই বর্তমানে লক্ষ করে দেখুন, নামাযে বিনয় খুব কমই হয়ে থাকে।

خشيت এর স্তর

দ্বিতীয় শব্দ خشيت এর মূল বর্ণ খা, শীন ও ইয়া। বলা হয় الخشية في الرجوع। خشيت এর মধ্যে প্রত্যাবর্তন থাকে। خشيت ও خوف উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, মানুষ যে-জিনিসকে خوف তথা ভয় করে, তার থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে خشيت বৃদ্ধি পায়, সে আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে যায়। তাই বলা হয়, خشيت এমন ভয়, যার মধ্যে সম্মান প্রদর্শন বিদ্যমান এবং خشيت অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইল্‌মের কল্যাণে হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে خشيت শব্দ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'একমাত্র আলেমরা-ই আল্লাহকে ভয় করে।'[১]

অন্য আয়াতে বলেন–

وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

'যেব্যক্তি অদৃশ্যভাবে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও।'[২]

আরেক আয়াতে বলেন–

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

'এটি তার জন্য, যে তার প্রভুকে ভয় করে।'[৩]

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ২৮
২. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ১১
৩. সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ৮

অন্যত্র বলেন–

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

'যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়।'[১]

علم ও خشيت

সুতরাং মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও অমুখাপেক্ষিতার দরুন যাদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়, তাদের 'আলেম' বলা হয়। তাদের আলামত হলো, ইল্‌ম যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর ভয়ও তত বৃদ্ধি হবে। যদি ইল্‌ম বৃদ্ধির সঙ্গে আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি না পায়, তাহলে বুঝতে হবে, আমি বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। আমার ইল্‌ম হাসিল হচ্ছে না, জ্ঞানার্জন হচ্ছে। হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) বলেন, মানুষ ট্রেনে চড়লে রাস্তায় বিভিন্ন স্টেশনের প্রতি তাকায়– কোথায় আসছে দেখে। যেমন– লাহোর থেকে করাচি যাওয়ার পথে প্রথমে এক স্টেশনে গেল। তারপর খানেওয়াল স্টেশন অতিক্রম করে মুলতান গেলে সে বুঝে নেয়, আমি করাচির নিকটবর্তী হয়ে গেছি। আর যদি লাহোর থেকে করাচি যাওয়ার ট্রেনে বসে রাস্তায় জেলহাম, গুজরাট স্টেশন দেখতে পায়, তাহলে বুঝে নেবে, ট্রেন অন্য রাস্তায় যাচ্ছে।

ঠিক তেমনিভাবে মনে করুন, আল্লাহর পথের আগ্রহী-অনুরাগী ছাত্ররা নিজের অন্তরকে যাচাই করে দেখবে। যদি তার অন্তরে خشوع এর নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তাহলে বুঝবে, আমার গাড়ি গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে। আর যদি خشوع না পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে, আমার জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে নিজের আত্মতৃপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এরপর আমাদেরকে হিসাব করা চাই যে, কোথায় গড়মিল হচ্ছে। তাই নিজেকে পরীক্ষা করা চাই, জীবনের প্রতি মনোযোগ চাই। তবে যদি তার বিবেকই এ ধরনের জবাব দেয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। এরপর তো এটা তার শিক্ষণীয় বিষয় হবে যে, আমি করাচির ট্রেনে বসিনি; বরং পাড়ুয়ার ট্রেনে বসে গেছি। গাড়িতে উঠে শুয়ে গেল। অতঃপর স্টেশনে গাড়ি থামলে নিচের মানুষের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, গাড়ি কোথায় যাচ্ছে? বলল, পাড়ুয়া যাচ্ছে। তখন

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ২৩

যদি বলে, বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা খুব আশ্চর্য আবিষ্কার করছে যে, নিচের মানুষ পাল্টুয়া যাচ্ছে আর ওপরের মানুষ করাচি যাচ্ছে, যদি এমন বিবেক হয় তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি আল্লাহ তাকে বিবেক দিয়ে থাকেন, তাহলে সে অবশ্যই নিজেকে চিনতে পারবে যে, আমি কোন দিকে যাচ্ছি।

আল্লাহ বলেন–

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'[১]

যদি আমাদের আমলে বর্ধন আসে, নামাযের অবস্থা পূর্বের চেয়ে ভালো হয়, কুরআন তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের সৃষ্টি হওয়া অনুভব হয়, গোনাহ হতে এভাবে দূরে থাকি, যেমন সাপ-বিচ্ছু থেকে দূরে সরে যাই, তাহলে এটি خشيت এর আলামত। আর যদি নামাযে থেকেও চোখ এদিক-সেদিক তাকায়, তাহলে নামাযের কোনো গুরুত্ব রইল না। যদি গীবতও অনায়াসে করি, অতি সহজেই মিথ্যা বলে ফেলি, তাহলে এর অর্থ হবে, আমার গাড়ি গন্তব্যের বিপরীতে চলছে।

হাদীছের আলোকে خشيت

خشيت -এর এই অবস্থা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। হাদীছে এসেছে–

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ

'দুটি চোখ আছে, জাহান্নামের আগুন যাদের কখনো স্পর্শ করবে না।'

عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'এক হলো, যে-চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং দ্বিতীয়টি হলো, যে-চোখ আল্লাহর রাস্তায় রাতযাপন করেছে।'

অন্য হাদীছে এসেছে–

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ

'আল্লাহর নিকট দুটি ফোঁটা কিংবা দুটি নিদর্শনের চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো বস্তু নেই। চোখের ওই ফোঁটা বা বিন্দু, যা আল্লাহর ভয়ে নির্গত হয়।'

---

১. সূরা তাকবীর : আয়াত ২৬

আরেক হাদীছে এসেছে–

مَنْ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيْبَ الْاَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আল্লাহর ভয়ে যার চোখে পানি আসে এমনকি তা মাটিতে পড়ে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেবেন না।'

এজন্যই হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজিকে বললেন, হে আল্লাহর নবী! কেয়ামতের দিন আমরা গোনাহগারের চোখের পানি ব্যতীত সব কিছু ওজন করব। আমরা তার ওজন করতে সক্ষম হব না। এই পানির বিনিময়ে আল্লাহ গোনাহগারের সমুদ্রপরিমাণ গোনাহও ক্ষমা করে দেবেন।

সুতরাং ভাই! خشيت আল্লাহর নিকট হতে চেয়ে নেওয়া চাই। এ خشيت আল্লাহ আমাদেরও দান করুন। হাদীছ শরীফে আমাদের দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

'হে আল্লাহ! আপনার ভয়ের এমন অংশ আমাদের দান করুন, যা আমাদের ও আমাদের গোনাহের মধ্যে আবরণ হয়ে যায় এবং ইবাদতের এমন অংশ দান করুন, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করি। এমন বিশ্বাস দান করুন, যার দরুন পৃথিবীর বিপদাপদ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় এবং আমাদের মরণ পর্যন্ত অটুট থাকে। আর এর কল্যাণ আমাদের মৃত্যুর পরও জারি রাখো। আর যারা আমাদের ওপর অত্যাচার করে, তাদের থেকে আমাদের প্রতিশোধ নাও এবং যারা আমাদের প্রতি শত্রুতা করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। আমাদের ও আমাদের দীনের ওপর বিপদ আরোপিত করো না। দুনিয়াকে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বানিও না। আমাদের জানার পরিসমাপ্তি করো না। যে আমাদের ওপর দয়া করবে না, তাকে আমাদের ওপর নিযুক্ত করো না।'

অপূর্ব দু'আ! আমাদের উচিৎ, আমরা এটি মুখস্থ করে নেব এবং প্রত্যেক নামাযের পর তা প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ যে-ইল্‌ম দান করেছেন, সেই ইল্‌ম خشيت এর ফল বহন করে নিয়ে আসবে। নতুবা অশ্বত্থ গাছ যেমন মূল্যহীন, তেমনি আল্লাহর দৃষ্টিতে আমাদের ইল্‌মও মূল্যহীন হয়ে যাবে।

বিজ্ঞ মনীষীদের দৃষ্টিতে خشيت

(১) ওমর (রাযি.) خشيت কে এমন গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি বলেন–

شَاوِرْ فِيْ اَمْرِكَ الَّذِيْ يَخْشَوْنَ اللهَ

'নিজের কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।'

(২) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন–

لَيْسَ الْعِلْمُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنَّ الْعِلْمَ مِنَ الْخَشْيَةِ

'প্রচুর পরিমাণে হাদীছ বর্ণনা করার নাম ইল্‌ম নয়। আল্লাহ তা'আলার ভয়ের অপর নাম হচ্ছে ইল্‌ম।'

(৩) হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, মুমিন ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাতে অটল থাকে। যে-জিনিসের প্রতি মগ্ন হতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেই জিনিসে মগ্ন থাকে। আর যে জিনিস হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তা থেকে দূরে থাকে।

(৪) হযরত মাসরূক (রহ.) বলেন, বান্দার জন্য এতটুকু ইল্‌মই যথেষ্ট, যার মধ্যে خشيت এসে যায়। আর বান্দার অজ্ঞতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যার ইল্‌মের প্রতি তার নিজের গর্ব এসে যায়।

(৫) মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহ.) কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন–

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝

'তারা এমন বিষয়ের সম্মুখীন হবে যে, সে সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকবে না।'[১]

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৪৭

তারপর তিনি বলেন, আমার ভয় হচ্ছে, এমন কোনো বিষয়ের সম্মুখীন যেন না হই, যে সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি আমার ধারণাই থাকে না।

(৬) হযরত যুবায়ের (রাযি.) বলেন–

اَلْخَشْيَةُ هِيَ الَّتِيْ تَحُوْلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَةِ اللهِ

যখন خشيت আসে, তখন বান্দা ও আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে প্রতিষেধক বিদ্যমান হয়ে যায়।

চিন্তা ও ভয়

একটি কথা স্মরণ রাখবেন যে, এক হলো حزن (চিন্তা), অপরটি হলো خوف (ভয়)। মানুষের অন্তরে চিন্তা বৃদ্ধি পেলে তার খাওয়াদাওয়া হ্রাস পায়। যে-ছাত্র ফেল হয়ে গেছে, তার খাবারদাবার ভালো লাগবে না। যে-মহিলার তালাক হয়ে গেছে, তার ভেতরে খাবার প্রবেশ করে না। যে-মায়ের সন্তান মারা গেছে, তার ভেতরে খাবার যায় না। সুতরাং চিন্তার কারণে যেমন খাওয়াদাওয়া বর্জন হয়ে যায়, তেমনি خشيت এর কারণে গোনাহ পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে। অন্তরে আল্লাহর ভয় এলে গোনাহ অটোমেটিক কমে যায়। সে গোনাহ থেকে পলায়ন করে। মানুষ সাপ-বিচ্ছু থেকে যেমন দূরে থাকে, তেমনি সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লামা কুরতুবি (রহ.) হযরত রবী ইবনে আনাস (রহ.)-এর বাণী বর্ণনা করেন–

مَنْ لَمْ يَخْشَى اللهَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ

'যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না, সে আলেম নয়।'

সুতরাং خشوع হচ্ছে আল্লাহর মাহাত্ম্যের দরুন অন্তরে ভয় সঞ্চার হওয়া, অন্তর প্রকম্পিত হওয়া, আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার দরুন তাঁকে ভয় করা, গোনাহ হতে দূরে থাকা। আল্লাহ আমাদের خشوع দান করুন। আমীন।

خوف এর স্তর

তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে خوف। এটি আপনার-আমার স্তর। এটি সাধারণ মানুষের স্তর। আমাদের ভুলের উপলব্ধি থাকে কেন? কারণ, ভয় থাকে যে, কখন জানি আল্লাহর শাস্তির উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়!

اَلْخَوْفُ فِيْهِ ضِرَارٌ

خوف-এর মধ্যে ক্ষতির ভয় থাকে।

তাই বলা হয়েছে–

هُوَ انْزِعَاجٌ مِّنْ اِنْتِقَامِ الرَّبِّ

আল্লাহর প্রতিশোধের ভয়ে বান্দার অস্থির থাকার নাম خوف বা ভয়। সুতরাং خوف শব্দটি শুধু মানুষের জন্য, যারা শরীয়তের বিধানের আওতাভুক্ত।

একটি ইল্‌মি সূক্ষ্মতা

এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যে, আল্লাহ যেখানে خوف শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেখানে সাধারণত নিজের গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। যথা–

وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۙ

'তারা মন্দ হিসাবের ভয় করে।'[১]

لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ

'যে পারকালের শাস্তির ভয় করে।'[২]

اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ

'আমার ভয় হচ্ছে যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি গ্রাস করে।'[৩]

يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۙ

'তারা মহাজ্ঞানীর শাস্তির ভয় করে।'[৪]

يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ

'তারা তাদের পালনকর্তার নিকট সমবেত হওয়ার ভয় করে।'[৫]

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ২১
২. সূরা হূদ : আয়াত ১০৩
৩. সূরা মারয়াম : আয়াত ৪৫
৪. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৩৭
৫. সূরা আন'আম : আয়াত ৫১

তিনটি স্থান রয়েছে, যেখানে আল্লাহ خوف এর সঙ্গে তাঁর সত্তাগত নাম উল্লেখ করেছেন। এটি বুঝবার বিষয়। তবে সেগুলো ওই সমস্ত জায়গা যেখানে প্রথমে, আল্লাহর নাফরমানির আলোচনা করা হয়েছে। যথা–

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'(হাবিল-কাবিলের ঘটনার প্রেক্ষিতে) আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার হাত আমার দিকে সম্প্রসারিত করলে তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত সম্প্রসারিত করব না। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।'[১]

দেখুন, এখানে আল্লাহ خوف-এর সঙ্গে তাঁর সত্তাগত নাম উল্লেখ করেছেন। কেন? কারণ, গোনাহের আলোচনা হচ্ছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ – اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۖ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ۖ

যখন শয়তান তাদের কর্মগুলোকে সুশোভিত করল....তখন সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি।[২]

প্রথমে গোনাহের আলোচনা করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে, اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ আমি আল্লাহকে ভয় করি।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন–

فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

'যখন সে অস্বীকার করল, তখন বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।'[৩]

সুতরাং যেখানে গোনাহের উল্লেখ হয়েছে, সেখানে আল্লাহ خوف এর সঙ্গে তাঁর সত্তাগত নাম উল্লেখ করেছেন। অপরাধ করবে, তাহলে জেনে রেখো, আমার সত্তাগত নাম উল্লেখ করে বলছি, আমি তোমাদের মার দেব।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৮
২. সূরা আনফাল : আয়াত ৪৮
৩. সূরা হাশর : আয়াত ১৬

যেমন– কোনো পিতা তার সন্তানকে বলছে, আমি তোমাকে অনেকবার বুঝিয়েছি। তবু তুমি ফিরে আসনি, এখন শেষবারের মতো বলছি, ভবিষ্যতে অনুমতি ব্যতিরেকে ঘর থেকে পা বাড়ালে আমি তোমাকে শাস্তি দেব। অর্থাৎ– গোনাহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর সত্তাগত নাম উল্লেখ করে বলছেন, তোমরা আমার বিধান লঙ্ঘন করবে, তাহলে শুনে রেখো, আমি শাস্তি দিয়ে তোমাদের শায়েস্তা করব। হাদীছ শরীফেও এরকম এসেছে। যেমন– বলা হয়েছে, আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে আরশের নিচে স্থান দেবেন

(১)

رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ حَسَنٍ وَجَمَالٍ ... فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ

ওই ব্যক্তি, যাকে অপরূপা সম্ভ্রান্ত রমণী (নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য) আহ্বান করছে আর সে বলছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

সুতরাং দেখুন, বান্দা গোনাহ হতে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তাঁর সত্তাগত নাম উল্লেখ করে তাদের সতর্ক করেছেন, তুমি 'আল্লাহ'কে ভয় করো। কেননা, আল্লাহর একটি নীতিমালা রয়েছে। তাকে শাস্তি ও প্রতিদানের নীতি বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় Tit. For Tat দানের প্রতিদান। এটি শরীয়তের নীতি যে, যেমন কর্ম তেমন ফল। পুণ্যের কাজ করবেন; আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাবেন। গোনাহের কাজ করবেন; আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পাবেন।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় অবস্থা কেমন হওয়া উচিত

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করছি। আপনার হাতে যদি কোনো জায়গার রেজিষ্ট্রি কাগজপত্র থাকে, তাহলে সেটা পাঠ করার সময় আপনার এই উপলব্ধি হবে যে, এটি একটি দলিল আমি পাঠ করছি। আপনার অন্তরে এর জন্য আলাদা অবস্থার সৃষ্টি হবে। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় আমাদের আলাদা অবস্থার সৃষ্টি হয় না যে, এটি আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোনো দলিলপত্র।

কুরআনে কারীমে এতসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো শুধু শ্রবণের মাধ্যমে সময় ব্যয় করার জন্য নয়। আপনাদের বোঝানোর জন্য উপদেশ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– বোঝানো হয়েছে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচুর্যের গৌরব ছিল। তারা আমার বিধান মান্য করল না। তারা প্রাচুর্যের আসক্ত ছিল। ফলে দেখো, আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি।

প্রাচুর্যে উৎফুল্ল হয়ে আমার বিধান লঙ্ঘন করলে আমি তোমাদেরও সঙ্গে এমনই আচরণ করব।

আদ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদেরও নিজের ক্ষমতার ওপর আত্মগরিমা ছিল। তারা বলত–

مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে আর?'[১]

ফলে দেখো, আমি কীভাবে তাদের মাটির ওপর শুইয়ে দিলাম। তোমরা নিজেদের শক্তির ওপর গর্ব করলে আমি তোমাদেরও সঙ্গে এরূপ আচরণ করব। বনী ইসরাইলদের প্রতি তাকিয়ে দেখো, তারা নিজেদের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য শনিবারে মাছ শিকার করল। ফলাফল কী হলো? আমি তাদের অবয়ব বিকৃতি করে দিলাম। এটা তো আমাদের প্রিয়নবীর হাদিয়া যে, আমাদের আকৃতি বিকৃত করা হয় না। আল্লাহ এক্ষেত্রে তাঁর দু'আ গ্রহণ করেছেন। তাই আমাদের অবয়ব বিকৃত হয় না।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, তবে যারা বেপরোয়াভাবে গোনাহের কাজ করবে, আল্লাহ বাতেনিভাবে তার আকৃতি বিকৃত করে দেবেন। মানুষ ভেতরগতভাবে, শূকর, কুকুর ও বানরের আকৃতিতে পরিণত হয়ে যায়। হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি তাকাও। তারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করল। অদৃশ্য একটি আওয়াজ সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করে দিল। আল্লাহ আমি অধমকে ওই সমস্ত স্থান পরিদর্শন করার সুযোগ দিয়েছেন।

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

'তারা পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি তৈরি করত।'[২]

অবাক লাগে, পাহাড় কেটে এত বড়-বড় বাড়ি তৈরি করল; কিন্তু পরিশেষে ধ্বংস করে দেওয়া হলো! শুয়াইব (আ.)-এর বংশধরগণের মধ্যে মাপে কম দেওয়ার প্রচলন ছিল। আল্লাহ তাদের ওপরও কঠিন শাস্তি প্রেরণ করেছিলেন। লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় বেহায়াপনার আচরণ করেছে। আল্লাহ তাদের ভূখণ্ডকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করে এর ওপর পাথর বর্ষণ করেছেন।

---

১. সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ১৫

২. সূরা হিজর : আয়াত ৮২

এ সমস্ত ঘটনা এজন্যই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরাও যদি এরূপ আচরণ কর, তাহলে তোমাদেরও এমনই পরিণতি হবে। আপনারা চিন্তা করে দেখুন তো, আমরা কি কোনোদিন এ নিয়তে এ সমস্ত ঘটনা পাঠ করেছি যে, হে আল্লাহ! পূর্ববর্তীদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করা হয়েছে, আমাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করো না। সেগুলো হতে আমাদের রক্ষা করো। ফেরাউনের ঘটনা আমরা কোনোদিন কি এ নিয়তে পাঠ করেছি যে, আমরা অহংকার হতে দূরে থাকব? আত্মগরিমা হতে বেঁচে থাকব? আল্লাহর আনুগত্য করব? আমরা তো শুধু বর্ণনার জন্য এ সমস্ত ঘটনা পাঠ করে থাকি। কুরআন মাজীদে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা এসেছে–

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'কতিপয় যুবক তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে। আমি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছি।'[১]

এ ঘটনায় আমাদের শিক্ষানীয় বিষয় হলো, এমন অবস্থাও হতে পারে যে, তোমাদের ওপর কোনো অত্যাচারী বাদশাহ নিযুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তোমাদের ঈমান রক্ষার্থে হিজরত করতে হবে, যেমন তারা দেশ ত্যাগ করেছিল। অতঃপর তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এমনও হতে পারে যে, তোমরা হিংসুকদের কবলে পড়ে যাবে। সুতরাং এর পথ প্রদর্শনের জন্য আমি সূরা ইউসুফ-এ ইউসুফের ঘটনা বর্ণনা করেছি যে, সে হিংসুকদের কবলে পতিত হয়েছিল; কিন্তু সে আমার নাফরমানি করেনি। গোনাহের সুযোগ হয়েছে; কিন্তু সে বলছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

'সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'[২]

কারাগারে যাওয়ার আদেশ হলো। কারাগারে চলে গেছে। তবু গোনাহের আহ্বান গ্রহণ করেনি। এবার চিন্তা করুন, তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন, নিজেকে হেফাযত করেছেন। গোনাহ হতে বিরত রয়েছেন। আল্লাহর আনুগত্য করেছেন। এর প্রতিদানে আমি (আল্লাহ) কী করেছি? ভাই নেই, আত্মীয় নেই, পিতামাতা নেই, সমবেদনা প্রকাশকারী কেউ নেই। এক

---

১. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১৩

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৭৯

অচেনা ব্যক্তি। আমি তার অবস্থা এভাবে পরিবর্তন করে দিলাম যে, তাকে কালের বাদশাহ বানিয়ে দিলাম, সিংহাসনে বসালাম। এর দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, সংযম অবলম্বন কর, তাহলে শত বাধা-বিপত্তির পরও তোমাদের বিছানা থেকে সিংহাসনে সমাসীন করা হবে। এজন্য একে احسن القصص বা 'উত্তম ঘটনা' বলা হয়েছে। হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আমরা কি আজ পর্যন্ত সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করার সময় কোনো দিন একথা ভেবেছি যে, এখানে হযরত ইউসুফ (আ.)কে কীভাবে সম্মানিত করা হয়েছে? তিনি যে সমস্ত কর্ম হতে আত্মরক্ষা করেছেন, আমরাও সেভাবে আত্মরক্ষা করব। তিনি যা করেছেন, আমরা ও তা করব। আমরা তো কুরআন পত্রিকার সংবাদের মতো পাঠ করে থাকি। বরং পত্রিকার খবর পড়েও কিছুটা প্রভাবান্বিত হই; কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত করে তা-ও উপলব্ধি করতে পারছি না।

আল্লাহওয়ালাদের কুরআন তেলাওয়াতের ধরন

আল্লাহওয়ালাগণ কুরআন তেলাওয়াত করেন তাকে মূল্যবান ফরমান মনে করে। এটি শাহী ফরমান। যা বলা হয়েছে, হুবহু তা-ই করা হবে। এটি আমার মালিকের আদেশনামা। এখানে এসে সাধারণ মানুষ আর আলেমদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ কুরআন তেলাওয়াত করে শুধু ছাওয়াবের নিয়তে যে, প্রতিটি হরফে দশটি করে নেকি পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষের কুরআন পড়া এ-পর্যন্তই। আলেমরাও কুরআন পড়েন। কিন্তু তাঁরা কুরআন পড়ে দেখেন, আমার জীবনটা এর সাথে খাপ খায় কিনা।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) আরব ছিলেন। আরবি ভাষা তাঁকে শিখতে হয়নি। কিন্তু তিনি বলেন, একবার সূরা বাকারা পড়তে আমার আড়াই বছর সময় লেগেছিল। এত সময় লাগল কেন? তিনি একটি আয়াত পড়তেন আর দেখতেন, তাঁর জীবন এই আয়াতের অনুরূপ কিনা। আরেকটি আয়াত পড়তেন আর হিসাব মিলিয়ে দেখতেন, নিজের জীবনটা এই আয়াতের অনুরূপ কিনা। একদিকে কুরআন পড়া শেষ হতো আর অপরদিকে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পুরোটা দেহ কুরআনের আমল পরিপূর্ণ হয়ে যেত। আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি; কিন্তু কোনোদিন মনোযোগের সাথে তেলাওয়াত করেছি কি?

আমাদের মুরশিদে আলম বলতেন, একবার আমি হারামে বাইতুল্লাহর সামনে বসে পুরো কুরআন এমনভাবে পাঠ করেছি যে, একটি আয়াত পড়েছি

আর যে-দু'আটি সেই আয়াতের সঙ্গে খাপ খায়, সেই দু'আটি করেছি। সুসংবাদের আয়াত হলে জান্নাতের দু'আ। ভয়ভীতির আয়াত হলে জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ। হযরত বলেন, আমি আলিফ লাম মীম থেকে শুরু করে এভাবে পুরো কুরআন তেলাওয়াত করেছি। এটিই হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও ওলামায়ে কেরামের তেলাওয়াতের পার্থক্য।

ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কুরআনকে শাহী ফরমান মনে করেন। তারা মনে করেন, প্রতিটি শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তা পূর্ণ হবেই। এটি আল্লাহপ্রদত্ত বিধান। সেই বিধান প্রস্তুতকারী মহাশক্তিধর আল্লাহ। তিনি তাকে লাঘব করারও ক্ষমতা রাখেন। শরীয়তের বিধানের সঙ্গে যেব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, সে অবশ্যই নির্মূল হবে। মানুষ পাহাড়ে মাথা দ্বারা গুতা দিলে তার মাথা অবশ্যই ফেটে যাবে।

সুতরাং যেব্যক্তি কুরআন নামক পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা দিতে চাবে, অবশ্যই তার মাথা ফেটে যাবে। এজন্যই ওলামায়ে কেরামের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় থাকে। তাঁরা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও সম্মান উপলব্ধি করতে পারেন। নবীজি নিজের পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই ঘটনাসমূহ তো সময় ব্যয় করার জন্য শোনানো হয়নি। সময় কাটছে না, চলো ভাই! একটি ঘটনা শোনো। ব্যাপারটা এমন নয়। আমরা যেমন টেলিফোনে কথা বলার সময় বিভিন্ন বিষয়ে বলে থাকি। কখনো বৃষ্টির কথা, কখনো গরমের কথা। নবীজির প্রতিটি কথা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষিতে হতো।

সুতরাং তিনি পূর্ববর্তীদের ঘটনা বলে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, দেখো পুণ্যবানদের শেষ ফলাফল কী হয়েছিল। যেমন– তিন ব্যক্তি যাচ্ছে। সহসা তারা একটা গর্তে পড়ে যায়। একজন একটি দু'আ করছে। আরেকজন অন্য দু'আ করছে। তৃতীয়জন এই প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তাদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য হলো, হে আমার উম্মত! তোমরাও যদি অবস্থার গহ্বরে নিপতিত হও, তাহলে নিজেদের আমল আল্লাহর সম্মুখে উপস্থাপন করে তাঁর নিকট প্রার্থনা করো। তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়ে দেবেন।

বলা হয়েছে, একশ খুনের অপরাধী পুণ্যবানদের লোকালয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের থেকে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো। আল্লাহ তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

যুলকিফ্‌ল-এর ঘটনা নবীজি অনেকবার বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, যুলকিফ্‌ল এক মহিলাকে টাকার বিনিময়ে গোনাহের কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। মহিলা আল্লাহকে ভয় করতে লাগল। কাঁপতে লাগল। জিজ্ঞেস

করার পর বলল, আমি জীবনে এমন গোনাহ করিনি। অপারগতার দরুন আপনার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি। তার অন্তরেও আল্লাহর ভয় এসে গেল। টাকাও ছেড়ে দিল এবং গোনাহের কাজ না করে মহিলাকেও মুক্ত করে দিল। আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, নবীজির মুখে আমি এই ঘটনা পঁচিশবার শুনেছি। এর উদ্দেশ্য কী? দেখো, তোমরাও যদি মারাত্মক অপরাধ হতে বেঁচে থাক, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরও সঙ্গে উত্তম আচরণ করবেন। এক পতিতা মহিলা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করাল। আল্লাহ তার জীবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিলেন। উদ্দেশ্য কী? একটা কুকুরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং জানা গেল, কুরআন-হাদীছের ঘটনা পড়ে আমরা সেগুলোকে নিজের পাথেয় বানাব। গোনাহের সুযোগ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে, যদি আমি এই গোনাহ করি, তাহলে কেয়ামতের দিন এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তা হতে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

'বলুন! আমি ভয় করি আমি যদি আমার পালনকর্তার নাফরমানি করি মহান দিবসের শাস্তির।'[১]

এ আয়াতটি মুখস্থ করে নিন। সব সময় স্মরণ রাখবেন।

ভয়ের মধ্যে কল্যাণ

এমন ভয় আমাদের পূর্বপুরুষদের হৃদয়ে জাগ্রত হতো। যদি ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে কেয়ামতের দিন এর জন্য লাঞ্ছনা সইতে হবে। দুই ও দুইয়ে চারের ব্যাপারে মানুষের যেমন বিশ্বাস হয়, পরকালের ব্যাপারে আমাদের মনীষীগণের এমন বিশ্বাস ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর সম্মুখে আমাকে হাজিরা দিতে হবে। ফুজায়েল ইবনে আয়ায ভয়ের ব্যাপারে বলেন–

مَنْ خَافَ لِلّٰهِ دَلَّهُ الْخَوْفُ عَلٰى كُلِّ خَيْرٍ

'যে-ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, তার ভয় তার সকল বিষয়ের কল্যাণের ওপর দলিল।'

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১৫

আবুল হুসাইন (রহ.) বলেন–

اَلْخَوْفُ زِمَامٌ بَيْنَ اللهِ تَعَالٰى وَبَيْنَ عَبْدِهٖ

'ভয় আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি রশির সমতুল্য।'

প্রাণীদের যেমন লাগাম থাকে; মালিক সেটা আঁকড়ে ধরে; সে কোনো দিকে যেতে পারে না, তেমনি ভয় আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি রশি।

وَاِنِ انْقَطَعَ زِمَامُهٗ هَلَكَ مَعَ الْهَالِكِيْنَ

'যখন সেই রশি কেটে চলে যাবে, তখন ধ্বংসশীলদের মতো সে-ও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ভয়কারীদের নিদর্শন

ভয়ের কতিপয় নিদর্শন থাকে। বলা হয়েছে–

(১) اللسان বা জবান : জবানের ক্ষেত্রে ভয়ের নিদর্শন হচ্ছে–

يَمْنَعُهٗ مِنَ الْكِذْبِ وَالْغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمِ وَالْبُهْتَانِ وَكَلَامِ الْفُضُوْلِ

'ভয় জবানকে বিরত রাখে মিথ্যা, গীবত, অপবাদ ও অহেতুক বচন থেকে।'

দুটি গোনাহ বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এক. গীবত বা অন্যের দোষ বর্ণনা করা। এত নিরাপদে গীবত করে, যেন এটা খুবই উত্তম কাজ। নিষেধ করলে বলে, আমরা তো বাস্তব কথা-ই বলছি, কোনো মিথ্যা তো বলিনি। ভাই! বাস্তব কথাকেই 'গীবত' বলে। মিথ্যা হলে সেটা 'অপবাদ' হবে। সুতরাং গীবত সম্পর্কে এ অনুভূতি-ই নেই যে, এটা কবীরা গোনাহ। কেমন কবীরা গোনাহ? হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

'গীবত ব্যভিচার হতেও মারত্মক অপরাধ।'

দুই. মোবাইল ফোনে গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বলা। বর্তমানে এটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এক-দুই মিনিট নয়, ঘন্টার-পর-ঘন্টা কথা চলছে। বিধর্মীদের চাতুরি দেখুন। তাদের নেটওয়ার্ক হলো, কথা চলুক সারা রাত। বড়-বড় সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছে। জাহান্নাম ভালো করে খরিদ করে নাও।

(২) القلب বা অন্তর : অন্তরের মধ্যে ভয়ের আলামত কী?

يَخْرُجُ مِنْهُ الْعَدَاوَةُ وَالْحَسَدُ وَالْعُدْوَانُ

পরনিন্দা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা দূরীভূত হবে। পরনিন্দা, অহমিকা ও বিদ্বেষ অন্তর থেকে চলে যাবে। এটি ভয়কারীদের পরিচয়। যদি গায়রে মাহারামের সঙ্গে অবৈধ ভালোবাসা থাকে, তাহলে সেটা চলে যাবে।

(৩) النظر বা দৃষ্টি : দৃষ্টিতে ভয়কারীদের আলামত হলো–

فَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْحَرَامِ

'অবৈধ বস্তুর প্রতি তাকাবে না।'

যে বস্তু হতে শরীয়ত নিষেধ করেছে, তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে।

(৪) البطن বা পেট : উদরের মধ্যে ভয়কারীদের নিদর্শন হলো–

لَا يَدْخُلُ فِيْهِ الْحَرَامُ

'তার মধ্যে হারাম প্রবেশ করবে না।'

কোনো প্রকার সন্দেহযুক্ত কিংবা অবৈধ বস্তু সে খাবে না। ভুলক্রমে এ ধরনের কোনো কিছু ভেতরে গেলে তার পেট খারাপ হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে তো বিধর্মীদের রেষ্টুরেন্টের অভাব নেই। তার একটি হলো 'পিজাহাট'। আমি বলি 'পিছে হটো'। ওই সমস্ত রেষ্টুরেন্টের খাবার মুসলমানরা তৈরি করে না। বরং এসবের ফর্মুলা বহির্বিশ্ব থেকে আসে। এগুলো হতে দূরে থাকা চাই। নিজের ঘরে বানিয়ে খাও; কেউ বাধা দেবে না। তবে যদি ডাক্তার নিষেধ করে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ঘরে না খেলে হালাল-হারাম যাচাই করে খাবেন। সুদ থেকে বেঁচে থাকবেন। ঘুস, চাঁদাবাজি ও প্রতারণার একটা লোকমা চল্লিশ দিনের ইবাদতের মাধুর্য বিনষ্ট করে দেয়।

আমাদের তরিকার উচ্চস্তরের বুযুর্গ ছিলেন হযরত খাজা মির্জা মাযহার জান জানাঁ (রহ.)। তাঁর শিষ্য ছিলেন খাজা গোলাম আলী দেহলভী (রহ.)। একদা কোনো এক বিয়ের অনুষ্ঠানে খাজা গোলাম আলী (রহ.)-এর খেতে হলো। এক-দুই লোকমা খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, এই খাবার সঠিক নয়। তিনি খানা বাদ দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, এই দু-তিন লোকমা খাবারে আমার বাতেনি অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। আমার মুরশিদ খাজা মির্জা জান জানাঁ (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, হুজুর! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার নিকটাত্মীয় লোক ছিল। তার

মনোরঞ্জনের জন্য আমি খাবারে অংশ গ্রহণ করি। এক-দুই লোকমা আহারের সঙ্গে-সঙ্গে আমি বুঝে নিলাম, এ খাবার সন্দেহযুক্ত। আমি খানা পরিহার করলাম। কিন্তু সামান্য খাবারেই আমার অবস্থার পরিবর্তন এসে গেছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমার নিকট এসো। আমি মুরাকাবার মাধ্যমে তোমাকে খাস তাওয়াজ্জুহ দেব।

তিনি বলেন, আমি প্রতিদিন শায়খের নিকট যাচ্ছি আর তিনি খাস তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছেন। সেই দুই-তিন লোকমার আঁধার কাটতে চল্লিশ দিন সময় লেগেছে। তারপর সেই অন্ধকার দূর হয়েছে। এখনো সেই হারামের আঁধার আমাদের ছেয়ে আছে। কিন্তু আমরা কি কোনো বুযুর্গের খেদমতে সময় দিতে পারছি? সুতরাং ভাই! পেটটাকে হারাম থেকে বাঁচাও।

(৫) اليد বা হাত : হাতের মধ্যে ভয়ের লক্ষণ বিদ্যামান।

فَلَا تَمُدُّ اِلَى الْحَرَامِ

'সে হারামের প্রতি সম্প্রসারিত হবে না।'

কাউকে কষ্ট দেবে না। কাউকে অশান্তিতে ফেলবে না। কারো ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করবে না।

(৬) القدم বা পা : পায়ের মধ্যে হারামের আলামত হলো–

فَلَا يَمْشِىْ اِلٰى مَعْصِيَةٍ وَذُنُوْبٍ

'এই পায়ের দ্বারা, গোনাহ ও গর্হিত কাজের দিকে অগ্রসর হবে না।'

জালেমদের সঙ্গে গমন করবে না। কেননা, নবীজি ইরশাদ করেছেন, যেব্যক্তি জেনেশুনে কোনো জালেমের সঙ্গে যায়, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ সমস্ত আলামত দ্বারা বোঝা যায়, তার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিরাজ করছে কিনা।

ভীতদের অবস্থা

বন্ধুগণ! এমন কতিপয় অবস্থা রয়েছে, যার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, তার অন্তরে কোনো ভয় সঞ্চারিত হচ্ছে কিনা।

(১) مغموم বা চিন্তামগ্ন থাকা : সর্বপ্রথম অবস্থা হলো, সে সারাক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকবে। কোন ব্যাপারে? অতীতের গোনাহের স্মরণে। দুটি শব্দ রয়েছে (১) حزن বা চিন্তা (২) هم এটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে ভাবনা। حزن এর সম্পর্ক অতীতের সঙ্গে আর هم এর সম্পর্ক ভবিষ্যতের সঙ্গে? সুতরাং ভীতসন্ত্রস্ত লোকের জন্য চিন্তা অবশ্যক।

(২) غم বা ভাবনার প্রাধান্য থাকা : দ্বিতীয় হলো ভাবনার প্রাধান্য থাকবে। কোন ভাবনা? পরকালে কী হবে? সুতরাং গোনাহের কারণে حزن বা চিন্তা এবং কেয়ামতের দিনের আগমনের কারণে هم বা ভাবনাগ্রস্ত থাকবে।

(৩) بے چینی বা অস্থিরতা : অস্থিরতা বিরাজ করে। কোন অস্থিরতা?

حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

'জমিন পূর্ণ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।'[১]

যেমন– আমাদের বুযুর্গগণ বলতেন, জাহান্নামের আগুনের ভয় আমাদের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। হযরত আতা আসলামি (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি রাতে উঠে ইবাদত করে আয়না দেখতেন। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, রাতের বেলায় আয়না দেখেন কেন? তিনি বললেন, দেখছি আমার চেহারাটা বিকৃত করা হচ্ছে কিনা। একে বলে خوف ভয়।

(৪.) অধিক ক্রন্দন করা : মানুষ সর্বদা কাঁদে। যে বান্দার অন্তর নরম হয়, তার চোখের পানি গরম হয়। এ দুটির মধ্যকার সম্পর্ক দেহের সঙ্গে গেঞ্জির সম্পর্কের অনুরূপ। একটির সঙ্গে আরেকটি পাওয়া যাবেই। অন্তর নরম হলে অশ্রু গরম হবে। অন্তর নরম না হলে অশ্রু গরম হবে না। চোখ থেকে অশ্রু আসবেই না। সুতরাং মহব্বতকারী ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মধ্যে ভাবনা থাকবেই। চোখে শিথিলতা এলে বুঝতে হবে, অন্তরে শিথিলতা রয়েছে। চোখে নম্রতা থাকলে আল্লাহর ভয়ে কেঁদে উঠবে।

কোনো কবি বলেন–

آیا ہی تھا خیال آنکھیں چھلک پڑیں * آنسو تمہاری یاد کے کتنے قریب ہیں

'স্মরণ হতেই নয়ন সিক্ত হয়ে যায়। অশ্রু তোমার স্মরণের কতটুকু নিকটে।'

সুতরাং আল্লাহর স্মরণ হলেই নয়ন সিক্ত হওয়া চাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

'আল্লাহর যিকির করা হলে তাদের অন্তর ভীত হয়ে যায়।'[২]

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

২. সূরা আনফাল : আয়াত ২

(৫.) প্রকম্পিত হওয়া (বিনিত ভাবে প্রার্থনা করা) : পঞ্চম আলামত হলো রাত-দিন আনুনয়বিনয় করা, নামাযে, প্রার্থনায়, সামনে, পেছনে আল্লাহর সম্মুখে নাক ঘর্ষণ করা।

(৬.) আরাম বর্জন করা : আরামের ও বিশ্রামের সুযোগ হয়; কিন্তু তা পরিহার করে।

কোনো কবি বলেন–

مرغ دل را گلشن بہتر ز کوئے یار نیست

طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست

হৃদয়ের পাখির জন্য প্রেমিকের গলি হতে বাগান উত্তম নয়। দর্শনপ্রার্থীদের জন্য ফুল ও বাগানের কোনো আকর্ষণ থাকে না।

(৭.) অন্তরে ভয় : সর্বশেষ আলামত হলো, আল্লাহর ভয়ে হৃদয় ভরপুর হয়ে যাবে। আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানি (রহ.) احوال الصادقين নামক গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লামা হাসান বসরি (রহ.)-এর হৃদয়ে এমন ভয় ছিল যে, তিনি দূরে কোথাও থেকে এলে মনে হতো, কোনো তরুণ তার পিতাকে কবরে রেখে এসেছে। তার চেহারা পিতার বিচ্ছেদে হৃদয়ের বেদনার মলিন চেহারার মতো মলিন হতো। আর বসলে পরে বোঝা যেত, যেন কোনো ফাঁসির আসামি বসে আছে।

রাবেয়া বসরি এমন কাঁদতেন যে, তাঁর কান্নার অশ্রু যেস্থানে পতিত হতো, সেখানে নতুন ঘাস গজিয়ে উঠত। কিতাবে আছে, পরবর্তী কালে কেউ এলে মনে করত, তিনি এখানে উজু করেছেন। ইমাম আযম (রহ.)-এর এক ছাত্র বলেন, আমি ছোট বেলায় মাঝে-মাঝে ইমাম সাহেবের বাড়িতে থেকে যেতাম। কারণ, আমার পিতা ইমাম সাহেব (রহ.)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাহাজ্জুদের মধ্যে তাঁকে দেখতাম যে, তেলাওয়াতের সময় এমনভাবে কাঁদতেন যে, সেই কান্নার পানির ফোঁটা মাটিতে পড়ত। মনে হতো যেন বৃষ্টি হচ্ছে। এ ছিল তাঁর কান্নার রূপ।

خوف-এর স্তরসমূহ

এই ভয় কেন হয়?

خَوْفٌ مِّنْ سُوْءِ الْخَاتِمَةِ

'শেষ পরিণাম খারাপ হওয়ার ভয়।'

আমাদের পরিণাম কী হবে তা আমাদের জানা নেই। তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। সুতরাং অন্তরে ভয় থাকা চাই। বালআম বাউরের ঘটনা ওলামায়ে কেরাম পড়েছেন। তিনশ বছর ইবাদত করেছিল। কিন্তু শেষ ফল খারাপ হয়েছে।

সুতরাং ওলামায়ে কেরাম কাঁদেন যে, না জানি আমার পরিণাম কী হয়।

خَوْفٌ مِّنْ مَكْرِ اللهِ تَعَالٰى

'আল্লাহর কৌশলের ভয়।'

আল্লাহ বলেন–

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللهِ

'তারা কি আল্লাহর কৌশল হতে নিরাপদ হয়ে গেছে?'[১]

ওলামায়ে কেরাম জানেন হযরত আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি (রহ.)-এর সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হয়েছিল।

خَوْفٌ مِّنْ تَقْصِيْرِ الْفَرَائِضِ الْمَنْصَبِيَّةِ

'ফরজ বিধান পরিপালনে ত্রুটির ভয়।'

خَوْفٌ مِّنْ رَدِّ الْاَعْمَالِ

'কৃত আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়।'

আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'আমি আপনার যথাযত ইবাদত করতে পারিনি।'

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাতভর ইবাদত করেছেন। হারাম শরীফে যিয়ারতের জন্য গেলেন। তাওয়াফ করলেন। মাকামে ইবরাহীমে দু-রাকাত নামায আদায় করে বলছেন, হে আল্লাহ!

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'আমি যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করতে পারিনি।'

এটি হলো ভয়, যার দ্বারা হৃদয়ে চিন্তা সৃষ্টি হয়।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৯

خَوْفٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ

'আল্লাহর শাস্তির ভয়।'

আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে পৃথিবীতেও শাস্তি পরকালেও যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি। আল্লাহ বলেন–

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ

'এ হলো শাস্তি আর পরকালের শাস্তি আরো কঠোর।'[১]

ভয়-এর ফলাফল

যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার রয়েছে।

(১) تَمْكِيْنٌ فِي الْأَرْضِ

পৃথিবীতে আশ্রয়দান।

যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে, আল্লাহ তাদের পৃথিবীতে আশ্রয় দেবেন। আল্লাহ বলেন–

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

'তারপর আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তোমাদের বাসস্থান দেব। তা ওই ব্যক্তির জন্য, যে কেয়ামতের দিন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আমার শাস্তির ভয় রাখে।'[২]

সুতরাং আল্লাহ ভয়কারীদের পা জমিনে স্থিতিশীল রাখেন।

(২) **কেয়ামতের দিন মুক্তি :** ভয়কারীদের আল্লাহ কেয়ামতের দিন মুক্তি দান করবেন। আল্লাহ বলেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤١﴾

'যে-ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে আর নিজের আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে। নিশ্চয় তার ঠিকানা জান্নাত।'[৩]

(৩) **আরশের ছায়া :** আল্লাহ ভয়কারীদের আরশের তলে ছায়া দান করবেন। বলা হয়েছে–

---

১. সূরা কলম : আয়াত ৩৩
২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ১৪
৩. সূরা নাযিয়াত : আয়াত ৪০, ৪১

يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ

'যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন।'

(৪) **ক্ষমার কারণ :** এই ভয় ক্ষমা পাওয়ার কারণ হবে। হাদীছ শরীফে এসেছে, বনী ইসরাইলের একব্যক্তি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে গিয়েছিল, আমি জীবনে কোনো পুণ্যের কাজ করিনি। এ অবস্থায় আল্লাহর সামনে আমি মুখ দেখাতে পারব না। সুতরাং আমি মারা যাওয়ার পর আমার মরদেহ জ্বালিয়ে অর্ধেক ছাই পানিতে এরং অর্ধেক ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিয়ো। লোকেরা তা-ই করল। আল্লাহ বাতাস ও পানিকে নির্দেশ দিলেন। তারা সবগুলো ছাই একত্রিত করে উপস্থিত করে দিল। ছাই জমা হলো। আল্লাহ তাদের আদেশ করলেন দাঁড়িয়ে যাও। তারা দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার বান্দা! তুমি এমন করলে কেন? সে জবাব দিল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি কোনো পুণ্যের কাজ করিনি। আমার সারাটা জীবন গোনাহে ভরপুর। এই অবস্থায় আপনার সামনে উপস্থিত হয়ে অবশ্যই শাস্তি পাব। তাই আপনার শাস্তির ভয়ে আমি এমন করেছি। আল্লাহ বললেন, সত্যিই যদি তুমি আমাকে বড় মনে করে, আমার শাস্তির ভয়ে এমন করে থাক, তাহলে যাও, আমি তোমার জীবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিলাম।

(৫) **আল্লাহর সন্তুষ্টি :** যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পায়। এর চেয়ে বড় কোনো ইবাদত হতে পারে না। আল্লাহ বলেন–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

' আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'[১]

এটা তাদের প্রতিদান, যারা আল্লাহকে ভয় করত। সুতরাং ভয়ের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়।

সাহাবায়ে কেরামের ভয়

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহকে কেমন ভয় করতেন তার কিছু উদাহরণ শুনুন। হযরত আবুবকর (রাযি.) রাসূলের সঙ্গী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

---

১. সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ৮

ثَانِيَ اثْنَيْنِ

'দুজনের একজন।'

এটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর শানে বলা হয়েছে।

নবীজি বলেছেন–

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

'আমি উম্মতের কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আবুবকরকে আমার বন্ধু বানাতাম।'

অন্য হাদীছে এসেছে–

فَسُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِيْ بَكْرٍ

'মসজিদে নববীতে যাদের দরজা খোলা আছে একমাত্র আবুবকরের দরজা ব্যতীত সকল দরজা বন্ধ করে দাও।'

নবীজি বলেন–

إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ

'আমার প্রতি সকলের অনুগ্রহের প্রতিদান আমি দিয়ে দেব। কিন্তু আবুবকর! তোমার অনুগ্রহের প্রতিদান আমি পরকালে দেব।'

বলা হয়েছে–

اَرْأَفُ أُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ أَبُو بَكْرٍ

'উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সহানুভূতিশীল হচ্ছেন হযরত আবুবকর (রাযি.)।' হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَرْحَمُ أُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ أَبُو بَكْرٍ

'উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু আবুবকর।'

উভয়টিই হাদীছের শব্দ। তিনি এত দয়াবান ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যার দরুন তাকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আল্লাহ বলেন–

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

'কেয়ামতের দিন তাকে খুশি করা হবে।'[১]

---

১. সূরা লাইল : আয়াত ২১

নবীজি বলেন, কেয়ামতের দিন কিছু মানুষের ঘর এমন হবে–

إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ

'যেমন তোমরা আকাশের নক্ষত্র দর্শন কর তেমনি উচ্চস্তরের জান্নাতিরা নিম্নস্তরের জান্নাতিদের বাসস্থান অবলোকন করবে।'

وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنَا مَعَهُمْ

'আর নিশ্চয় আবুবকর ও ওমর তাদের থেকে। আর আমিও তাদের সঙ্গে থাকব।'

তিনি হচ্ছেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। নবীজি বলেন– জান্নাতের দশটি দরজা থাকবে। ওই দরজা দিয়ে অমুককে ডাকা হবে, সেই দরজা দিয়ে অমুককে ডাকা হবে। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন,

فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا

'এমন কেউ থাকবে কি, যাকে প্রত্যেক দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে?'

قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

নবীজি বললেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করছি, তুমি তাদের থেকে হবে।

এমন একজন মর্যাদাবান সাহাবি! আর তিনি তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন আর জান্নাতিদের আলোচনা হলে বলতেন, আমার ভয় হলো, এমন যেন না হয় যে, আমাকে তাদের থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। আফসোস! যদি আমি একটি বৃক্ষ হতাম, হে পাখিরা! তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা ফল খাচ্ছ আর ছায়াতে বসছ। তোমাদের কোনো হিসাব হবে না। আফসোস হে আবুবকর! যদি আমি আপনার মতো হতে পারতাম!

তিনি এমন করতেন কেন? চিন্তা ছিল, ঈমানের মতো নেয়ামত হনন করা না হোক। অদৃশ্য পাকড়াও না হোক।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভয়

হযরত ওমর (রাযি.) যার ঈমান গ্রহণের ফলে ইসলাম বিজিত হয়েছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন–

إِنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ كَانَ فَتْحًا، وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا

'ওমরের ঈমান গ্রহণ ছিল ইসলামের বিজয় এবং তাঁর হিজরত ছিল ইসলামের সাহায্য।'

নবীজি বলেন–

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ

'আমার পরে কোনো নবীর আগমন থাকলে অবশ্যই সে হতো ওমর।'

বলা হয়েছে–

اَلْحَقُّ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ

'হক ওমরের জবানে কথা বলত।'

হযরত ওমর (রাযি.) যে-রাস্তায় গমন করতেন, শয়তান সেই রাস্তা ছেড়ে দিত।

كَانَ رَأْيُهُ مُوَافِقًا لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ

তার মতামত ওহী ও কুরআনের মোতাবেক হতো। তিনি আশারায়ে মুবাশশরার একজন। নবীজি বলেন–

আমার দুজর সাথি আছে দুনিয়াতে। দুজন সাথি আছে আখেরাতে। দুনিয়ার সাথিরা হলো আবুবকর ও ওমর।

এমন একজন মর্যাদাবান সাহাবি সর্বদা ভীত থাকতেন। তিনি পরকালের ব্যাপারে বলেন–

وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ لِيْ طِلَاءَ الْاَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهٖ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ

'আল্লাহর শপথ, যদি আমার মালিকানায় পৃথিবীপরিমাণ সোনা থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতাম আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পূর্বে।'

তিনি আরো বলেন, আমার ও আমার মায়ের ধ্বংস হোক যদি আমার ওপর অনুগ্রহ না করা হয়! আফসোস! যদি আমি ঘাস হতাম! আফসোস! যদি আমার মা আমাকে জন্মই না দিতেন? যদি আমি কোনো বস্তু না হতাম! আফসোস! যদি আমি চিরতরে ভুলে যাওয়া কোনো কিছু হতাম!

হযরত ওমর (রাযি.) আল্লাহর ভয়ে এত কাঁদতেন যে, তাঁর দু-চোখের নিচে গালের মধ্যে দাগ পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহু আকবার! নিজ শাসনামলে হযরত হুযায়ফা (রাযি.)কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হুযায়ফা! আমি জানতে পেরেছি, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মুনাফিকদের নাম বলেছেন। এ-ও শুনেছি যে, এদের কথা কারো নিকট বলতে তিনি

নিষেধ করেছেন। তাই আমি তোমার নিকট তাদের নাম জানতে চাচ্ছি না। শুধু এতটুকু জানতে চাই, ওই নামগুলোর তালিকায় ওমরের নাম আছে কিনা।

শাহাদাতের সময় তাঁর ওপর আক্রমণ হলে ছেলেকে ডেকে বললেন, বাবা! আমাকে যে আঘাত করা হয়েছে, তাতে আমি নিশ্চিত, আমি চলে যাব। সুতরাং আমার কাফন-দাফনে বিলম্ব করো না। তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ো। ইবনে ওমর (রাযি.) বললেন, জি আব্বাজান! তাড়াতাড়িই করব। পুনরায় ডেকে বললেন, তাড়াতাড়ি করো। বললেন, জি আব্বাজান! দ্রুতই সেরে নেব। আবার ডেকে তা-ই বললেন। এবার ইবনে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাজান! এতবার বলছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, বাবা! তাড়াতাড়ি করার কথা এজন্য বলছি যে, আমি যদি পুণ্যবান হই, তাহলে তাড়াতাড়ি আমার মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আর যদি বদকার হই, তাহলে তোমাদের কাঁধ থেকে আমার বাহন তাড়াতাড়ি নেমে যাবে।

আল্লাহু আকবার! হযরত ওমর (রাযি.)-এর ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন কেয়ামতের দিন তাঁর সঙ্গে কী আচরণ করা হবে।

হযরত ওছমান (রাযি.)-এর ভয়

হযরত ওছমান (রাযি.) সেই সাহাবি, যার আগমনে নবীজি নিজের চাদর ঠিক করে নিয়েছিলেন। পায়ের গোছা ঢেকেছিলেন, হযরত আয়েশা (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর পূর্বে আরো অনেকে এসেছেন; কিন্তু আপনি এত সতর্ক হননি। নবীজি বললেন–

يَا عَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ وَاللهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَحْيِي مِنْهُ

হে আয়েশা! আমি কি এমন ব্যক্তির আগমনে লজ্জাবোধ করব না, যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জাবনত হয়।

নবীজি ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ

'প্রত্যেক নবীর সঙ্গী থাকবে। জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে ওছমান।'

একদা হযরত ওছমান (রাযি.) কয়েকশ উটভর্তি মাল নবীজির দরবারে পেশ করেন। এতে নবীজি এত আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন–

مَا عَمِلَ عُثْمَانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا

ওছমান যে কাজ করেছে, এর পর কেউ এমন কাজ করেননি।'

জনৈক সাহাবি বর্ণনা করেন, আমি নিজকানে শুনেছি, নবীজি তাহাজ্জুদের সময় দু'আ করছেন–

اَللّٰهُمَّ عُثْمَانُ رَضِيْتُ عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ

'হে আল্লাহ! ওছমানের প্রতি আমি সন্তুষ্ট। তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।'

বাইয়াতে রেদওয়ানের সময় হযরত ওছমান (রাযি.) অনুপস্থিত ছিলেন। নবীজি নিজের একটি হাত অপর হাতের ওপর রেখে বললেন, এটি আমার হাত আর এটি ওছমানের হাত। নিজের হাতকে ওছমানের হাত বানালেন। সুবহানাল্লাহ! সেই ওছমান (রাযি.) যিনি দুই নূরের অধিকারী তিনি আল্লাহকে কেমন ভয় করতেন? তিনি বলতেন-

لَوْ وَقَفْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَخُيِّرْتُ بَيْنَ اَنْ اَصِيْرَ رَمَادًا اَوْ اُخَيَّرَ اِلٰى اَيِّ دَارٍ فِيْهِ لَاخْتَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ رَمَادًا

'যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দণ্ডায়মান করিয়ে আমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে, আমি মাটি হয়ে যাব অথবা হিসাব গ্রহণের পর এ দুই ঘরের কোনো একটিতে প্রেরণ করা হবে, তাহলে আমি অবশ্যই মাটি হওয়া গ্রহণ করব।'

হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার ভয় করতেন, আমি এর যোগ্য নই। স্মরণ রাখবেন, সেখানকার ব্যাপারটা অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর সঙ্গে। আমাদের অন্তরে গোনাহের ভাবনা এলে সেটাও তিনি জানেন। অতঃপর যখন পাপে লিপ্ত হই, তখনো তিনি দেখেন। সেই মালিকের সামনে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হলে কী অবস্থা হবে?

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ۝

'তিনি চোখের খেয়ানতের অবস্থা এবং হৃদয়ে লুকানো বিষয় সম্পর্কেও অবগত।'[১]

---

১. সূরা মুমিন : আয়াত ১৯

আমরা গোনাহ করে ভুলে যাই। আমলনামায় তো তা লিপিবদ্ধ থাকে তাওবা না করা পর্যন্ত।

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.)-এর ভয়

হযরত আবুদ্দারদা দামেশকের বিচারপতি। তাঁকে বলা হয়, حَكِيْمُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ এ উম্মতের সুযোগ্য বিচারপতি। سَيِّدُ الْقُرَّاءِ بِدِمَشْقَ দামেশকের কারীগণের নেতা ছিলেন। তাঁর ভাই সালমান (রাযি.) বললেন, ভাই! তুমি অনেক রোযা রাখছ, যার দরুন শরীর জীর্ণশীর্ণ হতে যাচ্ছে। নিজের দেহের প্রতি একটু সচেতন হও। নবীজিও সেই কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন–

يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ

হে আবুদ্দারদা! সালমানের কথা সত্য। তোমার ওপর তোমার দেহের হক রয়েছে। আবুদ্দারদা বললেন–

لَاَنْ اَسْتَيْقِنَ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى لَقَدْ تَقَبَّلَ لِيْ صَلَاةً وَاحِدَةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

'যদি জানতে পারি, আল্লাহর দরবারে আমার একটি নামায কবুল হয়েছে, তাহলে সেটি আমার দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব হতে উত্তম।'

বার্ধক্যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। কেউ বলল, আপনার দৃষ্টিশক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন–

مَا فَرَغْتُ بَعْدُ دُعَائِيْ لِذُنُوْبِيْ فَكَيْفَ اَدْعُ لِعَيْنِيْ

'আমার গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা হতে এখনো অবসর হইনি। সুতরাং চোখের জন্য দু'আ করব কীভাবে।'

হযরত আবুযর গিফারি (রাযি.)-এর ভয়

তিনি পঞ্চম নম্বরে মুসলমান হয়েছেন। নবীজি ইরশাদ করেন–

اُمِرْتُ اَنْ اُحِبَّ اَرْبَعًا وَاَخْبَرَنِيَ اللهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ

'চারজনকে ভালোবাসার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহও তাদের ভালোবাসেন।'

উক্ত চারজনের একজন হচ্ছেন হযরত আবুযর গিফারি (রাযি.)। দেখুন, নবীজি বলছেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন চারজনকে ভালোবাসার জন্য। আর তাঁদের একজন হলেন আবুযর গিফারি (রাযি.)।

তিনি বলতেন–

وَدِدْتُ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنِىْ يَوْمَ خَلَقَنِىْ شَجَرَةً تُعِيْضُدُ

'আল্লাহ যেদিন আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিন যদি আমাকে বৃক্ষ বানিয়ে দিতেন, তবেই আমি খুশি হতাম।'

হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর ভয়

অগ্রগামী সাতজনের একজন হলেন হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)। নবীজি বলেন–

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

'প্রত্যেক উম্মতে একজন করে বিশ্বস্ত জিম্মাদার থাকে। এই উম্মতের বিশ্বস্ত জিম্মাদার হচ্ছে আবু উবায়দা ইবনে জাবরাহ।

আরেকটি বিস্ময়কর কথা হলো, নবীজি বলেন–

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا لَوْ شِئْتُ لَاَخَذْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهٖ اِلَّا اَبَا عُبَيْدَةَ

তোমাদের মধ্যে আবু উবায়দা এমন ব্যক্তি যে, কারো নিকট হতে আমি চরিত্র গ্রহণ করলে আবু উবায়দা হতে গ্রহণ করতাম।

সেই তিনি কী বলতেন শুনুন–

وَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ كَبْشًا وَيَذْبَحُوْنِىْ اَهْلِىْ وَيَاْكُلُوْنَ لَحْمِىْ وَيَشْرَبُوْنَ مَرَقِىْ

'আফসোস! যদি আমি কোনো প্রাণী হতাম আর পরিবারের লোকজন জবাই করে আমার গোশত খেয়ে নিত!

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)-এর ভয়

মুহাদ্দিছগণের সরদার, হাফেযগণের সরদার, মুজতাহিদগ ও ফকীহদের ইমাম হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো নবীজির প্রিয় সাহাবি। অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন–

اَصْبَحْتُ فِىْ صَعُوْدٍ مُهْبِطَةٍ عَلٰى جَنَّةٍ اَوْ نَارٍ فَلَا اَدْرِىْ اِلٰى اَيَّتِهِمَا يُسْلَكُ بِىْ

'আমি একটি ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যার গন্তব্য জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। কিন্তু আমি জানি না, এই পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে!'

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.)-এর ভয়

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) গোপন তত্ত্বের অধিকারী ছিলেন। নবীজি তাঁকে গোপন তত্ত্বের বিষয়ে বলেছিলেন। সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে কান্নাকাটি করলে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি পৃথিবী থেকে চলে যচ্ছি এজন্য কাঁদছি না। বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে,

لَا اَدْرِیْ عَلَامَا اُقْدَمُ عَلَی الرِّضَا اَوْ عَلٰی سَخَطٍ

'আমি তো জানি না, কোথায় পৌঁছব। আল্লাহর সন্তুষ্টি পাব, নাকি, অসন্তুষ্টি পাব।'

হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-এর ভয়

তিনি হলেন–

سَیِّدُ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

'জান্নাতের তরুণদের নেতা।'

নবীজি ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا

হে আল্লাহ! আমি তাদের ভালোবাসি। তুমিও তাদের ভালোবাসো।'

তিনি মৃত্যুকালে বলেন–

اِنِّیْ اُقْدَمُ عَلٰی عَظِیْمٍ وَهَوْلٍ لَمْ اُقْدَمْ عَلٰی مِثْلِهٖ قَطُّ

'আমি এমন একটি মহান বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, আজ পর্যন্ত তার অনুরূপ কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হইনি।'

কেয়ামত দিবসের কেমন ভয় ছিল তাঁর অন্তরে!

আবুহুযায়ফা (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম সালেম-এর ভয়

তাঁর ব্যাপারে নবীজি বলেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ فِیْ اُمَّتِیْ مِثْلَكَ

'আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি তোমার মতো মানুষ আমার উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছেন।'

এর চেয়ে আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, নবীজি ইরশাদ করেন–

اِنَّ سَالِمًا شَدِيْدُ الْحُبِّ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'সালেমের হৃদয়ে আল্লাহর গভীর ভালোবাসা রয়েছে।'

নবীজি এমন স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তিনি বলতেন–

وَدِدْتُ اَنِّيْ بِمَنْزِلَةِ اَصْحَابِ الْاَعْرَابِ

'আমি যদি বদ্দুদের একজন হতাম, তবেই আমি খুশি হতাম যে, জান্নাতে ও যাব না, জাহান্নামেও যাব না।'

হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-এর ভয়

হযরত সালমান ফারসি (রাযি.) অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে নবীজি ইরশাদ করেন–

اَنَا سَابِقُ وُلْدِ آدَمَ وَسَلْمَانُ سَابِقُ الْفُرْسِ

'আমি আদম সন্তানের অগ্রগণ্য আর সালমান পারস্যের অগ্রগণ্য।'

নবীজি আরো ইরশাদ করেন–

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ

'সালমান আমার পরিবারের অন্তভুর্ক্ত।'

আর সেই মহান পুরুষ বলছেন–

ثَلَاثٌ اَحْزَنَنِيْ حَتّٰى اَبْكَانِيْ فِرَاقُ مَحَمَّدٍ وَحِزْبِهٖ وَهَوْلُ الْمُطَّلَعُ وَالْوُقُوْفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا اَدْرِيْ اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَى النَّارِ

'তিনটি জিনিস আমাকে চিন্তিত করেছে; এমনকি কাঁদিয়েছে।

(১) নবীজি ও তাঁর সাহাবাদের বিচ্ছেদ।

(২) ভবিষ্যতে আগন্তুক বিষয়ের ভয়।

(৩) মহান পরওয়ারদেগারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া। আমি তো জানি না, জান্নাতে যাব, নাকি জাহান্নামে যাব।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ভয়

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

اَفْقَهُ نِسَاءِ الْاُمَّةِ

'উম্মতের সমস্ত মহিলাদের মাঝে অধিক জ্ঞানী।'

নবীজি তাঁকে বললেন–

يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرَائِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ

আয়েশা! ইনি হচ্ছেন জিবরাঈল। তিনি তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।

আরব দেশে নামের উচ্চারণ পরিপূর্ণ করা হয় খুব কম। একে আরবি ব্যাকারণে منادى مرخم বলা হয়। সুতরাং তাদের রীতি অনুযায়ী عائشة এর স্থলে عائش বলা হয়েছে। তাঁকে ফেরেশতা সালাম জানালেন। তাঁর সম্পর্কে নবীজি বলেন–

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلٰى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ

'সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আয়েশার ফযিলত সমস্ত খাবারে ছারীদ-এর ফযিলতের মতো। নবীজি হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)কে বললেন–

وَاللّٰهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَاَنَا فِيْ لِحَافِ اِمْرَاَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرَهَا

'একমাত্র আয়েশা ব্যতীত তোমাদের কারো বিছানায় থাকা অবস্থায় আমার ওপর ওহী নাযিল হয়নি।'

যাঁর এমন মর্যাদা, তিনি বলেন–

فَوَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

আল্লাহর শপথ! আমি একথা ভালোবাসি যে, আমি যদি চিরতরে ভুলে যাওয়া বস্তু হতাম!

গাছ দেখে বলছেন–

يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ وَرَقَةً مِّنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

আফসোস! যদি আমি এই বৃক্ষের পাতা হতাম!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.)-এর ভয়

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.)-এর জন্য নবীজি দু'আ করলেন–

رَحِمَ اللهُ اِبْنَ رَوَاحَةَ

'আল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর রহমত নাযিল করুন।'

আর তিনি বলতেন–

اِنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ اَنِّيْ وَارِدُ النَّارِ وَمَا اَدْرِيْ اَنَاجٍ مِّنْهَا اَمْ لَا

'আমি জানি, নিশ্চয় আমাকে জাহান্নামের ঘাটে অবতরণ করানো হবে। কিন্তু আমি তো একথা জানি না যে, আমাকে সেই আগুন হতে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর ভয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মুহাদ্দিছগণের সরদার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেন–

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ

আবদুল্লাহ কতইনা উত্তম মানুষ!

অন্য হাদীছে এসেছে–

اِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ

'নিশ্চয় আবদুল্লাহ পুণ্যবান মানুষ।'

আর তিনি বলেন–

لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى تَقَبَّلَ مِنِّيْ سَجْدَةً وَاحِدَةً اَوْ صَدَقَةَ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْمَوْتِ

'আমি যদি জানতে পারি, আমার একটি সেজদা অথবা একটি টাকার সদকা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে, তাহলে আমার নিকট মৃত্যুর চেয়ে অধিক পছন্দনীয় কোনো বস্তু থাকবে না।'

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর ভয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নিজেও সাহাবি। তাঁর পিতাও সাহাবি। বর্তমানেও তো বলা হয় ওলী ইবনে ওলী। সুতরাং তিনি সাহাবি

ইবনে সাহাবি। এমন পরিবারের লোক ছিলেন যে, নবীজি তাঁদের সম্পর্কে বলেন–

نِعْمَ اَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللهِ وَاَبُوْ عَبْدِ اللهِ وَاُمُّ عَبْدِ اللهِ

'আবদুল্লাহ ও তার পিতামাতার পরিবার কতই-না উত্তম।

কেমন পরিবার, যে পরিবারের ব্যাপারে নবীজি স্বীকৃতি দিয়েছেন!

তিনি বলতেন–

وَاللهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ هٰذِهٖ

আল্লাহর শপথ! আমার আকঙ্ক্ষা হয়, যদি আমি এই (খুঁটি) হয়ে যেতাম!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ভয়

ফকীহগণের ইমাম, এ উম্মতের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং দুটি হিজরতকারী, যাঁর ব্যাপারে নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, তোমরা তার পায়ের গোছা দেখে হেসো না।

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَهُمَا اَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ اُحُدٍ

'ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় এ দুটি (গোছা) মিযানের পাল্লায় উহুদ পাহাড় অপেক্ষাও ভারী হবে।'

মৃত্যুকালে উপস্থিত লোকদের বললেন–

لٰكِنْ هٰهُنَا رَجُلٌ وَدَّ اَنَّهٗ اِذَا مَاتَ لَمْ يُبْعَثْ

'এখানে এমন ব্যক্তি আছে, যে একথা ভালোবাসে যে, হায়! যদি মৃত্যুর পর আর জীবিত না হতাম!

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযি.)-এর ভয়

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযি.) মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি। তিনি বলেন–

وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ كَبْشًا لِاَهْلِيْ فَذَبَحُوْنِيْ فَشَوَوْنِيْ كَلُوا لَحْمِيْ

আফসোস! যদি আমি ভেড়া বা দুম্বা হতাম আর পরিবারের লোকেরা জবাই করে আমার গোশত ভুনা করে খেয়ে ফেলত!

হযরত ফুজালা ইবনে উবায়েদ (রাযি.)-এর ভয়

হযরত ফুজালা ইবনে উবায়েদ (রাযি.) বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবি, যাঁর ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণের প্রতি খুশি যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল।'[১]

তিনি বলেন–

لِاَنْ اَعْظَمَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَقَبَّلَ مِنِّيْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

'মহান আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে দানাপরিমাণ আমল গ্রহণ করলে সেটি আমার জন্য দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু হতে উত্তম হবে!'

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর ভয়

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) বাইয়াতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। দাড়ি-গোঁফবিহীন তরুণ ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ইসলামের মুখপাত্র ও দূত বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেন–

يَجِيْءُ مُعَاذٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَامَ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ

'কেয়ামতের দিন মু'আয (রাযি.)কে ওলামায়ে কেরামের নেতা বানিয়ে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।'

অন্য হাদীছে এসেছে–

يُبْعَثُ لَهُ رَتْوَةً فَوْقَ الْعُلَمَاءِ

'কেয়ামতের দিন মু'আয (রাযি.)কে ওলামায়ে কেরামের সামনে একটি উঁচুস্থানে উপস্থিত করা হবে।'

নবীজি তাঁকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণের সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোনো বিষয় (মামলা) উপস্থাপিত হলে কী করবে? তিনি উত্তর দিলেন, কুরআনের বিধানমতো রায় দেব। জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনে সমাধান না পেলে? বললেন, আপনার হাদীছ অনুযায়ী সমাধান দেব। জিজ্ঞেস করলেন, হাদীছেও না পেলে তখন? বললেন, আমি নিজে গবেষণা করে এর মীমাংসা দেব। তখন নবীজি বললেন–

---

১. সূরা ফাত্হ : আয়াত ১৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ بِمَا یَرْضٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ

'আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আল্লাহর রাসূলের দূতকে এমন তাওফীক দিয়েছেন।'

যাঁর প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট, তাঁর সম্পর্কে নবীজি আরো বলেন–

اَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

'আমার উম্মতের মধ্যে হালাল-হারাম সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত।'

হাদীছে শরীফে এসেছে, নবীজি তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় মদীনার বাইরে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তিনি একটি বাহনে আরোহিত আর নবীজি তাঁর বাগডোর হাতে আঁকড়ে ধরে চলছেন। সবশেষে একটি বিস্ময়কর কথা বললেন–

یَا مُعَاذُ اِنَّكَ عَسٰی اَنْ لَّا تَلْقَانِیْ بَعْدَ عَامِیْ هٰذَا

'হে মু'আয! হতে পারে, এই বছরের পর তুমি ফিরে আসবে। তখন তোমার-আমার সাক্ষাৎ না-ও হতে পারে।'

وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِیْ وَقَبْرِیْ

'আর সম্ভবত তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে।'

বিদায়ের ক্ষণে নবীজি তাঁকে এ সমস্ত কথা বললেন। শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন নবীজি বললেন–

یَا مُعَاذُ اِنِّیْ لَاُحِبُّكَ فِی اللّٰهِ

'হে মু'আয! আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি।'

এ হলো আল্লাহর হাবীবের বাণী!

আর তিনি বলছেন–

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَسْكُنُ رَوْعُهٗ حَتّٰی یَتْرُكَ جِسْرَ جَهَنَّمَ وَرَاءَهٗ

'নিশ্চয় মুমিনের ভয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাপ্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাহান্নামিদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম না করবে।'

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটি আপনার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি পরহেযগারদের উদ্ধার করব এবং জালেমদের সেখানে অবনত অবস্থায় ছেড়ে দেব।'[১]

তাবেয়ীগণের ভয়

উল্লিখিত ভয়ের বিবরণ ছিল সাহাবায়ে কেরামের। এবার তাবেয়ীগণের ভয়ের কিছু বিবরণ শুনুন।

হযরত ইবরাহীম নাখয়ি (রহ.) বলেন–

وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا تَلَجْلَجَ فِيْ حَلْقِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

'আল্লাহর শপথ! আমি চাই, যদি আমার প্রাণ আমার কণ্ঠদেশে আটকা পড়ে যেত আর এমতাবস্থায় কেয়ামত হতো, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে শাস্তি দেওয়া হতো না।'

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ (রহ.) বলেন–

وَاللهِ لَوْ أُتِيْتُ بِالْمَغْفِرَةِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى لَاَهَمَّنِي الْحَيَاءُ مِنْهُ مِمَّا قَدْ صَنَعْتُ

'আল্লাহর কসম! যদি কেয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমাও করে দেওয়া হয়, তবু আমার লজ্জা লাগবে যে, আমি পৃথিবীতে কী করেছিলাম।'

হযরত ইমাম আ'মাশ (রহ.)-এর সম্পর্কে হযরত শাফেয়ি (রহ.)-এর ওস্তাদ হযরত ওয়াকী' (রহ.) বলেন, হযরত আ'মাশ (রহ.)-এর সত্তর বছর পর্যন্ত তাকবীরে উলা ছোটেনি। আর সেই আ'মাশ বলেন–

وَمَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ الْبُكَاءِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِيْ

'আমার অশ্রুকে আমি বারণ করতে পারিনি। কারণ, আমি জানি, আমি কী কর্ম করেছি।'

হযরত হাসান বসরি, যাকে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) লালনপালন করেছেন, তার মা হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর সেবিকা ছিলেন। কোনো প্রয়োজনে কোথাও গেলে এই ছেলে যদি কাঁদত, তাহলে আম্মাজান হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) তাঁকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে দুধ পান করাতেন। তখন তো আর বর্তমান যুগের মতো ফিডার ছিল না। তাই

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭১, ৭২

নিজের দুধই পান করাতেন। একদা আম্মাজান তাঁকে হযরত ওমর (রাযি.)-এর দরবারে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁকে দু'আ দিয়ে দেন। হযরত ওমর (রাযি.) তাকে কুলে তুলে দু'আ দিলেন-

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَحَبِّبْهُ اِلَى النَّاسِ

'হে আল্লাহ! আপনি একে দীনের জ্ঞান দান করুন এবং একে মানুষের প্রিয়পাত্র বানান।'

আজ দেখুন, আল্লাহ হযরত হাসান বসরি (রহ.)কে কেমন ভালোবাসা দান করেছেন। সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবে। আর তিনি বলেন–

وَدِدْتُ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ قَبِلَ لِيْ سَجْدَةً وَاحِدَةً

'যদি জানতাম, আল্লাহ আমার একটিমাত্র সেজদা কবুল করেছেন, তাহলে তা আমার কাছে খুবই ভালো লাগত।'

ইবনে আইয়াশ (রহ.)-এর আযাদকৃত গোলাম যিয়াদ বলেন–

وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنَّهُ حَمَانِيْ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَلَا اُعَذَّبُ بِالنَّارِ

'আল্লাহর কসম! আমি শুধু এটা জানতে চাই যে, আল্লাহ আমাকে পরকালের শাস্তি হতে রক্ষা করে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিয়েছেন।'

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) বলেন–

يَوَدُّ اَنْ لَّا يَكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'সে (নিজের আত্মা) চায়, যদি সে কোনো বস্তু না হতো আর তার থেকে কোনো হিসাব গ্রহণ না হতো!

ইমাম যয়নুল আবেদীন কী আশ্চর্য কথা বলেছেন! তিনি বলেন–

اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمْ يَبْقَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ اِلَّا كَانَ اللّٰهُ فِيْهِ مَشِيْئًا اِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَآءَ غَفَرَلَهُ

'কেয়ামতের দিন যেকোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও প্রেরিত নবী সবারই মাঝে শুধুই আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর থাকবে। ইচ্ছে হলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছে হলে ক্ষমা করবেন।'

এটি কাদের আলোচনা করা হচ্ছে? নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও প্রেরিত নবীগণের আলোচনা। কারণ, ওই দিন নবীগণও নাফসী-নাফসী বলতে থাকবেন আর কাঁদবেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভয়

বন্ধুগণ! অতীতের আলোচনা পূর্ণ করছি যে, নৈকট্যশীলদের বিনয় ও ভয়ের অবস্থা অবলোকন করুন। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর বন্ধু ছিলেন। তাঁর অবস্থা কেমন ছিল?

وَاِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَثِيْرُ الْبُكَاءِ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَقَالَ لَهُ اَلْجَبَّارُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ هَلْ رَأَيْتَ خَلِيْلًا يَخَافُ خَلِيْلًا

'নিশ্চয় হযরত ইবরাহীম (আ.) অধিক পরিমাণে কাঁদতেন। তাঁর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) আসতেন আর বলতেন, আল্লাহ আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন আর আমাকে বলেছেন, তুমি কি কোনো বন্ধুকে দেখছ, যে নিজের বন্ধুকে ভয় করে? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন–

يَا جِبْرِيْلُ اِذَا ذَكَرْتُ خَطِيْئَتِيْ نَسِيْتُ خُلَّتِيْ

'হে জিবরাঈল আমার নিজের ভুলের কথা স্মরণ হলে আল্লাহর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা ভুলে যাই।'

নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের ভয়

তাহারাতুল কুলূব গ্রন্থে লেখা হয়েছে–

وَلَمَّا مَكَرَ بِاِبْلِيْسَ لَعَنَهُ اللهُ طَفِقَ جِبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

'আল্লাহ যখন অভিশপ্ত করে ইবলিসকে তাড়িয়ে দেন, তখন সেই অবস্থা অবলোকন করে হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.) কাঁদতে শুরু করেন।'

اَوْحَى اللهُ تَعَالٰى اِلَيْهِمَا مَا لَكُمَا تَبْكِيَانِ كُلَّ هٰذَا الْبُكَاءِ

'আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাঁদছ কেন?'

তারা জবাব দিলেন–

يَا رَبِّ مَا نَأْمَنُ مَكْرَكَ

'আপনার কৌশল হতে আমরা নিরাপদ নই।'

আল্লাহ বললেন–

هٰكَذَا كُوْنَا لَا تَأْمَنَا مَكْرِيْ

'এমনই হও। আমার কৌশল হতে নিরাপদ হয়ো না।'

আমি যা চাই তা-ই করি। নিষ্পাপ ফেরেশতারা আল্লাহর কৌশলকে ভয় করেন আর আমরা গোনাহ করেও উদাসীন থাকি।

নবীজির ভয়

হযরত ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন, সুদক্ষ মানুষ কোনো কাঁচা কথা বলেন না। তাই এ কথাটি বর্ণনা করছি।

رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ خَوَّفَنِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْاَهْوَالِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى اَبْكَانِيْ

'নবীজি ইরশাদ করেন, হযরত জিবরাঈল কেয়ামতের ভয়ানক অবস্থার দ্বারা আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাতে আমি এমন ভয় পেলাম যে, তা আমাকে কাঁদাল।'

فَقُلْتُ لَهُ حَبِيْبِيْ اَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِيْ وَمَا تَأَخَّرَ

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার বন্ধু (জিবরাঈল)! আল্লাহ কি আমার পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করেননি?'

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَتُشَاهِدَنَّ مِنَ الْاَهْوَالِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا يُنْسِيْكَ الْمَغْفِرَةَ

'তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে আপনি আপনার ক্ষমার কথা ভুলে যাবেন।'

وَبَكٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَلَّتْ دُمُوْعُهُ لِحْيَتَهُ

'(তারপর) আল্লাহর রাসূল এমন কাঁদলেন যে, অশ্রুতে দাড়ি মোবারক ভিজে গেল।'

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ভয়

হযরত জিবরাঈ (আ.) আল্লাহর রাসূলের খেদমতে আসছেন আর বায়তুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, ভাই জিবরাঈল! কী প্রার্থনা করছ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি দু'আ করছি

اِلٰهِیْ وَسَیِّدِیْ لَاتُغَیِّرْ اِسْمِیْ وَلَاتُبَدِّلْ جِسْمِیْ

'হে আমার প্রভু, হে আমার মালিক! আমার নামটা পরিবর্তন করো না এবং আমার দেহটাকে বিকৃত করো না।'

উদ্দেশ্য কী? আমি স্বচক্ষে শয়তানকে আল্লাহর দরবারে অভিশপ্ত হতে দেখেছি। ওই সময় হতে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ আপনি আযাযিল নাম পরিবর্তন করে ইবলিস নাম রেখে দিয়েছেন। আপনি ইবাদতগোযার ফেরেশতাদের জামাত থেকে তাকে বের করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার নামটা পরিবর্তন করো না। হে আল্লাহ! আমার দেহটাকে এই ফেরেশতাদের জামাত থেকে বের করো না।

কান্না জরুরি

যারা আল্লাহর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানে, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে। রাজাধিরাজের সামনে কেয়ামতের দিন হাজিরা দিতে হবে। সুতরাং তারা সেই ভয়ে কাঁদেন। কোনো কবি বলেন–

بَكَيْتُ عَلَى الذُّنُوْبِ لِعَظْمِ جُرْمِیْ * وَحَقَّ لِكُلِّ مَنْ يَّعْصِی الْبُكَاءُ

فَلَوْ كَانَ الْبُكَاءُ يَرُدُّ هَمِّیْ * لَاَسْعَدَتِ الدُّمُوْعُ مَعًا دِمَاءً

'আমার বিরাট আপরাধের দরুন আমি কাঁদছি। যারা গোনাহ করে তাদের জন্য কাঁদা উচিত। এ কান্না যদি আমার চিন্তা দূর করতে পারে, তাহলে অশ্রুর সঙ্গে রক্ত ঝরলেও আমি সৌভাগ্যবান।'

অন্য এক কবি বলেন, কান্নার মধ্যে কী কোমলতা রয়েছে, তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কান্নার হৃদয় নর্দমার ময়লা দূরীভূত করে প্রিয়জনের চেহারার দর্শন আনয়ন করে। তুমি আল্লাহর স্মরণে কান্নকারী হও। তবে জাহান্নামে যেতে হবে না। আশেক জানে কান্নার মর্ম। কান্না ছাড়া কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। অন্তরের কান্না চাই। ভালোবাসার মধ্যে নিজেকে উজাড় করে কাঁদা জরুরি। কেউ কাঁদে দেখার জন্য, কেউ চায় উপস্থিতি। ভালোবাসার প্রধান অংশ কান্না। সে শত বাধা ও দূরত্ব অপসারণ করে নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়। সাক্ষাৎ হোক বা না হোক কাঁদতে হবেই।

আজ আমরা গোনাহের দরুন হৃদয় খুলে কাঁদব। তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। আমাদের জীবনে একটি আমল ও এমন নেই, যা আমাদের মালিকের সামনে উপস্থিত করতে পারব, যা

গ্রহণযোগ্য হবে। অবশেষে একথা বলতে পারি, হে আল্লাহ! শৈশবে আম্মা-আব্বা আঙুল ধরে হাঁটা শেখাতেন। সেই শৈশব আজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। চুল সাদা হয়ে গেছে। হে মালিক! এই সাদা চুলের আত্মমর্যাদা রক্ষা করুন। হে মালিক! কত বড়-বড় সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন আপনার ভয়ে কম্পমান হতেন! হায়! আমরা কোন জমিনের গাজর-মুলা! (নগণ্য বস্তু) আমাদের সময়ইবা কী আছে? আমাদের আমলনামায় তো আমরা গুনাহ ছাড়া কিছুই দেখছি না, হে আল্লাহ! আমরা দাঁড়িপাল্লায় উঠার যোগ্য নই। কেয়ামতের হিসাব থেকে আমাদের রেহাই দাও। আমাদের ওপর অনুগ্রহ করো।

কোনো কবি কত সুন্দর বলেছেন-

إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيْدُهُمْ * فِيْ رِقِّهِمْ أَعْتَقُوْهُمْ عِتْقَ أَحْرَارِ

وَأَنْتَ يَا سَيِّدِيْ أَوْلَى بِذَا كَرَمًا * قَدْ شَبَّتْ فِي الرِّقِّ فَأَعْتِقْنِيْ مِنَ النَّارِ

'হে আল্লাহ! আমরা দেখে থাকি, বাদশাহর গোলাম যখন খেদমত করতে-করতে বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তারা সেই বৃদ্ধদের আযাদ করে দেয়। হে আমাদের মালিক! আমরাও কালেমা পাঠ করতে-করতে বৃদ্ধ হয়েছি। আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।'

কারণ, আপনি তো এই বাদশাহদের চেয়ে বহুগুণ সম্মানী। হে আল্লাহ! আমাদের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও। ভবিষ্যতে এমন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

মুনাজাত

میں تیرا سامنے جھک رہا ہوں خدا

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

'তোমার সামনে আমি মাথানত করছি হে আল্লাহ!
তুমি ছাড়া কেউ নেই আমার হে আল্লাহ!'

میں گناہ گار ہوں میں سیاہ کار ہوں

میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں

'আমি গুনাহগার, আমি পাপী
আমি অপরাধী, আমি শাস্তির উপযোগী।'

میرے سجدے میں تیری ہی حمد و ثنا

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

'আমার সেজদায় তোমার প্রশংসা-ই গুঞ্জরিত হয়
তুমি ছাড়া আমার আর কেউই নেই।'

میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ

مجھ گناہ گار کو توبہ دینا سزا

'আমি তাওবা করছি– তাওবা হে দয়াময়!
আমার মতো পাপীকে তাওবার শাস্তি-ই দাও।'

میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

'আমার আর্তনাদগুলো শ্রবণ করো হে পালনকারী!
তুমি ছাড়া আমার আর কেউ যে নেই হে আল্লাহ!'

مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے

وہ تیرے نام ہی ٹلی ہے

'যখনই কোনো বিপদে পড়েছি

তোমার নামের বরকতেই তার বিদূরিত হয়েছে।'

مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

'সমস্যার সমাধান করো হে সমাধানকারী!

তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই হে আল্লাহ!'

میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا

نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا

'আমি ক্ষমাশীল' এ তো তুমিই বলেছ।

না-না শাহবাজের তুমি ছাড়া কেউ নেই আর!'

بخش دونگا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

'তোকে ক্ষমা করে দেব' এই প্রতিশ্রুতি ছিল তোমার

তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যে হে আল্লাহ!'

দীনের দাওয়াতের স্তর

'যে-সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ইল্‌মের খেদমত করছেন, তারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করছেন।

তবে এটা বলতে পারেন যে, দাওয়াতের কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। তুমি যদি জনগণের বাহবা পাওয়ার আশায় বক্তৃতা কর, তাহলে এই বক্তৃতা তোমার জাহান্নামের যাওয়ার কারণ হবে। আর যদি হৃদয়ে ব্যথা থাকে, নবীর দীনের মহব্বত থাকে, উম্মতের ফিকির থাকে যে, এ মহল্লার সকল মানুষ যেন নামাযী হয়ে যায়, এই এলাকার প্রতিটি ঘর থেকে অশ্লীলতা দূরীভূত হোক, গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র বিনাশ হোক, সমস্ত ঘরে নবীর সুন্নত জারি হোক, এ নিয়তে শিক্ষা দিলে, বক্তৃতা করলে তোমার এ-কাজ দীনের দাওয়াত হিসেবে গণ্য হবে।'

দীনের দাওয়াতের স্তর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

তিন প্রকারের মানুষ

আল্লাহ মানবজাতিকে বিবেক দ্বারা ধন্য করেছেন। এটা আল্লাহর মহান নেয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য প্রাণী হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিবেকের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার।

১. বিবেক ব্যবহারকারী : প্রথম প্রকার হলো, তারা সূচনা থেকেই বিবেকের ব্যবহার করে না। তাদের আবেগ, অনুভূতি তাদের বিবেকের ওপর প্রাধান্য হয়ে যায়। তাই তারা এমন কাজ করে, যা দেখে দর্শক হতবাক হয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত হলো মূর্তিপূজক। তারা গোবৎসের পূজা করে, বটগাছের পূজা করে, সাপের পূজা করে। সুতরাং মূর্তিপূজকরা প্রথম থেকেই বিবেকশূন্য। তাদের বিবেক এই শিক্ষা দেয় না যে, তোমরা সৃষ্টির পূজা করছ কেন; সৃষ্টিকর্তা তো অন্যজন?

২. যারা বিবেককে কাজে লাগায় না : দ্বিতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছে, যারা শুরু থেকে বিবেককে ব্যবহার করে। যা বিবেকের অনুকূলে হয়, তা গ্রহণ করে আর যা কিছু বিবেকবহির্ভূত হয়, তা বর্জন করে। তারা হলো নাস্তিক ও বস্তুবাদী। বিজ্ঞান স্বীকৃতি দিলে সেটা মানে আর বিজ্ঞানবহির্ভূত হলে সেটা

পরিহার করে। যদি কোনো স্বর্ণকারের পাল্লায় পাহাড় উঠানো হয়, তাহলে তাকে নির্বোধ ছাড়া কী বলবেন? সুতরাং ভাই! বিবেকের পাল্লায় আল্লাহকে অনুমান করা সম্ভব নয়। রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন।

৩. **বিবেক ও অহী উভয়কে ব্যবহারকারী :** তৃতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছে যারা বিবেকও ব্যবহার করে আবার যেখানে বিবেকের গতির পরিসমাপ্তি ঘটে, সেখানে অহীর ইল্‌মের ওপর আমল করে। তারা হলো ঈমানদার মুসলমান। এর একটি সরল উদাহরণ শুনুন। কোনো বিচারক আপনাকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের বাড়ি থেকে এক হাজার মাইল দূরে যে পাহাড়টা রয়েছে, তার চূড়ায় যাও। এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের মানুষ পাবেন–

১. এক দল মানুষ প্রথম থেকেই পায়ে হেঁটে ঘর থেকে বের হবে আর পায়ে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছা করবে। এরা হচ্ছে বিবেকশূন্য মানুষ।

২. দ্বিতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছে, তারা ভাবছে, দীর্ঘ যাত্রা; সুতরাং পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তারা বাহন নিচ্ছে। আর সেই বাহনের মাধ্যমেই পাহাড় চড়তে শুরু করছে। ফলে পাহাড়ের মধ্যখানে গিয়ে বাহনসহ নিচে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে।

৩. তৃতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছে, তারা বাহন দিয়ে বাড়ি থেকে রওনা করেছে। পাহাড়ের নিকট গিয়ে বাহন নিচে রেখে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে আরোহণ করছে। ফলে তারা পাহাড়ের চূড়ার পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

অতএব, প্রথম প্রকার মানুষ হচ্ছে মূর্তিপূজক, যারা প্রথম থেকেই পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করছে। তাদের পক্ষে পাহাড়ে পৌঁছা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে বিবেকের ওপর নির্ভরশীল লোক। তারা পাহাড়ের নিকট পৌঁছেও তার চূড়ায় বিবেকের মাধ্যমে আরোহণ করতে চেয়েছে। ফলে মধ্যপথে হোঁচট খেয়ে বাহনসহ পড়ে গেছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় প্রকার লোক হচ্ছে ঈমানদার মুসলমান যারা যতটুকু পর্যন্ত বিবেক কার্যকর ছিল ততটুকু বিবেকের বিবেচনায় বাহনে যাচ্ছে। অতঃপর পাহাড়ে উঠতে আল্লাহপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যবহার করে চূড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

বিবেকের পরিধি

ইসলাম একথা বলে না যে, তোমরা বিবেক দ্বারা কোনো কাজই করো না। বরং পবিত্র কুরআনে স্থানে-স্থানে বিবেকের ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। দেখুন, কুরআনে বলা হয়েছে اَلَمْ تَرَ তোমরা দেখছ না কেন? اَلَمْ تَرَ তোমরা

একটু দেখো। أَفَلَمْ يَنْظُرْ তোমরা দেখছ না কেন? সুতরাং ইসলাম চোখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়নি। ইসলাম চোখ খুলে দেখার কথা বলেছে। তোমরা চোখ খুলে দেখো আল্লাহর সৃষ্টিকূলকে; এতে তোমরা আমার নিদর্শন পাবে। সুতরাং ইসলামের সৌন্দর্য হলো, যদি শরীয়ত বুঝে আসে, তবে এক্ষেত্রে বিবেককে মানদণ্ড বানানো যাবে না। যেখানে ঈমানের বিষয় সামনে আসে, সেখানে বিবেককে রেখে দিতে হবে। কবি বলেন–

اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

'অন্তরের কাছে বিবেক প্রহরী থাকা ভালো। তবে কোনো-কোনো সময় তাকে একাও ছাড়তে হবে। যেখানে ঈমানের বিষয় সামনে আসে, সেখানে বিবেককে একদিকে রেখে দেওয়া এটাও ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা।'

দুনিয়া হচ্ছে উপকরণের ঘর

ধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয়, এ পৃথিবী হচ্ছে উপকরণের ঘর। আর এই উপকরণের মাধ্যমেই আল্লাহ এ পৃথিবীটা পরিচালনা করছেন। তবে সেই উপকরণের পেছনে দৌড়াবে না। উপকরণের আবিষ্কারকের প্রতি তাকাও। দেখো, তিনি কীভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। নিজের ইচ্ছামতো সেগুলো পরিচালনা করছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর যমানায় প্লাবন আসবে। আল্লাহ হযরত নূহ (আ.)কে বললেন-

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

'আমার নির্দেশ অনুযায়ী আমার চোখের সামনে কিশতি তৈরি করো।'[১]

এর ডিজাইন আমি বলে দিলাম। আমার পরামর্শমতো কাজ করো। ভাই! কিশতি বানানোর তো প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো এমনিতেই বাঁচাতে পারতেন। তুফান কী করতে পারত? কিন্তু না, উপকরণের অধীনে জীবন যাপন করার শিক্ষা দিয়েছেন। উপকরণ গ্রহণ করো। সুতরাং মানুষ কাজ করবে। সাথে-সাথে তাকদীরের ওপরও বিশ্বাস রাখবে। কাজ আমি করছি; কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে। যে এমন করতে পারবে, সে সফল হবে। হযরত মারয়াম (আ.) ব্যথায় অস্থির। নির্দেশ হচ্ছে–

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৩৭

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

'খেজুরকাণ্ডটা নিজের দিকে টান দাও। ও তোমার জন্য তাজা খেজুর পরিবেশন করবে।'[১]

ভাই! আল্লাহ চাইলে এমনিতেই তাকে খেজুর দিতে পারতেন। কিন্তু না, আল্লাহর ইচ্ছা হলো, তুমি কাজ করো। খেজুরের শাখাটা নিজের দিকে নূয়ে আনো, নাড়া দাও, খেজুর পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার কাজ।

হযরত ইউসুফ (আ.) যুলায়খার ফাঁদে পড়লেন। তিনি জানেন, দরজা বন্ধ রয়েছে। ছোট একটি শিশু যদি জানে যে, দরজা বন্ধ রয়েছে, তাহলে সে দরজার দিকে অগ্রসর হবে না। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.) একজন বিবেকবান লোক। ইল্‌ম ও জ্ঞানের আধার। যুলায়খা যখন বলল–

هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ

'এস আমার কাছে। সে বলল, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই।'[২]

ইউসুফ (আ.) দরজার দিকে আগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দরজা বন্ধ; কিন্তু দরজা পর্যন্ত জায়গাটা তো আমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। সুতরাং এতটুকু জায়গা পাড়ি দেওয়ার কাজ তো আমার থেকে সম্পন্ন হবে। বাকিটা আমার আল্লাহ করবেন। দরজা পর্যন্ত পলায়ন করা আমার কাজ আর দরজার পরের ব্যবস্থাপনা আমার আল্লাহর কাজ। তিনি দরজা পর্যন্ত গেলেন। আল্লাহ্ সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে দিলেন।

সুতরাং এ পৃথিবীতে উপকরণের মাধ্যমে কাজ করে যে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে, সে কামেল মানুষ। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, যার চরিত্র যত কামেল হয়, তার জীবনযাত্রা তত বেশি সাধারণ হয়। তিনি আসলে কেমন মানুষ বোঝা-ই যায় না। বাহ্যিকভাবে সাধারণ মানুষ মনে হয়। এমনকি নবীজির জীবনও সাদাসিধে ছিল। বাহ্যিক রূপে কাফেররা তাঁকে সাধারণ মানুষই মনে করত। কুরআনে বলা হয়েছে-

مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

'এ কেমন রাসূল, যে খাবারও খায়, বাজারেও যায়।'[৩]

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৫
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩
৩. সূরা ফুরকান : আয়াত ৭

সাধারণ মানুষের জীবন ছিল। এটিই হচ্ছে নবীজির পূর্ণতার নিদর্শন বা প্রমাণ। নবীজি সাহাবাদের সঙ্গে বসে আছেন। অপরিচিত কেউ এলে তাকে জিজ্ঞেস করতে হতো, নবী কোনজন? তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? দেখুন, নবীজির জীবন কেমন সাধারণ ছিল। সুতরাং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যার ওঠাবসা থাকবে, সে তত মর্যাদাবান হবে।

আল্লাহ সমস্ত উপকরণের মূল

আমরা এ-পৃথিবীতে উপকরণ গ্রহণ করব; কিন্তু তার ওপর ভরসা করব না। নির্ভরশীলতা হবে আমাদের প্রতিপালকের ওপর। তিনি চাইলে উপকরণসমূহ আমাদের উপযোগী করে দেন। চাইলে বিপরীত করে দেন।

একলোক দুধ পান করছে। সে সুস্থতা পেয়েছে। বাহাদুর হয়েছে। আরেকজন দুধ পান করছে। সে ডায়রিয়া হয়ে মারা গেছে। এদিকেও দুধ, সেদিকেও দুধ। বোঝা গেল, এর প্রভাব বিস্তারকারী মহান আল্লাহ। একব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করছে। হঠাৎ সামনে সাপ দেখে চিৎকার দিয়ে বের হয়ে গেছে। তার দুই মিনিট পর ঘরের ছাদ ধসে গেছে। এখানে বিষধর সাপ ওই লোকের জন্য বেঁচে থাকার উপকরণ হয়েছে। যদি সে ঘরে প্রবেশ করার পর ছাদটা ধসে যেত, তাহলে কী হতো?

আরেক লোক বরযাত্রী হয়ে গেছে। নিচে প্রচণ্ড গরম। তাই বাতাস উপভোগ করার জন্য ছাদের উপরে উঠেছে। সহসা কোনো চিল একটা বিষাক্ত সাপ নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক ওই লোকের মাথার ওপর এসে চিলের পাঞ্জা থেকে সাপটা নিচে তার মাথার ওপর পড়ে যায়। সাপ তাকে দংশন করে। সে মারা যায়। সেখানে জীবন বাঁচার মাধ্যম হলো সাপ আর এখানে জীবন ধ্বংসের কারণ হলো সাপ।

সুতরাং এই বাহ্যিক উপকরণ পাত্রের মতো। চাইলে তাতে পানিও রাখতে পার, চাইলে মদও রাখতে পার। আর ইচ্ছা করলে তাতে দুধ কিংবা মধুও রাখতে পার। অতএব, উপকরণও এরকমই। আল্লাহ চাইলে তার দ্বারা সম্মানী করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে এর দ্বারা অপমানের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিতে পারেন। এখানেই মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য। কাফের বাহ্যিক উপকরণের ওপর ১০০% ভরসা করে আর মুমিন আল্লাহর ওপর ১০০% নির্ভরশীল হয়।

কোনো কবি বলেন–

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی * مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

মূর্তির প্রতি ভরসা আর আল্লাহ থেকে নিরাশা! তাহলে আমাকে বলো কুফরি কোন জিনিসের নাম?

উপকরণ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর সত্তার ওপর ভরসা করা

সুতরাং আমরা উপকরণ গ্রহণ করা চাই। কৌশল গ্রহণ করা চাই। কিন্তু তাকদীরের ওপর ভরসা রাখা চাই। ভরসা করে বসে থাকা নয়। আল্লাহর সত্তার ওপর ভরসা করে তাঁর বিধান পালন করব। তবেই আল্লাহ লাঞ্ছনার চিত্র থেকে পরিত্রাণ দিয়ে আমাদের সম্মানের জীবন দান করবেন। আমাদের অস্থিরতা দূর করে সুখময় জীবন দেবেন।

পবিত্র কুরআনে একটি ঘটনা এসেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে লাঠি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَآرِبُ أُخْرٰى ﴿١٨﴾

'তোমার ডান হাতে কী হে মূসা? বলল, এটা আমার লাঠি। এর ওপর আমি ভর করি। এটা দ্বারা গাছের পাতা ছিঁড়ে আমার মেষপালদের খাওয়াই। এছাড়াও এটা আমার অনেক কাজের উপকরণ।'[১]

সব ধরনের উপকারের কথা বলার পর আল্লাহ বললেন–

أَلْقِهَا يَا مُوْسٰى

'হে মূসা এটা জমিনের ওপর একটু রাখো।'[২]

فَأَلْقٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

'মূসা সেটা জমিনে রাখল। সহসা সে একটা অজগর সাপ হয়ে নড়াচড়া করতে লাগল।'[৩]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৭, ১৮
২. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৯
৩. সূরা ত্বহা : আয়াত ২০

সাপ দেখে মূসা (আ.) ভয় পেয়ে গেলেন। আল্লাহ বললেন–

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾

'ওটা ধরো আর ভয় পেও না। আমি তাকে পূর্বের আকৃতিতে নিয়ে আসব।'[১]

মূসা (আ.) সাপটা ধরলেন। সেটা লাঠিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখানে কোনো ম্যাজিক দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা দেওয়া, হে আমার প্রিয় মূসা! যার দ্বারা এত উপকার গণনা করছ, আমার নির্দেশে সেটা জমিনে রাখলে তখন তা ক্ষতিকর বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল। অতঃপর যে অজগর দেখে তুমি আতঙ্কিত হয়েছিলে, আমার নির্দেশে তাতে হাত লাগালে তখন পুনরায় তোমার উপকারী বস্তু লাঠি হয়ে গেল।

সফলতা ও সম্মান আল্লাহর আদেশের ওপর নির্ভরশীল

এখানে আল্লাহ একটি শিক্ষা দিয়েছেন। সেই শিক্ষা আজও আমাদের জন্য বিরাজমান। পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, হে ঈমানদারগণ! এই ঘটনাটি পাঠ করো আর বুঝে নাও। মহা ক্ষমতাধর মালিকের বিধান স্মরণ করো। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষতিকর বস্তুর প্রতি অগ্রসর হবে। আল্লাহ সেটাকে তোমার উপকারের বিষয়ে পরিণত করে দেবেন। তাঁর বিধানমতে বাহ্যিক অপমানের বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হও, আল্লাহ সেটা তোমার সম্মানের কারণ বানিয়ে দেবেন। তোমরা আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরো তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করো। লৌকিকতার জীবন নয়, এটা তো কাফেরদের জীবন। যা দেখ তাই করো না। মুমিন সেই জীবন গ্রহণ করে না। মুমিন আল্লাহর বিধান অবলোকন করে। তার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমাদের জীবন এমনই হওয়া চাই।

একটু ভেবে দেখুন, ক্ষমতা ও সম্পদ ফেরাউনের অপমানের কারণ হলো আর সেই ক্ষমতা ও সম্পদ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সম্মানের কারণ হলো। কারণ কী? কারণ হচ্ছে, ফেরাউন সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) সেটা ব্যবহার করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর। সে লাঞ্ছনা পেল আর তিনি সম্মান পেলেন। কারুনের জন্য জমিন ফেটে গেল; সে তার ভেতরে চলে গেল।

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ২১

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ

'তাকে (কারুন) তার বাড়িসহ আমি জমিনে ধসিয়ে দিলাম।'[১]

কারুনের জন্য জমিন ফাটল। সেটা তার জন্য অবমাননার কারণ হলো। পক্ষান্তরে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্য জমিন বিদীর্ণ হলো। এটা তাঁর সম্মানের উপকরণ হলো। কেননা, কারুন আল্লাহকে নারাজ করেছে। তাই জমিনের ফাটল তার অপমানের মাধ্যম হয়েছে। আর হাজেরা সন্তানের জন্য আল্লাহকে ডাকছেন। আল্লাহ তার উসিলায় যমযম কূপ জারি করে দিলেন।

এজন্য আরাম যদি দীনের সঙ্গে আসে, তাহলে সেটা সম্মানের শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছায়। পক্ষান্তরে সেই আরাম অবাধ্যতার সঙ্গে এলে সেটা লাঞ্ছনার গহ্বরে নিপতিত করে। ফেরাউন আরাম পেয়েছে নাফরমানির সাথে, সেটা তার অপমানের সঙ্গী হয়েছে। আর সুলায়মান (আ.) আরাম পেয়েছেন অনুগত্যের সঙ্গে। সেটা তাঁর সম্মানের উৎস হয়েছে। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা শরীয়তের বিপরীত চক্রান্ত করল। পরিণামে অপমানের গ্লানি মাথায় নিল। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে গোনাহ হতে বেঁচে রইলেন। আল্লাহ তাঁকে সম্মানের শাহী আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। ফলাফল এই হলো যে, আমাদের চেষ্টা-তদবীর, কৌশল-চক্রান্ত স্ব-স্বস্থানে পড়ে থাকে আর সফলতা আসে আল্লাহর নির্দেশে। মুমিনের অন্তরে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

আল্লাহর নেয়ামতের প্রাচুর্য তাঁর সন্তুষ্টির দলিল নয়

নেয়ামতের আগমন-প্রস্থান, তার উত্থান-পতন আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির দলিল নয়। অনেক টাকা ইনকাম হয়। এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির সামান্যও কারণ হতে পারে? না! অনেক লোক অত্যন্ত অসহায়। এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে? না! এগুলো কিছুই নয়। এটা তো সাধারণ অবস্থা। আল্লাহ তাকে ওই ভাবে রেখেছেন আর একে এভাবে রেখেছেন। তবে পার্থক্য আছে এ ক্ষেত্রে যে, আল্লাহ সবার প্রয়োজন পূরণ করেন। কিন্তু নেক বান্দাগণের প্রয়োজন মেটান তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আর পাপচারীদের প্রয়োজন পূণ করেন তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে।

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৮১

ঘরের মধ্যেও এমন অবস্থা হয়। স্ত্রী কখনো এমন বস্তু দাবি করে, যা আনন্দের সাথে সংগ্রহ করে দেওয়া হয়। আবার কখনো এর উল্টোটাও করে। তা দিলেও স্বামী খুশি মনে দেয় না। নিয়ে এসে চুপ করে দিয়ে দেয়। তেমনিভাবে আল্লাহ কাফেরদেরও নেয়ামত দেন। তবে খুশি মনে নয়। আর মুমিনদেরও নেয়ামত প্রদান করেন। তবে আনন্দ চত্তে।

এর দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝে নিন যে, আপনি ঘরে তোতা পাখি লালন করছেন। খাঁচায় বন্দি করে রেখেছেন। তাকে নিজহাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন। এটা হচ্ছে খুশি মনে। খাবার দিয়ে তাকে বলেও আসছেন, ভাই! ক্ষুধায় কষ্ট করবেন না। প্রয়োজন হলে ডেকে বলো। পক্ষান্তরে কোনো সময় ইঁদুর শিকার করতে হলে খাঁচায় রুটির টুকরা রাখছেন। তবে এটা খুশি মনে নয়। তার উপদ্রবে আপনার ক্ষতি হচ্ছে। আপনার মনে কষ্ট হচ্ছে। সুতরাং তাকে বন্দি করার উদ্দেশ্য নিজহাতে খাঁচায় রুটি রাখছেন।

দার্শনিক সূক্ষ্মতা

আল্লাহ নাফরমানদের যে-রিযিক দেন, তার নাম রেখেছেন فتح ابواب (দ্বার খুলে দেওয়া)। আল্লাহ বলেন–

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ

'যখন তারা তাদের দেওয়া উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সব জিনিসের দরজা খুলে দিলাম।'[১]

পক্ষান্তরে ঈমানদারের আহার্যের ব্যাপারে আল্লাহ এর নাম রেখেছেন فتح برکات (বরকত ও কল্যাণ্য উন্মুক্ত করা)। আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۝٩٦

'যদি লোকালয়বাসী ঈমান গ্রহণ করত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'[২]

সুতরাং কাফেরদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া আর মুমিনের জন্য বরকত উন্মুক্ত করা।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৪৪

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬

শাস্তি ও পরীক্ষা

এমনিভাবে আল্লাহ কাফেরদের যে-সমস্ত পরীক্ষা করে থাকেন, সেগুলোর নাম রেখেছেন عذاب বা শাস্তি। কাফেরদের জীবনে যে-সংকট ও অশান্তি আসে, সেটা শাস্তিস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

'আমি তাদেরকে বড় শাস্তির পূর্বে একটা লঘু শাস্তি ভোগ করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।'[১]

এখানে কবরের শাস্তিও হতে পারে, দুনিয়ার শাস্তিও হতে পারে। আর বড় শাস্তি হলো পরকালে জাহান্নামের শাস্তি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ﴿٣٣﴾

'শাস্তি এরকমই। আর পরকালের শাস্তি সবচেয়ে বড়।'[২]

সুতরাং বোঝা গেল, কাফেররা পৃথিবীতে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেটা তাদের জন্য শাস্তি। মুমিনের ওপরও বিপদাপদ আসে। পবিত্র কুরআনে মুমিনের বিপদের নাম ابتلاء বা পরীক্ষা রাখা হয়েছে। আপনি কর্মকারের দোকানে গিয়ে পাতিল খরিদ করছেন। ভালো, সুন্দর পাতিল হাতে নিয়ে টোকা দিচ্ছেন। কেন? আপনি সেটা যাচাই করছেন, যে তা ফাটা আছে কিনা, সেটা কাঁচা, নাকি পাকা। ঠিক তেমনিভাবে মনে করুন, মুমিন ভালো, সুন্দর, ঈমানের নেয়ামতে ধন্য। তবু আল্লাহ তাকে যাচাই করেন, সে কাঁচা না পাকা। এই যাচাইয়ের নাম হচ্ছে ابتلاء বা নিরীক্ষণ। আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে বলেন

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

'সেখানে মুমিনদের পরীক্ষা করা হবে। তাদের শোচনীয়ভাবে স্থানচ্যুত করা হবে।'[৩]

---

১. সূরা সাজদাহ : আয়াত ২১
২. সূরা কলম : আয়াত ৩৩
৩. সূরা আহযাব : আয়াত ১১

এই উম্মতের ওপর পরীক্ষা এসেছে অধিক

আগেকার উম্মতের মধ্যেও পরীক্ষা এসেছে। তবে কম। এই উম্মতের ওপর অধিক পরিমাণে পরীক্ষা এসেছে। সেটা কীভাবে? কুরআন প্রমাণ করে, আগেকার উম্মতের মধ্যে পরীক্ষা এসেছে। আল্লাহ সে সম্পর্কে বলেন–

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ

'বড়-বড় কষ্ট ও সঙ্কট তাদের গ্রাস করেছে। তাদের স্থানচ্যুত করা হয়েছে। এমনকি নবীগণ ও তাদের সঙ্গে যে-মুমিনরা ছিল, তারা বলতে লাগল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?'[১]

এখানে শুধু زلزلوا শব্দটা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। তাদের পরীক্ষার রূপ এমন ছিল। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ⑪

এখানে

وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

বলা হয়েছে। অর্থাৎ– গুরুতরভাবে তাদের পদস্খলন করা হবে। এর মর্ম হলো, যত নিকটবর্তী হবে, পরীক্ষা তত কঠিন হবে। এজন্য বলা হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব।'

তবে পরিশেষে বলেছেন–

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।'[২]

আল্লাহর সন্তুষ্টি সবকিছুর ঊর্ধ্বে

যে বান্দা আল্লাহর ওপর বিশ্বাসকে পাকা করে, নিজের ঈমান মজবুত করে, সুদৃঢ় বানিয়ে নেয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, আমাদের ইচ্ছার ওপর আমরা চলব না, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করব, তখন

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৪

২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সাহায্যের আচরণ করেন। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি নিজের মনচাহি জীবন গড়ে, নিজের ইচ্ছামতো পা বাড়ায়, সে কদমে-কদমে হোঁচট খায়, প্রতারণার শিকার হয়।

কোনো এক পাঞ্জাবি কবি বলেন–

اس دکھی حیاتی دے بینڈیاں وچ
کدی راہ پے گئے ہے کدی بھلدے رہے
ہک ڈیوا امید دا بلدار ہیا
لکھ جھکھڑ ہنیریاں دے چلدے رہے
پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پیتاں وانگ
اسیں تیرے جہان وچ رلدے رہے
پر دامن امید دا چھڈیا نہ
اسیں نال تقدیر دے گھلدے رہے

'দুঃখময় জীবন দাও, সহ্য করার শক্তি দাও, চলছি অন্ধকারে।

দূর করে দাও মোদের তরে।

তোমার তরে আশা রাখি ওগো মোর পথের দিশারী।

লাখ গুণ দ্রুত দাও, মূর্তির পূজা দূর করে দাও, তোমার দুনিয়ায়, বন্দীদশায়, মোরা আছি অসহায়।

তবু আশা তোমার তরে, মুক্তি পেতে রোজ হাশরে,

ধরে আছি তোমার আঁচল, তুমি বিনে মোরা অচল।

নিয়তিতে আছি রাজী পাই যেন খোদা তোমার খুশি।'

ভাই! তাকদীর নিয়ে ভাবনার দরকার নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর রাজি থাকো। শরীয়ত মোতাবেক কদম বাড়াও। যিনি তালাবদ্ধ করেছেন, তিনিই খুলে দেবেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর আনুগত্য করলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ আমাদের সাথি হয়ে যাবেন। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন!

আল্লাহর সাহায্য সবচেয়ে ভারী

আল্লাহর সাহায্য যখন সঙ্গী হয়ে যাবে, তখন যেকোনো পরাশক্তি মোকাবেলা করলে সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। যেমন– দেখুন, ইবরাহীম (আ.) এলেন। নমরূদের পরাশক্তি হোঁচট খেল। মূসা (আ.) আগমন করলেন। ফেরাউনের প্রভাব প্রতিপত্তি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমাদের নবীজির আবির্ভাব হলো। পারস্য ও রোমসম্রাটের পতন হলো। সুতরাং যে-ব্যক্তিই তাওহীদের আওয়াজ নিয়ে মাথা নাড়া দেবে, তার পাল্লা ভারী হবে। বন্ধুগণ! এগুলো শুধু শোনার বিষয় নয়। এসমস্ত কথা অন্তরে বসাও। যাচাই করো আমাদের হৃদয়ে সেই বিশ্বাস আছে কিনা।

যেমন কর্ম তেমন ফল

আপনারা দেখুন, এ পৃথিবীর মৌলিক নীতিমালা হলো

جَزَاءً مِّنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

সুতরাং মানুষ আল্লাহর সঙ্গে যেমন আচরণ করবে, আল্লাহও তার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করবেন।

উর্দূতে একটা প্রবাদ আছে

جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کرکے دیکھ

جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مرکے دیکھ

'যেমন কর্ম তেমন ফল না মানিলে করে দেখ,

জান্নাত আছে জাহান্নাম আছে না মানিলে মরে দেখ।'

আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, আমরা বিশ্বাসে অটল থাকলে তিনি আমাদের সমস্ত পেরেশানি খুশিতে পরিবর্তন করে দেবেন। যেগুলো আমাদের লাঞ্ছনার কারণ, সেগুলোকে আমাদের সম্মানের কারণ বানিয়ে দেবেন।

উদাহরণ (১) : এবার এ-সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কিছু উদাহরণ শুনুন। হযরত মূসা (আ.)-এর মা সন্তানকে নীলনদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। মনটা ব্যথায় জর্জরিত, আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন। কিন্তু অন্তর তো বাঁধতে পারছেন না, সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে। বিবেক বলছে, তুমি সন্তানকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছ। চাক্ষুষ ডুবে যাওয়ার উপকরণে

ফেলে দিচ্ছ। এই সিন্দুকটাকে যদি ওয়াটারপ্রুফ বানিয়ে দাও, তাহলে শিশুটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। আর যদি অক্সিজেনের জন্য ছিদ্র রাখ, তাহলে নিশ্চিত পানি ঢুকে ডুবে যাবে।

বিবেক বলছে, এমতাবস্থায় শিশুর বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তিনি আল্লাহর নির্দেশের ওপর আমল করলেন।

তো মূসা (আ.)-এর মায়ের চিন্তিত হওয়ার কারণ কী ছিল। পানি, যার মধ্যে সন্তানকে রাখছেন। এবার ভেবে দেখুন, বনী ইসরাইলদের মৃত্যুর কারণ কী ছিল? পানি। আল্লাহ চাইলে কারুনের মতো ফেরাউনের গোষ্ঠীকে জমিনে ধসিয়ে দিতে পারতেন। ডাঙ্গায় তাদের মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু-না, আল্লাহ ফেরাউনের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন? তাকে নদীতে নিমজ্জিত করেছেন। কেন? হে আমার বান্দী! তোমার সন্তানকে পানিতে রাখতে তুমি চিন্তিত হচ্ছিলে। কিন্তু সেটি তোমার খুশির কারণ হলো। আর সেই পানিই ফেরাউনের ধ্বংসের কারণ হলো। ফেরাউনকে দেখানো হলো, দেখো, তুমি যে বস্তু নিয়ে গর্ব করতে যে, তুমি বলতে

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي

' মিশরের ক্ষমতা এবং এই যে নদী আমার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে এগুলো কী আমার নয়?'[১]

তোমার খুব আত্মগরিমা ছিল যে, আমার নিচে স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।

সেই নদীর মধ্যেই আমি তোমাকে ধ্বংস করলাম। এর দ্বারা শিক্ষা দিলাম, বড়-বড় কথা বলো না। যদি বল, তাহলে আমার প্রদত্ত নেয়ামত ফিরিয়ে নেব। যার পক্ষ থেকে আসে, তিনি নিয়েও নিতে পারেন।

উদাহরণ (২) : হযরত ইউসুফ (আ.)কে ভাইয়েরা কূপে ফেলে দিল। তারা তাদের পিতাকে দেখানোর জন্য তাঁর জামা নিয়ে এল। জামার ওপর কিছু রক্তও লাগিয়ে দিল,

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

'রাতে কাঁদতে-কাঁদতে তাদের পিতার সম্মুখে উপস্থিত হলো।'[২]

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫১

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৬

আব্বাজান! আমাদের ভাইকে বাঘে খেয়ে ফেলছে।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ

'জামায় মিথ্যা রক্তের প্রলেপ লাগিয়ে এসেছে।'[১]

হযরত ইয়াকুব (আ.) সেই জামা দেখে ব্যথাকাতর হয়ে গেলেন। এখানে ইয়াকুব (আ.)-এর বেদনার কারণ কী ছিল? কারণ ছিল জামা; সেই ব্যথায় ইয়াকুব (আ.) বললেন–

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۸﴾

'আমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করলাম। তোমাদের কৃতকর্মের ওপর আল্লাহ আমার সহায়ক।'[২]

অবশেষে ইউসুফ (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর ভাইদের পরিচয় হলো। সন্ধি হলো। তারা বলল, আব্বাজান চিন্তায়-চিন্তায় বৃদ্ধ হয়েছেন। কাঁদতে-কাঁদতে শক্তি চলে গেছে।

তখন ইউসুফ (আ.) একথা বলেননি যে, ঠিক আছে; দু'আ করা যাক, আল্লাহ যেন আব্বাজানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। বরং তিনি বলেছেন–

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ

'আমার এই জামাটা নিয়ে গিয়ে আমার আব্বাজানের মুখের ওপর রেখে দাও।'[৩]

তখন কী হলো?

اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا

'সেটা তার চেহারার ওপর রাখার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল।'[৪]

দেখুন, যে-জামা তার দুঃখের কারণ ছিল। সেই জামা আল্লাহ তাঁর খুশির উপকরণ বানিয়ে দিলেন। এটি আল্লাহর কুদরত। সুখ-দুঃখ আমার হাতে। সুতরাং শিক্ষা দিলেন, তোমরা বাহ্যিক উপকরণের পেছনে দৌড়াবে না।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৮
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৮
৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯৩
৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯৬

উদাহরণ (৩) : এখানে একটি দার্শনিক সূক্ষ্মতা রয়েছে। আবরাহা বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হস্তিবাহিনী নিয়ে এল। আল্লাহ তার হাতিগুলো ধ্বংস করে দিলেন। কী দিয়ে ধ্বংস করলেন। চড়ুই পাখি থেকে আরো ছোট আবাবিল পাখির মাধ্যমে। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, এর রহস্য হলো, আবরাহা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ সাধারণ পাখির দ্বারা ধ্বংস করে দিলেন যে, দেখো, তোমাদের এত শক্তিশালী বাহিনী আমি সাধারণ পাখির দ্বারা ধ্বংস করে দিলাম। আমার নির্দেশে সামান্য পাখির সামনে তোমাদের দৃঢ় শক্তির কোনো মূল্য নেই।

মুফাসসিরীনে কেরাম আরেকটি জবাব লিখেছেন, যা অতিশয় সুন্দর। সেটি হলো, আবরাহা কাবা শরীফের সম্মান সহ্য করতে পারছিল না। তাই ইয়ামানে একটা নকল কাবা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যাতে লোকেরা তার প্রতিষ্ঠিত কাবাকে সম্মান করে। সেই উদ্দেশ্যে সে কাবা শরীফ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এসেছিল। আল্লাহর বিধান হলো, মানুষ কাবা শরীফকে সম্মান করবে। সে এ বিধানের বিপরীত কাজে অগ্রসর হচ্ছিল। তাই আল্লাহও দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মের উল্টো কাজ করে দেখালেন। সেটি কী? সেটি হলো, এ পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, মানুষ হয় শিকারী আর পাখি হয় শিকার। আল্লাহ তার বিপরীতে পাখিকে বানিয়েছেন শিকারী আর মানুষকে বানিয়েছেন শিকার। তাই পাখির মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করেছেন।

আল্লাহ বলেন–

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

'আমি তাদের বিরুদ্ধে পাখির ঝাঁক পাঠালাম। তারা তাদের ওপর প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পাথর নিক্ষেপ করছে।'[১]

সুতরাং দেখলেন তো, যেমন কর্ম তেমন ফল। যদি আমরা বাহ্যিক উপকরণমতো জীবন গড়তে চাই, তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের পরিণাম খুবই মন্দ। পক্ষান্তরে যদি উপকরণের মূলের সন্তুষ্টি তালাশ করি, তাহলে আমাদের বিজয় নিশ্চিত। এই কথাগুলো অন্তরে বসানোর চেষ্টা করবেন। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

---

১. সূরা ফীল : আয়াত ৩, ৪

সাহাবাগণের ঈমানের ওপর নবীজির মেহনত

নবীজি দশ বছর পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের ওপর মেহনত করেছেন, যাতে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান মজবুত ও পাকা হয়। আল্লাহর ওপর তাদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা দৃঢ় হয়। হাদীছ শরীফ এর প্রমাণ বহন করে। নবীজি এক সাহাবিকে বললেন–

يَا غُلَامُ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ

'তুমি নিজের ভাবনায় আল্লাহকে সামনে রাখো। আল্লাহ তোমাকে তাঁর সামনে রাখবেন।'

اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

'আল্লাহকে তোমার ধ্যানে রাখো; তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে।'

وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ

'কিছু চাইতে হলে আল্লাহর নিকট চাও।'

فَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ

'সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহর নিকট করো।'

اِعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعَكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ

'জেনে রাখো, জাতির সবাই তোমার উপকারের জন্য একত্রিত হলেও তোমার বিন্দুমাত্র উপকার করতে পারবে না। বরং তুমি তা-ই পাবে, যা তোমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে।'

وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

'জাতির সকলে ঐকবদ্ধ হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চাইলেও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং যা তোমার ভাগ্যে রয়েছে, তা তুমি পাবেই।'

رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ

'কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে; খাতাও শুকিয়ে গেছে।'

তোমার নিয়তির সিদ্ধান্ত অবশ্যকীয়। সুতরাং এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সাহায্য চাবে, প্রার্থনা করবে, তবে আল্লাহর নিকট চাও। তিনি

চাইলে পাবে, না চাইলে কিছুই পাবে না। জুতা ঘষিয়ে চলবে, হোঁচট খাবে। কার দরজায় যাবে?

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات

'সেই একটি সেজদা, যাকে তুমি বোঝা মনে করছ, এটি মানুষকে হাজারো সেজদা থেকে নিষ্কৃতি দেয়।'

সাথে-সাথে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা চাই। আমাদের হৃদয়ে যেন এ কথার সঞ্চার হয় যে, আল্লাহর আদেশমতো জীবন গড়লে সফলতা পাব। পাপে আমাদের ধ্বংস একথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে নাও। সব কিছু তোমার সামনে আয়নার মতো হয়ে যাবে।

যুদ্ধের ময়দানে সাহাবায়ে কেরামের প্রশিক্ষণ

আপনারা দেখে থাকবেন, সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বিভিন্ন প্রকার অবস্থা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, নিরাপদ অবস্থায় নবীজি উপদেশ দিয়েছেন, এতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে শিক্ষা গ্রহণ করলেন কীভাবে? এটি একটি দার্শনিক সূক্ষ্মতা। প্রত্যোকটি জিহাদের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মক্কাজয়ের পূর্বে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, তার সবগুলোতেই শিক্ষা রয়েছে।

বদর যুদ্ধের শিক্ষা

উদাহরণস্বরূপ দেখুন বদর যুদ্ধে কেমন শিক্ষা রয়েছে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন করা জরুরি ছিল। দেখো, তোমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই। এক হাজার সৈনিকের সামনে তোমরা তিনশো তেরোজন দাঁড়িয়েছ। সমস্ত সৈনিকের মধ্যে মাত্র দুটি তলোয়ার। কুরআন বলে–

كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

'তারা দেখেশুনে নিজেকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিচ্ছে।'[১]

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৬

লোহায় মোড়ানো সৈনিক সামনে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল ভিন্ন। আল্লাহ বলেন–

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ

'যাতে তিনি সত্যকে বাস্তবায়িত আর মিথ্যাকে অপসারিত করেন।'[১]

আল্লাহ আরো বলেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

'নিশ্চয় বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা দুর্বল ছিলে।'[২]

সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাও স্বীকার করেন যে, আমরা দুর্বল ছিলাম। না ছিল বাহন, না ছিল তরবারি। কিন্তু তারা ব্যাঘ্রের মতো এসে দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন। যুদ্ধের মাঠে চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে। ঠোঁটের ওপর হাত রেখে দাঁত কাটছেন। মক্কা তার ব্যাঘ্রপুরুষদের বের করে দিচ্ছে। বীর বাহাদুরদের বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। একদিকে অস্ত্রসাজে সজ্জিত সৈনিকরা। অপর দিকে নিরস্ত্র কিছু মানব। আল্লাহ বলে দিলেন, দেখো, তোমরা আমার হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, দুনিয়ার যেকোনো শক্তি তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হোক, তোমাদের একটা চুলও বাঁকা করতে পারবে না। আমি পৃথিবীতে তোমাদের বিজয়ী দেখাব। আল্লাহ বলেন–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'কতবার এমন হয়েছে যে, ছোট একটি জামাত অনেক বড় জামাতের ওপর বিজয়ী হচ্ছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'[৩]

অর্থাৎ– কতবার এমন হয়েছে যে, আমি চড়ুই পাখির দ্বারা বাজ পাখির মৃত্যু দিয়েছি। সুতরাং ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আমি তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহর সাহায্যকে তোমাদের পাল্লায় রাখো আর নিরাপদ হয়ে যাও; আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে মিশে থাকব। তোমাদের ভয় কীসের? চিন্তা কীসের? সুতরাং বদর যুদ্ধের দ্বারা আল্লাহ কী শিক্ষা দিয়েছেন? বদর যুদ্ধের দৃশ্য কী ছিল?

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৮
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৩
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাই নেই।'

উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা

উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা ছিল,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

মানে রাসূলের অনুসরণ। দেখুন, একটি হলো জীবনের উদ্দেশ্য, আরেকটি হলো জীবন যাপনের পদ্ধতি। জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর একত্ব। কিন্তু জীবনপদ্ধতি হবে আমার হাবীবের আদর্শ। তাহলে তোমরা কৃতকার্য হবে। উহুদ যুদ্ধের অবস্থা দেখুন। প্রাথমিক অবস্থায় বিজয় ছিল মুসলমানদের। কিন্তু সামান্য একটি যৌক্তিক ভুলের কারণে যাকে মিস আন্ডার স্ট্যান্ডিং বলে। নবীজি যাদেরকে পাহাড়ের ঘাঁটিতে নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন, খবরদার! কোনো অবস্থাতেই স্বস্থান ত্যাগ করবে না। কিন্তু তারা যখন দেখলেন, মুসলমানরা নিজ-নিজ মাল গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন তারা ভাবলেন, আমাদের প্রতি এ নির্দেশ তো ছিল কাফেরদের পরাজয় পর্যন্ত। এবার আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে মুসলমানদের সাহায্য করা চাই। তারা পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে নিচে নেমে এলেন। তখনই খালেদ ইবনে ওয়ালিদ যিনি এখনো মুসলমান হননি এবং সামরিক বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছেন। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে তিনি পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করলেন। এবার মুসলমানরা হতভম্ব হয়ে গেল। সামনের দিক থেকে কাফের বাহিনী আসছে আর পেছন থেকে খালেদের সৈনিকরা। তারা পুনরায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। ক্ষতিও হয়েছে অনেক।

আল্লাহ শিক্ষা দিলেন, দেখো, তোমাদের নিকট সর্বপ্রকার প্রস্তুতি ছিল। অস্ত্রসামগ্রীও অধিক ছিল। বাহ্যিকভাবে বিজয় হতে যাচ্ছে। কিন্তু যখন তোমরা আমার হাবীবের নির্দেশের সামান্য ব্যতিক্রম করলে, তখন তোমাদের আবশ্যিক বিজয়কে আমি তোমাদের অস্থিরতার কারণ বানিয়ে দিলাম।

সুতরাং বদর যুদ্ধের দৃশ্য ছিল–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আর উহুদ যুদ্ধের দৃশ্য হলো

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

খন্দক যুদ্ধের শিক্ষা

এরপর হলো খন্দক যুদ্ধ। খন্দক যুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া হলো, দেখো, এবার পৃথিবীর সকল কাফের একত্র হয়ে তোমাদের মোকাবেলা করতে আসছে। খন্দক যুদ্ধে কাফেররা বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে তাদের থেকে লোক সংগ্রহ করে সমবেত হয়ে আসার পরিকল্পনা করল। মানুষ এসে-এসে মুসলমানদের বলতে লাগল–

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

'তোমাদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে মানুষ সমবেত হয়ে আসছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো।'[১]

এখন তোমাদের অবস্থা কী হবে? সুতরাং আল্লাহ তাদের শিক্ষা দিলেন, তোমরা একটি পরিখা খনন করো আর এর মধ্যে তোমরা আবদ্ধ হয়ে যাও। কারণ, তারা অনেক লোক। তাদের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ পৃথিবীতে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করে দিলেন। আল্লাহ বলেন–

وَرَدَّ اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ

'আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধ ও ঈর্ষার সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন।'[২]

তারা কাছেও পৌঁছতে পারেনি, সুতরাং শিক্ষা নাও। আমার হয়ে থাক সারা দুনিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

কবির ভাষায়–

کیا غم ہے ساری خدائی بھی مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩
২. সূরা আহযাব : আয়াত ২৫

'মিথ্যা খোদারা সবাই আমার বিরুদ্ধে গেলেও আমার কোনো ভাবনা নেই। এক খোদা যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট।'

সুতরাং খন্দক যুদ্ধের দৃশ্য ছিল তোমরা মাখলুকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। আমার সাহায্যের ওপর ভরসা রাখো। সারা সৃষ্টজীব তোমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আল্লাহর হাবীব বলেন, আমি বার্তা পেয়ে গেছি–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

'আমি তোমার জন্য বিজয় অবধারিত করে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।'[১]

গোটা সৃষ্টজীব আমার বিরোধী হলেও আমার চিন্তা কী? শুধু আল্লাহ্ আমার সঙ্গে থাকলে এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং ভাই এক আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

হোদাইবিয়ার সন্ধির শিক্ষা

এরপর হোদাইবিয়ার সন্ধি হলো। এর মধ্যেও আল্লাহর রহস্য নিহিত ছিল। কী শিক্ষা দেওয়া হলো? হে আমার বান্দারা! যুদ্ধের ময়দানের বিজয় হাতে আসা না আসা এটা সফলতা নয়। আমার শিক্ষার ওপর আমল করো; পরিপূর্ণ সফলতা পাবে।

সুতরাং হোদাইবিয়ার সন্ধিতে বাহ্যিকভাবে মাঠ তাদের অনুকূলে ছিল। কাফেরদের যেসব শর্ত ছিল সেগুলো একতরফা ছিল। যেমন– কেউ কাফের হয়ে মদিনা থেকে আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা তাদের ফেরত দেব না। কিন্তু চুক্তির সময়ের ভেতরে মক্কা থেকে কোনো কাফের মুসলমান হয়ে মদিনায় গেলে তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে। এ বছর হজ করতে দেওয়া হবে না। তোমরা মদিনায় ফিরে যাও।

এগুলো কেমন শর্ত? মনে হচ্ছে, তোমরা আমাদের নিকট খুবই অসহায়। সুতরাং আমরা যেভাবে বলব, সেভাবেই তোমাদের মেনে নিতে হবে। এজন্যই তো সায়্যেদুনা হযরত ওমর (রাযি.)-এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এত নীচু হয়ে সব কিছু মেনে নেব কেন? আল্লাহর হাবীব বললেন, আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তারা যেভাবে বলে সেভাবেই আপস করে নিতে।

---

১. সূরা ফাত্হ : আয়াত ১

আল্লাহ বলেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝

'আমি তোমার জন্য প্রকাশ্য বিজয় রেখেছি।'[১]

এই সন্ধিকে আল্লাহ 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাহ্যিকভাবে তোমাদের দুর্বল দেখা যাচ্ছে। সুতরাং মাঠের হার-জিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। বরং আমার নির্দেশের মূল্যায়ন করো।

হোনাইন যুদ্ধের শিক্ষা

অতঃপর হোনাইন যুদ্ধে আল্লাহ শিক্ষা দিলেন, দেখো, এবার তোমরা সংখ্যায় অধিক। তোমরা বলছ, এত সংখ্যা আমাদের কখনো হয়নি। পবিত্র কুরআন বলে–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ

'আল্লাহ বহু স্থানে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের দিনও যখন তোমরা তোমাদের আধিক্যের ওপর গর্ব করতে লাগলে; তখন সেটা তোমাদের কোনো উপকারে এল না।'[২]

তোমাদের আধিক্যের ওপর তোমরা গর্ব করলে তখন কী হলো? পরিশেষে তোমরা সবাই পলায়ন করলে। শুধু আমার হাবীব অটল রইলেন। তিনি বললেন–

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি নবী– মিথ্যা বলছি না। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।'

হযরত আবুবকর (রাযি.)সহ কতিপয় সাহাবা তাঁর সঙ্গে রইলেন। হযরত আব্বাস (রাযি.) ঘোষণা দিলেন, হে বাইয়াতে রেদওয়ানের সাথিরা! হে বৃক্ষের নিচের সাথিরা! একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম ফিরে এলেন। প্রাথমিক অবস্থায় তারা কিছু তীর ছোড়াছুড়ি করছিলেন। কিন্তু অবস্থা হ-য-ব-র-ল হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ শিক্ষা দিলেন, আধিক্যের ওপর গর্ব করো না। আমার সাহায্যের ওপর ভরসা করো।

সুতরাং দেখুন, প্রত্যেকটি যুদ্ধেই শিক্ষা রয়েছে।

---

১. সূরা ফাত্হ : আয়াত ১

২. সূরা তাওবা : আয়াত ২৫

সাহাবায়ে কেরামের যুগ উম্মতের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

সাহাবায়ে কেরামের যুগ আমাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, নবীজি বললেন, এখন সংকটময় সময়; তোমরা জিহাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় মাল নিয়ে আসো। তখন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) ঘরের সমস্ত মাল নিয়ে নবীজির দরবারে উপস্থিত করলেন। হযরত ওমর (রাযি.) সমস্ত মাল দুটা ভাগ করে এক ভাগ নবীজির সম্মুখে উপস্থিত করলেন। হযরত ওছমান (রাযি.) উট বোঝাই করে সম্পদ নিয়ে নবীজির দরবারে হাজির করলেন। শত-শত উট নিয়ে গেলেন। হযরত আলী (রাযি.)-এর নিকট কিছুই ছিল না।

দেখুন, মানুষের চার অবস্থায় (Proba bilities) চারটি স্তর রয়েছে।

(১) কেউ এমন ভালোবাসলেন যে, পেছনে কিছুই রেখে গেলেন না। বরং বললেন, আমার পরিজনের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। এটি হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর দৃষ্টান্ত

(২) কেউ এমন নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়েছেন যে, দীন ও দুনিয়া উভয়কে সমান-সমান বণ্টন করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পরিবারের জন্য অর্ধেক রেখে এসেছি আর বাকি অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় আপনার দরবারে উপস্থিত করেছি। এটি হযরত ওমর (রাযি.)-এর দৃষ্টান্ত।

(৩) আল্লাহ এত পরিমাণ দিলেন যে, কোটিপতি হয়ে গেলেন আর দুহাতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেন। তিনি হলেন হযরত ওছমান (রাযি.)। নবীজি তাঁকে বিশেষ দু'আ দিলেন।

(৪) এটিও একটি অবস্থা যে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মতো কিছুই নেই। নিঃস্ব বান্দা। এটি হলো হযরত আলী (রাযি.)-এর অবস্থা। সারা জীবনেও তাঁর ওপর যাকাত ফরজ হয়নি। সম্পদ সঞ্চয়ই করলেন না। যা আসত সব কিছু সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতেন।

সুতরাং ভাই! নিঃস্ব হলে হযরত আলী (রাযি.)-এর জীবনের ওপর আমল করুন। অতএব, বোঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে আমাদের জন্য উত্তম শিক্ষা রয়েছে।

হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর যুগ

লক্ষ করুন! হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর যুগ অভ্যন্তরীণ ফেতনার দ্বার বন্ধ করার শিক্ষা দিয়েছে। কেননা, হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর যুগে

অভ্যন্তরীণ ফেতনা ব্যাপক ছিল। সর্বপ্রথম হযরত উসামা ইবনে যায়েদের বাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রে মহাসমস্য দেখা দিল। কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ দিলেন, এ বাহিনী প্রেরণ করবেন না। নবীজি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। সুতরাং কাফেরদের মদিনায় আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে।

এটি বিরাট ব্যাপার। তাঁদের মতানৈক্য কীভাবে নিরসন করা যায়? হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, না; তা কিছুতেই সম্ভব নয়। নবীজি যার হাতে পতাকা তুলে দিয়েছেন, আবুবকর তার হাত থেকে পতাকা ফেরত নিতে পারে না। এমনকি হযরত ওমর (রাযি.)ও পেরেশান হয়ে গেলেন, এবার কী হবে? যদি সারা মদিনা পুরুষশূন্য হয়ে যায়, তাহলে তো শত্রুকর্তৃক মদিনা-আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাযি.) জবাব দিলেন, আমার যদি একথা দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আল্লাহর রাসূলের প্রস্তুতকৃত বাহিনী প্রেরণ করলে জঙ্গলের বাঘ এসে মদিনার নারী ও শিশুদের টেনে নিয়ে যাবে, তাহলে আমি একা সেই বাঘের মোকাবেলা করব। তবু এই বাহিনীকে আমি প্রেরণ করবই।

কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করল। তারা বলল, আমাদের এলাকা গরিব। সুতরাং আমরা যাকাতের মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না দিয়ে আমাদের এলাকার অসহায়দের মধ্যে বণ্টন করে দেব। তারা পরিপূর্ণভাবে যাকাত অস্বীকার করল না। যাকাত অস্বীকারকারী তো বলা হয়, যারা যাকাতের আবশ্যিক বিধানকে অস্বীকার করে। তারা বলল, আমরা যাকাত দেব। তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নয় আমাদের অসহায়দের মধ্যে বণ্টন করে দেব। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, না; তা হতে পারে না। নবীজির যুগে যা হয়েছে, তা অবশ্যই হতে হবে। সেই যুগে যদি তোমাদের যাকাত বায়তুল মালে এসে থাকে, তাহলে এখনও আসতে হবে। আমি তা অবশ্যই আদায় করব। তোমরা উট যাকাত দেওয়ার পর তার রশিটা না দিলে তা-ও আমি ছাড়ব না।

সুতরাং এখানে অভ্যন্তরীণ ফেতনার দ্বার বন্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর দরবারে এসে বললেন, জনাব! ওরা তো যাকাত দিতে অস্বীকার করেনি। সুতরাং ওদের সঙ্গে কিছু নমনীয় আচরণ করা প্রয়োজন। তারা তো এমন মারাত্মক কোনো অপরাধ করেনি যে, আপনি ওদের সঙ্গে জিহাদ করার হুমকি দিচ্ছেন। তখন হযরত আবুবকর (রাযি.) বুকে চাপড় মেরে বললেন–

اَجَبَّارٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِى الْاِسْلَامِ

'তুমি তো মূর্খতার যুগে বাহাদুর ছিলে। এখন ইসলামের যুগে কাপুরুষ হয়ে গেলে নাকি?'

হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, তাঁর কথায় আমার চোখ খুলল। আমি সচেতন হলাম। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন–

اَيُتْرَكُ الدِّيْنُ وَاَنَا حَيٌّ

'আমি জীবিত থাকতে দীনের বিধানের ওপর ত্রুটি করা হবে? এটা কখখনো হতে পারে না।'

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম বললেন–

فَقَامَ مَقَامَ الْاَنْبِيَاءِ

'তিনি নবীগণের আসনে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।'

তিনি সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছেন। সুতরাং সিদ্দীকী যুগে কী হয়েছিল? অভ্যন্তরীণ ফেতনার দ্বার বন্ধ করা হয়েছিল। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত কোনো রাজা-বাদশাহ যদি চান যে, তার দেশে অভ্যন্তরীণ ফেতনা বন্ধ করে রাখবেন, তাহলে তিনি যেন হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নেন। আইন-শৃঙ্খলা ও নমনীয়তা কাকে বলে তা সেখান থেকে গ্রহণ করতে পারবেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগ

হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগের শিক্ষা ছিল, যদিও অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে, চতুর্দিক থেকে এ পরিমাণ সম্পদ আসছে যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ভরে গেছে, মদিনাতে যাকাত গ্রহণের মতো লোক নেই; তবু এতসব বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদেরকে কুরআন-হাদীছের ওপর অটল থাকতে হবে।

সুতরাং ওমর (রাযি.)-এর জীবনী দেখুন! কী পরিমাণ বিজয় ও সম্পদ জমা হলো! কিন্তু জীবনধারায় আড়ম্বর ও জাঁকজমক এল না। ওই জীবন যাপনই আশ্রয় পেল, যা নবীজির যুগে ছিল। নিজেকে কুরআন ও হাদীছের জীবনের ওপর শাসিয়ে রেখেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জনাব! আপনি বায়তুল মাকদিস যাচ্ছেন। সেখানে ইহুদি ও খ্রিস্টান বাদশাহরা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে রয়েছে। তাই আপনি একটু ভালো কাপড় পরিধান করুন,

ভালো একটি বাহনে চড়ে যান, উটের পরিবর্তে ঘোড়ায় আরোহণ করুন। তাদের কথায় ওমর (রাযি.) প্রাথমিক অবস্থায় তা করেছিলেন। খানিক অগ্রসর হওয়ার পর তিনি বললেন, এই অবস্থায় আমার হৃদয় প্রশান্তি পাচ্ছে না। ফিরে এসে সেই পুরাতন কাপড় ও উট সংগ্রহ করলেন এবং সেই অবস্থায়ই বের হলেন, জেরুজালেম বিজয়ের সময় ইহুদিরা তাঁর যে অবস্থা সম্পর্কে আসমানি গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। আল্লাহ বলেন–

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ

'তাদের এই অবস্থা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।'[১]

একেই বলে, অসংখ্য বিজয়ের পর কুরআন-হাদীছের ওপর অটল থাকা।

হযরত ওছমান (রাযি.)-এর যুগ

হযরত ওছমান (রাযি.)-এর যুগে শিক্ষা দেওয়া হলো, প্রচুর মতানৈক্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করা, সহনশীল থাকা। হযরত ওছমান (রাযি.)-এর ধৈর্য উম্মতের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহু আকবার! তখন কতিপয় লোক কুরআন-হাদীছের ওপর ভরসা করার পরিবর্তে ইতিহাসের ওপর ভরসা করতে লাগল। পার্থক্য এতটুকু যে, আমরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনীকে কুরআন-হাদীছের আয়নায় দর্শন করি। আর কতিপয় লোক তাদের জীবনকে ইতিহাসের আয়নায় দর্শন করে। ইতিহাসের মূলতত্ত্ব কী? যেবস্তু সংরক্ষিত এবং অবিকৃত তা তো হলো কুরআন ও হাদীছ। এ হলো আমাদের ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্য। আমরা নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন ও হাদীছের আয়নায় দর্শন করি। তাই আমরা তাঁদেরকে আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক মনে করি। পক্ষান্তরে যারা তাঁদেরকে ইতিহাসের আয়নায় দর্শন করে, এমনকি এক পণ্ডিত ব্যক্তি হযরত ওছমান (রাযি.) সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি নিকটাত্মীয়দের বড়-বড় উপঢৌকন প্রদান করতেন। তাদেরকে এ কথাটা মহা চিন্তায় ফেলে যে, ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তিনি নিকত্মীয়দের বড়-বড় উপঢৌকন প্রদান করতেন। এতে দোষের কী আছে?

প্রসঙ্গ যেহেতু এসেই গেছে, তাহলে শুনুন বিষয়টা কীভাবে হয়েছিল? আফ্রিকার এক বর্বর জাতি ছিল। মুসলমানরা সেই অঞ্চল জয় করল। তারা

---

১. সূরা ফাতাহ : আয়াত ২

সেখান থেকে অগ্রসর হলে পেছনে ওরা মুরতাদ হতে থাকে। পরিশেষে মুসলমানরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাদের পুনরায় সংশোধন করলেন। আবার সেখান থেকে অন্যত্র যাচ্ছেন। তারা পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত ওছমান (রাযি.) বদরি সাহাবাদের একজনকে সেখানে প্রেরণ করলেন যে, আপনি যান; ওদেরকে ধরে রাখবেন, যাতে পুনরায় এই ফেতনা মাথাচাড়া না দেয়।

তিনি সেখানে গেলেন। ওদের বক্তব্য শুনলেন, ব্যাপার কী বলুন। তিনি সেখানকার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন যে, ওখানে এক কুচক্রী তরুণ নেতা রয়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। অতঃপর মুসলমানরা সেখান থেকে চলে এলে সে এসে পুনরায় তাদের ভ্রান্ত মতবাদের ওপর উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তিনি সংকল্প করলেন, এই ফেতনার উৎস বন্ধ করতে হবে। তাঁর গুপ্তচরেরা তাকে জানিয়ে দিল, বর্তমানে মুসলমানদের নতুন যে-নেতা এসেছে, তার দৃষ্টি তোমার ওপর। সে কেমন বুদ্ধিমত্তা দেখাল দেখুন। সে ঘোষণা করে দিল, যেব্যক্তি মুসলমানদের এ নতুন নেতার শির এনে দেবে, তাকে এক লাখ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ফলে তার সৈনিকদের প্রধান টার্গেটই হয়ে গেল যে, মুসলমানদের এই নতুন নেতার মাথা আমাকে সংগ্রহ করতে হবে; তাহলে আমি এক লাখ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাব। ফলে মুসলমানদের যে-গুপ্তচর সেখানে ছিল, সে এসে মুসলিম নেতাকে সংবাদ জানাল, জনাব! এই ঘোষণা হয়েছে। আগামী কাল যুদ্ধ হলে আর কিছু হোক বা না হোক লোকজন আপনার শিরোচ্ছেদ করার প্রতি অধির হয়ে যাবে। আপনি কমপক্ষে তার কথার জবাব দিন।

সুতরাং তিনিও ঘোষণা করে দিলেন, যে-ব্যক্তি ওই তরুণ কাফের নেতার মস্তক এনে দেবে, তাকে আমি এক লাখ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব। উভয় পক্ষে এরকম ঘোষণা হলো। যুদ্ধ শুরু হলো। এক সাহাবি সেই উদ্ধত যুবককে হত্যা করলেন। তার মৃত্যুর ফলে সেখানকার সমস্ত লোক অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে আনুগত্য স্বীকার করে নিল। তারপর তাদের সঙ্গে আর কোনোদিন যুদ্ধ হয়নি। সংকট নিরসন হয়ে গেল। প্রচুর গনিমতের মাল অর্জন হলো। গনিমতের মাল বণ্টনের সময় উক্ত সাহাবি, যিনি শত্রুকে হত্যা করেছিলেন, তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, জনাব! ঘোষণা হয়েছিল, যে-ব্যক্তি ওই শত্রুকে হত্যা করবে, তাকে এক লাখ দিনার পুরস্কার দেওয়া হবে। মুসলিম সেনাপতি বললেন, ভাই গনিমতের মাল থেকে এক লাখ দিনার দিয়ে দাও।

তখন অন্যান্য সৈনিকগণ বললেন, গনিমতের মালে সবার হক থাকে। আপনি এখান থেকে এই পুরস্কারের এক লাখ টাকা দিতে পারবেন না। তিনি বললেন, ভাই! আমার তো এক হাজার দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। আমি তো একটা বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মুসলমানদের স্বার্থে এই ঘোষণা দিয়েছিলাম। আর আল্লাহ্ বিষয়টা সঠিকভাবে সমাধান করে দিলেন। আমরা বিজয়ী হলাম। আমাদের বিপদ কেটে গেল। সুতরাং এখান থেকে দেওয়া মনে হয় অবৈধ হবে না।

সাথিরা বললেন, এই সিদ্ধান্ত আপনি একা দিতে পারবেন না। কারণ, এতে সবার হক রয়েছে। সবাই সম্মতি দিলে সেটা ভিন্ন কথা। অবশেষে বিষয়টি হযরত ওছমান (রাযি.) পর্যন্ত পৌঁছল। হযরত ওছমান (রাযি.) কত সুন্দর ফয়সালা দিলেন! তিনি বললেন, ভাই! আপনি ঘোষণা করেছেন সত্য; কিন্তু এই মালে সবার হক রয়েছে। এখান থেকে আপনি দিতে পারবেন না। তবে আমি ফয়সালা করছি। আপনাকে আমি প্রেরণ করেছিলাম ইসলামের স্বার্থে। সুতরাং আপনি যা করবেন তা আমাকে পুরা করতে হবে। তাই আমি আপনাকে এক লাখ টাকা হাদিয়া দিচ্ছি। আপনি তা দ্বারা পুরস্কারের টাকা পরিশোধ করে দিন। আল্লাহু আকবার! কত সুন্দর ফয়সালা। ঐতিহাসিকগণ পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা না করে শুধু উক্ত সেনাপতি হযরত ওছমান (রাযি.)-এর আত্মীয় ছিলেন সেই কথাটা উল্লেখ করে তাকে যে এক লাখ টাকা দিয়েছেন তা উল্লেখ করেছেন। আর প্রচার হয়ে গেছে যে, হযরত ওছমান (রাযি.) নিকটাত্মীয়দের বড়-বড় উপঢৌকন প্রদান করতেন। আমরা শুধু একে ইতিহাসের আয়নায় দেখি। যদি ব্যাপারটা আমরা কুরআন-হাদীছের আয়নায় দেখতাম, তাহলে এই সমস্যা সৃষ্টি হতো না। তার প্রকৃত রহস্য আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হতাম।

হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগ

সায়্যেদুনা হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগ আমাদের কী শিক্ষা দিল দেখুন। যুদ্ধবিগ্রহ হলেও নিজেদের পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখবে। হযরত আলী (রাযি.)-এর অবস্থা দেখুন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ– মুসলমানরা বড়-বড় দুটি দলে বিভক্ত হবে, যুদ্ধও করবে। অথচ সেই যুদ্ধও আমাদের জন্যে রহমতের কারণ হয়েছে। কীভাবে? কুরআন আল্লাহর নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাঁর কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর দুনিয়া থেকে

বিদায়ের পর বাস্তবায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, পবিত্র কুরআন বলেছে–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

'যদি মুসলমানদের দুটি দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তাহলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।'[১]

এই ঘটনা যদি নবীজির যমানায় সংঘটিত হতো, তাহলে কাফেররা বলত, দেখো, কেমন শিক্ষক হয়ে প্রেরিত হয়েছেন যে, তাঁর সম্মুখেই তাঁর শিষ্যরা পরস্পরে যুদ্ধ করছে। আল্লাহ তাঁর নবীকে এই অপবাদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমার হাবীব চলে যাবেন। তারপর আমি তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে তাদের দু-দলে বিভক্ত করে দেব। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষা গ্রহণ করবে যুদ্ধের অবস্থায়ও আমরা পরস্পরে কীভাবে ভালোবাসা বজায় রাখতে পারি। ফলাফল কী হলো? হযরত আলী (রাযি.)-এর সম্মুখে তাঁর এক সমর্থক এসে বলছে, আমি যুবায়েরকে হত্যা করেছি।

হযরত আলী (রাযি.) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যুবায়ের-এর হত্যাকারী জাহান্নামি। হযরত তালহা (রাযি.) আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর সঙ্গে ছিলেন। নিহত হয়ে গেলেন। তাঁর লাশ শুধু আঙুল দেখে শনাক্ত করা হয়েছে। হযরত আলী (রাযি.) তাঁর হাত উঠিয়ে তাতে চুমু দিলেন। বললেন, সে আমার নেতাকে উহুদের ময়দানে রক্ষা করেছিল। যদিও ভুল বোঝাবুঝির কারণে যুদ্ধ হয়েছিল; তারপরও পরস্পরে ভালোবাসা অটুট ছিল।

সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যের মধ্যে উম্মতের শিক্ষা

হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর মহান শিষ্য হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের বিতর্ক ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা নিহিত রয়েছে। যদি এমনটা না হতো, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে করণীয় বিষয় আমরা কোথায় শিক্ষা করতাম? সুতরাং মানুষ জানতে পারল, এমন হলে এমন করা চাই, ওই রকম হলে সেরকম করা চাই। এজন্যই যদিও তারা আল্লাহর ইচ্ছায় পরস্পর যুদ্ধ করেছেন, তবু আমরা উভয় পক্ষের সাহাবায়ে কেরামকে সত্য ও সঠিক মনে করব। এটিই আমাদের বিশ্বাস।

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ৯

সঠিক বিশ্বাস হলো, 'সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর যুদ্ধ করলেও তাঁরা ভাগ্যবান।' এদিকের লোকজনও শহীদ, ওদিকের লোকজনও শহীদ। কাজেই আমরা তাঁদেরকে কুরআন ও হাদীছের আয়নায় দর্শন করব। তাঁরা ওই সমস্ত মনীষী ছিলেন, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

'আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'[১]

সুতরাং দেখুন, হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) উভয়ে পরস্পর মোকাবেলা করেছেন; কিন্তু তাতেও আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

সরকারি দল ও বিরোধী দলের জন্য শিক্ষা

এবার কোনো একটি দেশের চিত্রকে নিজের সামনে উপস্থাপন করুন। দেখুন, একটি দল হয় সরকারি। আপনি যদি সরকারি দলের সমর্থক হন, তাহলে হযরত আলী (রাযি.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিন। দেখুন তিনি কী করেছেন। আরেকটি দল হয় বিরোধী। এ অবস্থায় শিক্ষা নিতে হলে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিন। সুতরাং উম্মতের সামনে এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গবেষকদের জন্য শিক্ষা

কিছুলোক এমন আছেন, যারা বিজ্ঞানী ও গবেষক হন। তাদের কাজ এটা নয় যে, দৃঢ়পদ ও মতানৈক্যে লিপ্ত হবে। তারা শুধু গবেষণায়ই নিমগ্ন থাকে। তাদের জন্য এটাই শোভনীয় যে, ঘরে বসে-বসে গবেষণা করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর প্রতি তাকিয়ে দেখুন ওই অবস্থায়ও তিনি কী করেছেন। তিনি ঘরে বসে আছেন। বলা হয়েছে, যারা গবেষণায় আছেন, তারা এই মতানৈক্যে আসার প্রয়োজন নেই। নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা-ই তাঁদের জন্য শ্রেয়।

জাতির নেতৃস্থানীয়দের জন্য শিক্ষা

কিছু লোক থাকেন জাতির কর্ণধার। তাদেরকে বলা হলো, ভাই! তোমরা এই বিদ্রোহে জড়িত না হয়ে তাঁদের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা করো। সুতরাং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) এদিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

---

১. সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ৮

আমি যাচ্ছি; তাদের মধ্যে মীমাংসা করার ব্যবস্থা করছি। সুতরাং যারা নেতৃস্থানীয় লোক, তাদের সমাজে মীমাংসা করা চাই।

মান্যবর ওলামায়ে কেরামের জন্য শিক্ষা

কিছু লোক থাকেন, যারা সম্মানী হন, আহলে ইল্‌ম হন। তাঁরা উভয় পক্ষে নিজের মনোনিবেশ রাখা চাই। কোনো পার্টিতে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা চাই। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম এভাবে থাকা চাই; যাতে আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়। কেননা, তাঁরা এক দলের পক্ষে আদালতে হাজির হলে দ্বিতীয় গ্রুপ চিরকালের জন্য তাঁদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

সুতরাং সায়্যেদুল মুহাদ্দিছীন সায়্যেদুনা হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) সম্পর্কে হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেন, তিনি আলেম প্রকারের সাহাবি ছিলেন। উভয় পক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। কিতাবে আছে, তিনি নামায পড়তেন হযরত আলী (রাযি.)-এর পেছনে এবং খাবার খেতেন হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর সঙ্গে। সুতরাং তোমরা ওই স্তরের ব্যক্তিত্ব হলে উভয় পক্ষের সঙ্গে সমান সম্পর্ক রাখো; তাহলে উভয় পক্ষ তোমার থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে।

জাতীয় কল্যাণের ব্যাপারে শিক্ষা

অতঃপর সরকারি দল ও বিরোধী দল উভয় দলকে একটি কথা জানিয়ে দাও যে, তোমরা সামান্য বিষয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ো না। কিন্তু যেখানে জাতীয় স্বার্থ শক্তিশালী ও কল্যাণকর হবে, আত্মসম্মানের ওপর আঘাত আসবে, সেক্ষেত্রে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই। এর উদাহরণ হলো, এক খ্রিষ্টান বাদশাহ (রোমসম্রাট) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর নিকট পত্র লিখল, আমি জানতে পেরেছি, আপনাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। আপনি আমাদের নিকট চলে আসুন। আমরা আপনাকে উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করব।

এ চিঠি পাঠ করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.) কী জবাব দিলেন? জাতীয় স্বার্থ কাকে বলে? তিনি জবাব দিলেন, হে রোমের কুকুর! এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। এতে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন? যদি তুমি হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি চোখ তুলে থাকাও, তাহলে আমি তাঁর (আলীর) সৈনিক হয়ে সর্বপ্রথম তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

সুতরাং এতে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের জীবন শুধু শিক্ষা আর শিক্ষা। আল্লাহ আমাদের জন্য তাতে দৃষ্টান্ত রেখেছেন। নতুবা মানুষ বলত, ইসলাম অসম্পূর্ণ; শুধু শান্তির সময়কার নীতি শিক্ষা দেয়। যুদ্ধের জীবনের তো উদাহরণ দেয়নি। আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধর্ম দান করেছেন। তিনি প্রত্যেক স্তরে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ আমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শরীয়তের মেজাজ ও সীমারেখা

একটি ইল্‌মি সূক্ষতা স্মরণ রাখবেন। এক হলো শরীয়তের প্রকৃতি, আরেক হলো শরীয়তের সীমারেখা। শরীয়তের মেজাজ বা স্বভাবের নাম হচ্ছে তাকওয়া। আর শরীয়তের সীমারেখার নাম হচ্ছে ফতোয়া। যদি তোমরা শরীয়তের প্রকৃতি বা স্বভাবের অবস্থা জানতে চাও, তাহলে হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগের প্রতি তাকাও। আর যদি শরীয়তের পরিধি সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে হযরত ওছমান ও হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। তাহলে বুঝতে পারবে, সহনশীলতার সীমারেখা কত। শরীয়তের পরিধি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

ওলামায়ে কেরাম ও দাওয়াতে দীন

ওলামায়ে কেরামের কাজ হচ্ছে জীবনভর ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। আপনি মাদরাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এবার জাতির কাছে কীভাবে তা পৌঁছানো যায় তার প্রস্তুতি নিতে হবে। যারা কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দিচ্ছেন, তারাও দীনের দাওয়াতের কাজই করছেন। দীনের দাওয়াতের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। বর্তমান যুগে তাবলীগের সুরতে দীনের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। এটিও খুব উত্তম পন্থা। তবে দাওয়াতের কাজকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। যে-সমস্ত ওলামায়ে কেরাম জুমার খুতবায় উপদেশ দিচ্ছেন, যারা সকালে মক্তবে শিশুদের কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন, যারা বিকালে হাদীছের শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা সকলেই দীনের দাওয়াতের কাজ করছেন। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ কীভাবে হেদায়াত পেত? তারা এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে, পীর-বুযুর্গদের খানকার মাধ্যমে হেদায়াত পেয়েছে। এটা তো বলতে পারবেন না যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে মাঝখানে শত-শত বছর

ইসলামের দাওয়াতের কোনো কাজ হয়নি। সুতরাং যে-সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ইল্‌মের খেদমত করছেন, তারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করছেন।

তবে এটা বলতে পারেন যে, দাওয়াতের কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। তুমি যদি জনগণের বাহবা পাওয়ার আশায় বক্তৃতা কর, তাহলে এই বক্তৃতা তোমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। আর যদি হৃদয়ে ব্যথা থাকে, নবীর দীনের মহব্বত থাকে, উম্মতের ফিকির থাকে যে, এ মহল্লার সকল মানুষ যেন নামাযী হয়ে যায়, এই এলাকার প্রতিটি ঘর থেকে অশ্লীলতা দূরীভূত হোক, গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র বিনাশ হোক, সমস্ত ঘরে নবীর সুন্নত জারি হোক, এ নিয়তে শিক্ষা দিলে, বক্তৃতা করলে তোমার এ-কাজ দীনের দাওয়াত হিসেবে গণ্য হবে।

দাওয়াতে দীনের স্তর

ইসলাম ধর্মের দাওয়াতের স্তর চারটি। চাই ব্যক্তিগতভাবে হোক চাই সামাজিকভাবে হোক। দাওয়াতে দীনের এই চারটি স্তর সুন্দর করে বুঝে নিন। যেহেতু আপনারা আলেম এবং ভবিষ্যতে জনসাধারণের দিশারী হিসেবে আপনারা-ই কাজ করবেন। তাই আল্লাহ বলেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

'বলে দিন, এ হলো আমার পথ। আমি আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের আহ্বান করি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এবং আমার অনুসারীদেরও।'[১]

সুতরাং ভাই! আপনারা নবীজির ইল্‌মের উত্তরাধিকারী। এই কাজ আপনাদের। অতএব, দাওয়াতে দীনের এই স্তরগুলো জেনে রাখা দরকার। পৃথিবীর যেখানেই দীনের কাজ হবে, এ চার স্তরের মধ্যেই হবে। এটি স্থিরীকৃত বিষয়।

প্রথম স্তর : দাওয়াতের বিদ্যমানতা

প্রথম স্তর হলো, আপনি দাওয়াত দেবেন–

বে-আমলকে আমলের দিকে।

পাপিষ্ঠকে পুণ্যের দিকে।

কাফেরকে ইসলামের দিকে।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০৮

এসবই দাওয়াত। সুতরাং প্রথমে কী করতে হবে? দাওয়াত দিতে হবে। প্রথমে অন্তরে দরদ স্থাপন করতে হবে। নিজের মধ্যে দীনের ভালোবাসা বসাতে হবে। শাসকসুলভ মনোভাব দূর করতে হবে। তোমরা সবাই জাহান্নামি। তোমরা মূর্খ। না-না, এ ধরনের আচরণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে শোভা পায় না। আহ্বানকারী এভাবে আহ্বান করবে যে, সে নিজেকে ওই দলের সদস্য মনে করবে, যাকে সে দাওয়াত দিচ্ছে। এর প্রমাণ নবীজির আদর্শে বিদ্যমান। বদর যুদ্ধের রাতে নবীজি দু'আ করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ لَا يُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ

'হে আল্লাহ! আজ যদি ইসলামের এই ক্ষুদ্র জামাতটিকে নির্মূল করে দেওয়া হয়, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আর কেউ তোমার ইবাদতকারী থাকবে না। মুহাদ্দিছীনে কেরাম এই বাক্যের ব্যাখ্যা লিখেছেন, এটা কেমন কথা ভাই! এই তিনশত তেরোজন মানুষ বিলুপ্ত হয়ে গেলে কেয়ামত পর্যন্ত আর কেউ ইবাদতকারী থাকবে না। মুহাদ্দিছীনে কেরাম এর জবাব দেন যে, এখানে নবীজি নিজেকে তাদের অন্তভুর্ক্ত করে দু'আ করেছেন। সুতরাং এই জামাত শেষ হয়ে গেলে ইবাদতকারী আর থাকে কীভাবে? সুতরাং নিজেকে সেই জামাতের সদস্য ভেবে কথা বললে, উপদেশ দিলে তা গুরুগম্ভীর হবে। এর প্রতি মহব্বত থাকবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের ধরন

ভালোবাসার জগৎ দেখুন। হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের পিতাকে দাওয়াত দিচ্ছেন يَا اَبَتِ হে আমার আব্বাজান! বলে اَبَتِ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি হচ্ছে পিতা-পুত্রের ভালোবাসার শব্দ। অন্তরের নিষ্ঠার পরিচায়ক। বর্তমানে পিতা তার পুত্রের প্রতি নারাজ হলে স্ত্রীকে বলে, তাকে বলো, সে যেন সোজা হয়ে যায়। এটা বলে না যে, হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি সংশোধন হয়ে যাও। রাগে অধীর হয়ে বলে, তাকে বলে দিয়ো সোজা হয়ে যায় যেন। সম্বোধনের অবস্থা পরিবর্তন করে নেয়।

কিন্তু ইবরাহীম (আ.)-এর সম্বোধন ছিল ভালোবাসাপূর্ণ। হে আমার আব্বাজান! কেমন সবিনয় সম্বোধন। সহমর্মিতার কেমন প্রভাব! يَا اَبَتِ হে আমার আব্বাজান! এই নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোর উপাসনা করছেন কেন? অথচ সামনে পিতার চেহারা দেখুন–

لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

'তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দেব। আমার সামনে থেকে সরে যাও।'[১]

পাথর মেরে শেষ করে দেব!

অতঃপর যখন বুঝতে পারলেন, তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন, আমাকে এখানে টিকে থাকতে দেবেন না। তখন যাওয়ার সময় কিন্তু পিতার জন্য বদদোয়া করেননি। বরং বলছেন–

سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي

'আপনি শান্তিতে থাকুন। আপনার জন্য আমি অবশ্যই আমার প্রভুর নিকট ক্ষমার আবেদন করব।'[২]

আব্বাজান! আপনার হেদায়াতের জন্য আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফল হতে পারিনি। এবার আমার মালিকের দরবারে আপনার জন্য প্রার্থনা করব।

সুতরাং আহ্বানকারীর হৃদয়ে এমন ভালোবাসা থাকলে দাওয়াত দিয়ে দেখো তোমার দাওয়াতের কেমন প্রভাব পড়ে। তোমার দাওয়াতে কত মানুষ কত মহল্লা সংশোধন হয়। তাই কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন–

از دل خیزد بر دل ریزد

'দেল থেকে বহির্গমন দেলে পায় আবাসন।'

আমরা আমাদের নিয়ত বুঝতে হবে, আমাদের শিক্ষাদান ও উপদেশের নিয়ত কী হওয়া চাই। কী নিয়ত হলে মানুষ আমাদের দাওয়াতে প্রভাবান্বিত হবে। কী নিয়ত হলে মসজিদের মুতাওয়াল্লী সাহেব আমাদের সেবায় নিয়োজিত হবেন এবং আমাদের দেখে তার আত্মা প্রশান্তি পাবে। এমন নিয়ত হওয়া চাই যে, আজকের জুমায় দুইশতজন আমার উপদেশ শুনে গেল। আগামী জুমায় যেন তিনশোজন পাগলপারা হয়ে ছুটে আসে। তাহলে আমার কাজ পরিশুদ্ধ হবে। যখন নিজের মধ্যে দীনের মহব্বত হবে, তখন তোমার কথায় প্রভাব বিস্তার হবে। সুতরাং দীনের দাওয়াতের প্রথম স্তর হচ্ছে অন্তরে দীনের ভালোবাসা স্থান দেওয়া।

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ৪৬

২. সূরা মারয়াম : আয়াত ৪৭

দ্বিতীয় স্তর : প্রশিক্ষণের অবকাশ

যখনই দীনের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন এমন একটি সময় আসে, যখন আল্লাহ আহ্বানকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। একটু ভেবে দেখুন, তোমার এই আমল দীনের জন্য খাঁটি এবং জবানেও সত্য কি-না, নাকি শুধু তোমার মুখ হতে বের হচ্ছে। যখনই দাওয়াত দেবে, তখন তোমার নিজের ওপর নানা অবস্থার সৃষ্টি হতে হবে। বর্তমানে মানুষ আমাদের নিকট এসে বলে, জনাব! চেষ্টা তো করি; তবে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না।

সুতরাং ভাই! প্রশিক্ষণের সুযোগ হচ্ছে তো? বিষয়টা এমন নয় যে, পাগড়ি পেয়েছেন; কাল থেকেই মানুষ এসে আপনার নিকট বাইয়াত হতে শুরু করবে। মানুষ আপনার ছাত্র হতে থাকবে। প্রশিক্ষণের সময়টা সবার জীবনেই এসে থাকে। মক্কী যুগ সবার জীবনে আসতে হবে। এটা এই দাওয়াতের রাস্তায় আবশ্যিক বিষয়। এ-সময় ধৈর্যের সঙ্গে শরীয়ত ও সুন্নতের ওপর জীবন যাপন করতে হবে।

তুমি দীনের কাজ করবে; তোমার হিংসুক জন্ম নেবে। বিরোধীরা মাথাচাড়া দিয়ে তোমার সামনে অবস্থান নেবে। তুমি অস্থির হবে যে, আমি তো নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছি; তাহলে ওদের কী হলো? ভাই! তারা তো আসবেই; বিরোধিতা করবেই। এটা কীভাবে হতে পারে যে, তুমি দীনের কাজ করবে আর তোমার বিরোধী থাকবে না। আমাদের বুযুর্গরা বলেন, ওই বান্দার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যার হিংসুক নেই। সুতরাং হিংসুক তো থাকবেই। এদিকে তোমার কথা শুনবে, অপর দিকে তোমার বিরুদ্ধে বলতে থাকবে, এগুলো ঠিক নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে নীরবতা পালন করো। অমুক এমন কথা বলছে। জি; আমি তার ইটের জবাব পাথর দ্বারা দেব। তাহলে তুমি আহ্বানকারী থাকতে পারবে না। যোদ্ধা হতে পারবে– আহবায়ক হতে পারবে না। আহবায়ক হতে হলে ধৈর্য অবশ্যক। এদিকে ভালোবাসবে, অপর দিকে হিংসা করবে।

তুমি সহ্য করো। তোমার সহনশীলতা দেখে আল্লাহ তোমাকে সেই অনুযায়ী সাহায্য করবেন। কেমন সাহায্য আসবে, তার হিসাব তুমি করতে পারবে না। সুতরাং দীনের দাওয়াত দাও এবং সাথে-সাথে বিরোধীদের গ্লানি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও। এটা কীভাবে হতে পারে যে, তুমি আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবে আর শয়তানের প্রতিনিধি চুপ করে থেকে তোমার কাজ অবলোকন করবে? এদিকে তুমি দীনের কাজের জন্য প্রস্তুত করবে,

ওদিকে সে শয়তানি কাজের জন্য দাওয়াত দেবে। এর জন্য অভিযোগ করবে না, মানুষের সামনে গিয়ে তার আলোচনা করবে না, গীবত হয়ে যাবে। তুমি ধৈর্য ধরো, নীরবতা অবলম্বন করো। এটি প্রশিক্ষণের অবকাশ, যা সবার জীবনেই আসে।

আগেকার উম্মতদেরও পরীক্ষা করা হয়েছে

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

'মানুষ কি এ কথা মনে করে যে, শুধু আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে; তাদের কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না? তাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে, আমি তাদেরও পরীক্ষা নিয়েছি। সুতরাং আল্লাহ অতি শীঘ্রই জেনে নেবেন, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।'[১]

সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পার্থক্য করবেন। পরিপক্বতা ও অপরিপক্বতার বাছাই করবেন। এজন্যই এটি হচ্ছে প্রশিক্ষণের সুযোগ।

তৃতীয় স্তর : আল্লাহর সাহায্য

তৃতীয় স্তর হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য তোমার সঙ্গী হবে। মানুষ ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করবে, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে কল্যাণ দান করবেন। অনেক সময় তো এত বিলম্ব হয় যে, মানুষ বলে থাকে আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি। আমার কাজ চলছে না। আমার দিকে কেউ মনোনিবেশ করছে না। কেউ আমার কথা শুনছে না। আল্লাহ এ পর্যন্ত তার পরিসর দীর্ঘ করে দেন যে, সে অস্থির হতে থাকে। আল্লাহ বলেন–

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ

'তাদেরকে বড়-বড় সংকট ও বিপদ গ্রাস করে এবং তাদের প্রকম্পিত করে। এমনকি নবী ও তাঁর সঙ্গে যে মুমিনরা রয়েছে, তারা বলতে থাকে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?'[২]

---

১. সূরা আনকাবুত : আয়াত ২, ৩

২. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৪

সারা দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে থাকে, হে আল্লাহ! এখন একমাত্র তুমিই আমাদের সহায়। তখন আল্লাহ বলেন–

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'দেখো! আল্লাহর সাহায্য শীঘ্রই আসছে।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

'এমনকি নবী নিরাশ হয়ে গেলেন এবং ভাবলেন, আমাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হবে। তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছে গেল।'[২]

সাহায্য আসার সময়ই হলো সেটা। দেখো! প্রেসার বাড়তে থাকে। পরিশেষে লিক হয়ে যায়। কেননা, প্রেসারের একটা সীমা রয়েছে। আমরা আল্লাহর কাজ করছি। তখন আল্লাহর কুদরতি নিয়মানুসারে তাতে প্রেসার বৃদ্ধি হতে থাকে। এখন যদি আমরা অধৈর্য হয়ে সেই বৃদ্ধিকে ছিদ্র করে দেই, তাহলে তো বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। এবার আল্লাহর সাহায্য আসবে কীভাবে? হ্যাঁ; আপনি ধৈর্যের সঙ্গে অটল থাকুন। প্রেসার বৃদ্ধি হতে থাকুক। যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন কী হবে?

جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

'আমার সাহায্য আগমন করবে।'[৩]

চতুর্থ স্তর : আল্লাহর শক্তি

প্রথম স্তর দাওয়াতের ক্ষেত্রে আসক্তি। দ্বিতীয় স্তর প্রশিক্ষণের অবকাশ। তৃতীয় স্তর আল্লাহর সাহায্য। সুতরাং যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে, তখন কোনো বিরোধীর বিরোধিতা, কোনো শত্রুর শত্রুতা কার্যকর হবে না। আল্লাহ বলেন–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢

'যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেল, তখন তুমি মানুষদের দলে-দলে ইসলামে প্রবেশ করতে দেখলে।'[৪]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৪
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১০
৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১০
৪. সূরা নাসর : আয়াত ১, ২

দলে-দলে প্রবেশ করতে লাগল। আল্লাহু আকবার! দলে-দলে প্রবেশ করা এটা আল্লাহর সাহায্যের উজ্জ্বল প্রমাণ। যখন দলে-দলে প্রবেশ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তার দীনকে স্থির করলেন। একে বলা হয় কুদরতি সিদ্ধান্ত যে, আমি ঈমানদারদের পৃথিবীতে বদ্ধমূল করেছি।

সুতরাং আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

'তিনি ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে সত্য ধর্ম ও হেদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি তাকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন যদিও কাফেররা তাতে অসন্তুষ্ট।'[১]

তাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক আমি তাকে বিজয়ী করে দেখিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ দীনকে বিজয়ী করে দেবেন। কাফেররা তাতে খুশি থাক বা না থাক। এরপর আল্লাহ বলে দিলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

'আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিয়েছি।'[২]

এ আয়াতটি সেদিন নাযিল হয়েছিল, যেদিন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ

'আজ কাফেররা তোমাদের দীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে।'[৩]

আজ কাফেররা দৃঢ় বিশ্বাস করেছে যে, মুসলমানরা লোহায় গড়া প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান। তাদের পরাস্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। অতঃপর ফলাফল কী হলো?

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

'সুতরাং তাদের ভয় করো না। একমাত্র আমাকে ভয় করো।'[৪]

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৩
২. সূরা মায়েদাহ : আয়াত ৩
৩. সূরা মায়েদাহ : আয়াত ৩
৪. সূরা মায়েদাহ : আয়াত ৩

এ হলো দীনের দাওয়াতের চার স্তর। (১) দাওয়াতে প্রতি মহব্বত (২) প্রশিক্ষণের অবকাশ (৩) আল্লাহর সাহায্য, (৪) আল্লাহর কুদরতি সিদ্ধান্ত। আল্লাহ বলেন–

وَنُرِيْدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ

'আমি ইচ্ছা করেছি, জমিনে যারা দুর্বল তাদের নেতা বানাব এবং উত্তরাধিকারী বানাব।'[১]

সুতরাং কুরআন মাজীদ রাস্তা খুলে দিয়েছে, দেখো, আমার মাহবুবের রাস্তায় চলা চাই। চারটা স্টেশন আসবে। এগুলো অতিক্রম করে তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে হবে।

কুরবানির গুরুত্ব

এজন্যই দীনের রাস্তায় কুরবানি দিতে হবে। তবে তোমার এই উৎসর্গের প্রতিদান পাবে। কী পাবে? একটি দানা নিজেকে নিঃশেষ করে দিল। পরিণামে সাতশত দানা পাওয়া গেল। আল্লাহ বলেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ

'একটি দানার অনুরূপ, যার দ্বারা সাতটি শীষ জন্ম নেয় এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা হয়।'[২]

একটি দানার পরিবর্তে সাতশত দানা পাওয়া গেল। হে আমার মালিক, আমের একটি আঁটি নিজেকে বিলীন করে দিল। তার বিনিময়ে কী পাওয়া গেল? একটি গাছ পাওয়া গেল, যা ভবিষ্যতে হাজারো আম উৎপন্ন করবে। আল্লাহ বলেন–

وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

'আল্লাহ যে-পরিমাণ ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন।'[৩]

সুতরাং একটি দানা নিজেকে বিলীন করল প্রতিদানে সাতশত দানা পাওয়া গেল। আমের একটি আঁটি নিজেকে বিলীন করল, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত হাজার-হাজার আম অর্জিত হলো।

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৫
২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬১
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬১

এতে শিক্ষা দেওয়া হলো, হে আমার বান্দা! জড় বস্তু নিজেকে উৎসর্গ করার ফলে আমি এ পরিমাণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। তোমরা আমার দীনের রাস্তায় তোমাদের আত্মাকে উৎসর্গ করলে আমি তোমাদের কী পরিমাণ দিতে পারি? সুতরাং দীনের দাওয়াত দাও। কুরবানির সঙ্গে টাকা-পয়সা ব্যয় করো। আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করো। অতঃপর আল্লাহর সাহায্য নিজচোখে অবলোকন করো। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কখনো অপমানিত হতে দেন না।

গ্রহণযোগ্যতার পাঁচটি অবস্থা

ঈমানদারদের দু'আ দ্রুত কবুল হয়। দীনের রাস্তায় দু'আ কবুল হওয়ার পাঁচ অবস্থা।

প্রথম অবস্থা : যা প্রার্থনা করা হয়, তা অবস্থার দাবির প্রেক্ষিতে হয়। তাই সঙ্গে-সঙ্গে তা দান করা হয়। আমরা তাকে বলি, তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত, যার দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা : যা চাওয়া হয়, তা অবস্থার দাবির প্রেক্ষিতেই হয়। তবে সেটা কিছু বিলম্বে দান করা-ই সমীচীন। ধীরে-ধীরে দশ বছর চাইতে থাকে। আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দাও, একটা সন্তান দাও। ফলে দশ বছর পর সন্তান হয়। আল্লাহ দান করেছেন। তবে অনেক দিন কাঁদিয়ে।

কোনো কবি বলেন–

خوش نمائید نالۂ شبہائے تو

ذوقہا دارم بہ زاریہائے تو

'রাতের প্রবাহ কত মধুর! আমাকে আল্লাহর দরবারে কান্নার স্বাদ দান করেছে।'

আল্লাহর রাস্তায় কাঁদা আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু। প্রথমে কাঁদতে দেন; তারপর দান করেন।

তৃতীয় অবস্থা : যা চাওয়া হয়েছিল, তা অবস্থার অনুকূলে ছিল না। তাই তা না দিয়ে অনুকূলের বস্তু দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআন এর প্রমাণ বহন করে। হযরত ইমরান (আ.)-এর স্ত্রী ছেলে চাইলেন। তাকে মেয়ে দেওয়া হলো। তবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন–

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

নিশ্চয় ছেলে মেয়ের মতো নয়।'[১]

কেননা, এ ভবিষ্যতে নবীর মা হবে। সুতরাং আমি তা-ই করব, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

চতুর্থ অবস্থা : চাওয়া হয়েছে। তবে এর প্রতিদান দুনিয়াতে দেওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু এই দু'আর বরকতে দুনিয়াতে তার কোনো বিপদ কেটে দেওয়া হবে।

পঞ্চম অবস্থা : চাওয়া হয়েছে। তার প্রতিদান দুনিয়াতে প্রদান করা হবে। হাদীছ শরীফে এসেছে, তাকে এ পরিমাণ দেওয়া হবে যে, ওই বান্দা আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! যদি দুনিয়াতে আমার কোনো দু'আই কবুল না হতো! আমার প্রত্যেক দু'আর প্রতিদান যদি আখেরাতে দেওয়া হতো!

সুতরাং ভাই! আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো। তোমার প্রার্থনা উক্ত পাঁচ সুরত থেকে যেকোনো একটি গ্রহণ করবেই। মনে সান্ত্বনা রাখো। একথা কেন বলছ যে, আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুনছেন না। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এমন কথা কখনো বলবেন না। আল্লাহ দান করে খুশি হন। এমন দানকারী কেউ নেই। হে দুনিয়ার চাকরিজীবীরা! ফ্যাক্টরির মালিক কী দেয়? ১০ হাজার, পঞ্চাশ হাজার। সে ম্যানেজার দ্বারা লাখ টাকা উপার্জন করে ১০ হাজার প্রদান করে। এটাই হচ্ছে মালিকদের রীতি। কিন্তু আমাদের দয়াময় মালিক ধনীদের সম্পদ দান করে বলেন, তোমরা শতকরা আড়াই পার্সেন্ট আমার গরিব বান্দাদের প্রদান করবে। সাড়ে সাতানব্বই পার্সেন্ট আমি তোমার ভাতা নির্ধারণ করেছি। সুতরাং সম্পদশালীরা আড়াই পার্সেন্ট যাকাত দিতে হয় আর সাড়ে সাতানব্বই পার্সেন্ট তার ভাতা। কোনো মালিক কি এ পরিমাণ কাউকে দেয়? আল্লাহ মহামহিম। তিনি এ পরিমাণ দিয়ে থাকেন। তদুপরি তিনি খুশি হন। তবে তিনি দেখেন, তোমার ঈমানের অবস্থা যাচাই করেন।

পর্যবেক্ষণ ও ঈমানের পার্থক্য

একটি হলো পর্যবেক্ষণ, যা চোখে দেখা যায়। আরেকটি হলো ঈমান, যা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ বান্দার ঈমান পূর্ণ করে দেন।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৬

কাজেই দুনিয়ার অনেক কাজ বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হয়। যেমন বাহ্যিকভাবে আমরা দেখে থাকি, সুদের দ্বারা মাল বৃদ্ধি পায়। অথচ শরীয়ত বলে, সুদের দ্বারা মাল হ্রাস পায়। এতে মানুষ ধ্বংস হয়। আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। চোখে দেখা যায়, সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু আল্লাহ কী বলেন? মাল বাড়েনি। জীবনে অনেক সুদখোরকে দেখেছি, আস্তে আস্তে ডুবে যায়। দু-চারজনের কথা নয় বরং হাজার-হাজার মাল্টি মিলিয়ন লোক সুদের পাল্লায় আরোহণ করছে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে নিঃস্ব ও দেওলিয়া হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সুদের পরিণাম হলো ধ্বংস।

সদকা ও যাকাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তোমরা বাহ্যিকভাবে দেখছ, তোমাদের মাল ক্ষয় হচ্ছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে তোমাদের মাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহর নবী শপথ করে বলছেন, সদকার দ্বারা মাল বৃদ্ধি পায়। নবীজি পবিত্র জবানে সাধারণভাবে একটি কথা বলে দেওয়া যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার সত্যতার গুরুত্ব বোঝানের জন্য শপথ করে বলছেন, বাহ্যিকভাবে যদিও দেখছ, তোমার মাল কমে যাচ্ছে, অথচ নবীজি শপথ করে বলছেন, সদকার দ্বারা মাল বৃদ্ধি পায়। আরো দেখুন, কেসাস, রক্তপণ, হত্যার পরিবর্তে হত্যা। বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, আরো একটি প্রাণ নিঃশেষ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন–

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে বিবেকবানরা কেসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।'[১]

তায়াম্মুমের মধ্যে বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, মাটি ধারা আরো ময়লা করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেন, এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের পবিত্রতা। এগুলোর সবকটিই বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। সুতরাং মুমিন বলা হয়, যে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতেও সকল কাজে আল্লাহর বিধানমতো চলে। তবে এটি স্থিরীকৃত বিধান নয় যে, সবকিছুই বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হবে। কোনো-কোনোটা অনুকূলেও হয়।

সুতরাং বলা হয়েছে, তোমরা মুনাফার বান্দা হয়ো না। সম্পদের পেছনে দৌড়িয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও। উপকার হাসিল হলেও ঠিক, না হলেও ঠিক। আমরা তো আল্লাহর বান্দা। আমরা সেই কাজ করব, যা আল্লাহর বিধানের অনুকূলে হয়। দেখুন, বৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৭৯

বলা হয়েছে বৃষ্টির জন্য নামায পড়ো। নামায ও বৃষ্টির মধ্যে তো কোনো প্রকার মিল নেই। তবু বলা হয়েছে, তোমরা বৃষ্টির জন্য নামায পড়ো, তওবা করো আমি তোমাদের বৃষ্টি দান করব।

দাওয়াতদাতার রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে

একটি আশ্চর্য বিষয় শুনুন। বর্তমানে অনেক বন্ধু রিযিকের অস্থিরতার অভিযোগ করেন। হয় রিযিকের অভাবের কথা, না হয় রিযিকে বরকত হচ্ছে না এই অভিযোগ। সুতরাং শুনুন, রিযিকও আসবে, রিযিকে বরকতও হবে। এরজন্য কোনো তাবিজ-কবচের দরকার নেই। কোনো কবিরাজের নিকট যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআন এর সমাধান দিয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

'নিজ পরিবারের লোকজনকে নামাযের আদেশ করো এবং এর ওপর ধৈর্য ধারণ করো। আমি তোমাদের থেকে রিযিক হ্রাস করব না। তোমাদের আমি রিযিক দেব।'[১]

যে-পরিবারের লোকজন তাকবীরে উলার সঙ্গে নামায আদায় করবে এবং নিবিষ্ট চিত্তে নামায আদায় করবে, তারা রিযিক পাবে বলে আমি শপথ করে বলতে পারি। তারা অবশ্যই রিযিক পাবে। এটি আল্লাহর কথা। এটি কুরআনের কথা। এটি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কোথায় তাবিজের পিছে, কোথায় কবিরাজের পিছে যাচ্ছ? অমুক আমার কারবার বন্ধ করে দিয়েছে। অনর্থক অন্যকে দোষারোপ করে মিথ্যা বলছেন কেন? আল্লাহ চাইলে সারা দুনিয়া তা প্রতিহত করতে পারবে না। মজবুত ঈমান তৈরি করো। আল্লাহ বলেছেন–

نَحْنُ نَرْزُقُكَ

'আমি তোমাকে রিযিক দান করব।'[২]

পরিবারের লোকজনকে নামাযের আদেশ দাও। সুতরাং যে-পরিবারের লোকজন বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে নামায আদায় করবে, আল্লাহ বলেন, তার রিযিকের দায়িত্ব আমার ওপর। একটি কথা স্মরণ রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৩২

২. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৩২

জীবনের মধ্যে পাপ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থিরতা থাকবে। এখন আমরা যতই দু'আ করি, অন্যের মাধ্যমে দু'আর প্রার্থনা করি। পাপাচার পরিত্যাগ না করলে জীবনে অস্থিরতা থাকবেই। আমরা দু'আয় কান্নাকাটি করলেও কাজ হবে না। তাকওয়ার দ্বারা রিযিকে বরকত আসে। আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'যদি লোকালয়বাসী ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের কল্যাণের দ্বার খুলে দেব।'[১]

আশ্চর্যের কথা! পাখি তার বাসা থেকে খালি পেটে বেরিয়ে যায়। কোনো কিছু সঞ্চয় করে না। বিকালবেলা পেট ভরে বাসায় ফিরে। আর মানবজাতির অবস্থা দেখুন। সকালে পেট ভরে ঘর থেকে বের হয় আর বিকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে। স্ত্রীকে বলে, তাড়াতাড়ি রুটি পাকাও। পেটটাও কত বড় যে, দুটি রুটি খেয়ে পেট ভরে যায়। অপর দিকে হাতিকে দেখুন। টন হিসাবে খাবার খায়। মাছের দিকে তাকাও। টনের পর টন খাবার খায়।

সুতরাং যারা টন হিসাবে খাবার খায়, তাদেরও আল্লাহ খাবার দিয়ে থাকেন। আর দুই রুটির খাবারের প্রাণী তুমি রিযিকের তাড়ায় আল্লাহর ইবাদত করতে পারছ না। আমরা কেমন মাতাল যে, এই দুটি রুটির অস্থিরতায় আল্লাহকে ভুলে যাই। অথচ তার কাছ থেকে আমাদের রিযিক আসে। এজন্যই আমাদের উচিত, গোনাহের কাজ পরিহার করে আল্লাহর তত্তাবধানে এসে যাই। যারা গোনাহের কাজ বর্জন করবে, আল্লাহ তাদের জমিনে সুদৃঢ় করবেন। এজন্য তাকিয়ে দেখুন, যেসব খানকায় গোনাহের কাজ নিঃশেষ হয়ে গেছে, সেখানে রিযিরেক কোনো পেরেশানি নেই। আর যেসব খানকায় নিজের ইচ্ছামাফিক কাজ করা হয়, সেখানে আল্লাহ দীনকে মিটিয়ে দেন। আল্লাহ পবিত্র কালামে বলেন–

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

'এবং আমি তোমাদেরকে জমিনে বসতি দেব। এটা ওই ব্যক্তির জন্য, যে কেয়ামতের দিন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আমার শাস্তির ভয় করে।'[২]

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬

২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ১৪

যারা আমার সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করবে, আমি তাকে জমিনে আবাদ করব। মসজিদ-খানকা কীভাবে আবাদ হয়? গোনাহের কাজ বর্জনের মাধ্যমে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতেও আবাদ করবেন এবং বাসস্থান দেবেন।

জান্নাত পবিত্র লোকদের জন্য

জান্নাত সেই লোকদের জন্য, যারা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকবে। এজন্যই বলা হয়েছে–

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

'তোমাদের ওপর শান্তি। তোমরা পবিত্র। এবার চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করো।'[১]

ذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى

'এই পুরস্কার তাদের, যারা পবিত্রতা অর্জন করেছে।'[২]

مَسَاكِنَ طَيِّبَةً

'পবিত্র ঠিকানা জান্নাতে।'[৩]

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

'পবিত্র রমণীরা জান্নাতে।'[৪]

شَرَابًا طَهُوْرًا

'পবিত্র শরবত জান্নাতে।'[৫]

সুতরাং বোঝা গেল, জান্নাত পবিত্র লোকদের আবাসন। পবিত্র বস্তু তারাই পাবে। জান্নাতে যেতে হলে গোনাহ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। আমাদের উচিত আমরা দুনিয়াতে প্রয়োজন পুরা করব, অপচয় বর্জন করব। আরাম-আয়েশকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাব না। এটি খুব সূক্ষ্ম বিষয়।

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৭৩
২. সূরা ত্বহা : আয়াত ৭৬
৩. সূরা সফ : আয়াত ১২
৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪
৫. সূরা দাহ্‌র : আয়াত ২১

পৃথিবীতে আমরা কী করব? এখানে মানুষ হোঁচট খায়। ভোগ-বিলাস জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে যায়। বাহন এমন চাই। ঘর এমন চাই। বাগান এমন চাই। ব্যবসা ওই রকম চাই। ভোগ-বিলাসকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে, তো পদে-পদে হোঁচট খাবে। অতএব, পরিপূর্ণ ঈমানের এই ফায়দা যে, আল্লাহ্ ঈমানদারদের সঙ্গে নিরাপত্তার অঙ্গীকার করেছেন, সম্মানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাহচর্যের আশ্বাস দিয়েছেন, ভালোবাসাও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান দয়ালু জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। সময়ের সংকীর্ণতার কারণে কুরআনের আয়াতের নির্যাস বলতে পারলাম না।

দীনের দাওয়াত ঘর থেকে আরম্ভ করবেন

ঘরে সেই পরিবেশ তৈরি করা দরকার। আপনি তো দীনের দাওয়াত দেবেন। তবে এমন নয় যে, শুধু মসজিদে গিয়ে দাওয়াতের কাজ করবেন। নিজের ঘর থেকে দাওয়াতের কাজ শুরু করুন। আল্লাহ্ বলেছেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

'তোমার পরিবারের লোকজনকে নামাযের আদেশ দাও।'[১]

সুতরাং ভাই! পরিবারের লোকজনকে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করা চাই। হুমকিধমকি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। হাসিখুশি অবস্থায় মহব্বতের সঙ্গে সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। ঘরের পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে বাইরের পরিবেশও তৈরি করতে পারবেন না। ঘরের পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা কী? একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন! লুত (আ.)-এর স্ত্রী স্বামীর আবাধ্য হয়েছিল। জাতির অবস্থা কী হলো? সবাই নাফরমান হয়ে গেল। আমাদের প্রিয়নবীর সম্মানিতা স্ত্রীগণ স্বামীর অনুগত হলেন। ফলাফল কী হলো? উম্মত নবীজির অনুগত হয়ে গেল। সুতরাং ঘরের পরিবেশ সংশোধন করা আবশ্যক।

দীন বুদ্ধিতে নয়– বর্ণনায় বিস্তার হয়

দীন বুদ্ধিতে বিস্তৃতি লাভ করেনি। নবীজির বর্ণনার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। এজন্যই বর্তমানে কিছু মানুষ আছে, যারা আধুনিক, তারা মনে করে, টিভির পর্দায় এলে দীন প্রচার পাবে। ভাই! এ সমস্ত বুদ্ধিতে দীন প্রচার হয়নি। নবীজির প্রচারের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৩২

দীনের দাওয়াত ও হিংসুকের দল

এটাও স্মরণে রাখবেন যে, যখন দীনের দাওয়াত দেবে, তখন কিছু লোক তোমার সাথি হবে, কিছু লোক তোমার বিরোধী হবে, হিংসুক হবে। এর সমাধান কী? এর সমাধান হলো, ভক্তদের থেকে উদাসীন না হওয়া এবং বিদ্বেষীদের থেকে ঘাবড়ে না যাওয়া। দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাও। এটাই মূলনীতি। মোজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, অস্থিরতার অপর নাম দীন। এ পৃথিবীতে দাওয়াতদাতার অবসর নেই। দাওয়াতদাতার অবস্থা হলো, মানুষ সুখনিদ্রায় বিভোর থাকবে আর সে জায়নামাযে বসে হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকবে। এই অবস্থায় নবীজির পা মোবারক পর্যন্ত ফুলে যেত। এভাবে দীনের কাজ করলে আল্লাহর রহমত আসবে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের কুরবানির দৃষ্টান্ত

দাওয়াতের কাজে বিপদের সম্মুখীন হলে নিজের নফসকে আমাদের পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত শুনিয়ে দাও। স্মরণ করো এই রাস্তায় আমাদের পূর্বপুরুষগণ কী করেছেন। বুযুর্গদের সঙ্গে কী করা হয়েছে। ওলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে। তাকে আমাদের মনীষীদের কাহিনি শোনাও। কিন্তু জেনে রেখো, ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করলে আল্লাহর সাহায্য আসবে। এবার একটি হাদীছের ঘটনা শোনাচ্ছি। ঘড়ি সামনে চলছে। সে কারো অপেক্ষা করছে না। মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি অধম গল্পটির নির্যাস বলছি।

হযরত কা'ব (রাযি.)-এর ঘটনার প্রশিক্ষণমূলক প্রেক্ষাপট

নবীজির কোনো যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা থাকলে অতি সহজে সেটা প্রকাশ করতেন না। বরং পশ্চিম দিকে যাওয়ার ইচ্ছা হলে পূর্ব দিকের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। একটি ঘটনা এমন আছে, যে ক্ষেত্রে নবীজি পূর্ব থেকেই তার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেটি হলো তাবুকের যুদ্ধ। সাহাবাদের বলে দিলেন, আল্লাহর রাস্তায় সফর করতে হবে। মাল জমা করা, কার দায়িত্ব কী ঘোষাণা দিয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রস্তুতি নিলেন। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর পেছনে কিছু মানুষ রয়ে গেল। যারা ঈমানদার; তবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করছে, তারা বের হলো না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.)।

তিনি তাঁর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। তাবুক পৌঁছার পর নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব কোথায়? কেউ বলল, তাঁর অনেক ধনসম্পদ রয়েছে, স্ত্রী-পুত্র আছে। তার ধনসম্পদ তাকে জিহাদে আসতে বারণ করেছে। তখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) বললেন, না; আমি তাকে চিনি। সে খুব আবেগবান ও নিষ্ঠাবান লোক। হয়তো কোনো মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে; তাই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, এর পর থেকে আমি সর্বদা হযরত মু'আয (রাযি.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এতে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, মজলিসে কারো আলোচনা হলে যথাসম্ভব সত্য কথা বলব; না হয় নীরব থাকব। কারো বিরুদ্ধে অহেতুক মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করব না। ভাইকে রক্ষা করব, গীবত করব না। আমাদের সমাজে তো এটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। দুজন মহিলা বসল আর অপর একজনের সমালোচনা শুরু করে দিল।

সুতরাং কারো সম্মুখে অন্যজনের বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করা হলে যথাসম্ভব তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। এটি সাহাবায়ে কেরামের আমল। তাঁরা অপর ভাইয়ের দোষ গোপন রাখার চেষ্টা করতেন। হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, আমি যখন ঘর থেকে বের হলাম, তখন মদিনায় শুধু লেংড়া লুলা, বৃদ্ধ ও মুনাফিক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন আমার অনুভূতি হলো, আমার তো দেরি হয়ে গেছে। এটা আমার ভুল হয়েছে। তারপরও আমি নিয়ত করলাম যে, আমাকে সেখানে যেতে হবে। আমি যাত্রার প্রস্তুতি নিলাম। হঠাৎ সংবাদ এল, আল্লাহর নবী সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমি ভাবলাম, আমার তো বিলম্ব হয়ে গেছে। এবার যেহেতু নবীজি সেখান থেকে ফিরে আসছেন; সুতরাং তিনি আসার পর হাজিরা দেব।

এখানে আমাদের শিক্ষা রয়েছে যে, এ রকম ব্যাপারে আমরা অধিকাংশই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি। শয়তান আরো সুন্দর করে উপস্থাপনার শিক্ষা দেয়, যার ফলে সেটা গোনাহ বলে ধারণাই হয় না। বর্তমানে এই মিথ্যার নতুন নাম হচ্ছে বাহানা। স্ত্রী বলে, আমি আমার স্বামীর সামনে বাহানা করে নিলাম। ছাত্র বলে, আমার ওস্তাদের সামনে আমি বাহানা করে নিলাম। ভাই! এটা বাহানা বা অজুহাত নয়। এটা মিথ্যা। এটা কবীরা গোনাহ। বাহানার শব্দ শিক্ষা দিয়ে শয়তান তোমাকে জানাচ্ছে, এটা গোনাহ নয়। এভাবে

শয়তান বর্তমানে সুদের নাম রেখেছে মুনাফা, যাতে এর মধ্যে গোনাহের ধারণা না হয়। বেহায়াপনার নাম রেখেছে ফ্যাশন, যাতে নির্লজ্জরা বেহায়াপনার পোশাককে গোনাহের কাজ মনে না করে।

ভাই! বর্তমানে কামিজের হাত এই পর্যন্ত রাখা এটার নাম নাকি ফ্যাশন। শয়তান তোমাকে একথা বলবে না যে, এটা নির্লজ্জ কাজ। কেন? কারণ, হলো নির্লজ্জ শব্দ ব্যবহার করলে মানুষ বুঝতে পারবে, এটা করলে পরিণামে লজ্জিত হতে হবে। গীবতের নাম রাখছে গল্পসল্প। আসুন আমরা গল্প করি, মতবিনিময় করি।

বিতাড়িত শয়তান এমন চক্রান্ত চালায়। তার উদ্দেশ্য হলো, আমি তাদেরকে চিনিমিশ্রিত বিষের বড়ি দেব। তিক্ত বড়ি তো কেউ সেবন করবে না। মিষ্টি হলে সবাই খাবে। সুতরাং বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে শয়তান উপকার গ্রহণ করছে। গীবতের নামকরণ করেছে মতবিনিময়। ঘুসের নাম রেখেছে চা-পান, ধার্মিকদের নাম রেখেছে মৌলবাদী। নির্লজ্জতার নাম রেখেছে উদারতা। হে ভাই! নগ্ন দেহে স্ত্রী সঙ্গে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে উদারতা। সুতরাং আমরা বলি, হ্যাঁ; যারা দীনের ওপর চলে, আমল করে তারা মৌলবাদী আর তোমাদের কোনো মূলই নেই। সুতরাং তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ নেই।

তো বলছিলাম, হযরত কা'ব (রাযি.)-এর অবস্থা আমাদের হলে মস্তিষ্কে কত অজুহাত উদ্রেক হতো। হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, আমি বাকশক্তিসম্পন্ন লোক। এমন নয় যে, কথা বলতে পারি না। আমারও বুদ্ধি ছিল যে, কীভাবে কথা বলতে হবে। সুতরাং ধারণা এল, মিথ্যা বলে দেব। অতঃপর নবীজি যখন দু'আ করবেন, তখন তওবা করলে তা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু এই অন্তর নবীজির সান্নিধ্যে গড়ে উঠেছে। সে তা মানতে রাজী নয়। এটা মিথ্যা। আমি আল্লাহর নবীকে মানিয়ে নিতে পারব। কিন্তু এ বিষয়টা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। ফলে আমার ধ্বংস নেমে আসবে।

দেখুন ভাই! কত সহজ পন্থা মাথায় এল যে, মিথ্যা বলে দেব। কিন্তু না, তাঁরা নবীজির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তাঁদের হৃদয় সেটা মেনে নিতে পারবে না। তিনি জানেন, মিথ্যা বললে মুক্তি পেয়ে যাব আর সত্য বললে কটু দৃষ্টি পড়বে। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য সত্যের সঙ্গে। এখানেই তাঁদের ও আমাদের জীবনের মধ্যে পার্থক্য। আমরা মিথ্যা বলে দিতাম। অজুহাত পেশ করতাম। সাহাবায়ে কেরামের আচরণ দেখুন। নীতিমালা সামনে রয়েছে যে, আল্লাহর

সাহায্য সত্যের সঙ্গে। তাঁর হৃদয় খুব শাসাচ্ছে, সত্য বলো ভাই! বিপদে পতিত হলে আল্লাহ মুক্তি দেবেন।

নবীজি তাশরীফ আনলেন। মুনাফিকরা সাজিয়েগুছিয়ে নিজেদের অজুহাত পেশ করল। নবীজি তাদের বিষয়টা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন, ঠিক আছে ভাই! সমস্যা ছিল যেতে পারনি, এতে কোনো অসুবিধা নেই। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) সামনে এসে উপস্থিত হলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ-সময় আমি যেমন ধনী ছিলাম এর পূর্বে আমি এমন কখনো ছিলাম না। এ-সময় আমার নিকট যে উত্তম বাহন ছিল এর পূর্বে কখনো এমন ছিল না। আমার অন্তরে অবাধ্যতা নয়, আপনি যেদিন যাত্রা করলেন, সেদিন আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তবে ফিকির ছিল, কোনো দ্রুতগামী বাহনের মাধ্যমে দু-এক দিনের মধ্যে আপনার নিকট পৌঁছে যাব। আমি প্রস্তুতিও নিয়েছি। কিন্তু আজ নয় কাল করতে-করতে সংবাদ পেয়ে গেলাম, আপনি প্রত্যাবর্তন করছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার অলসতা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তাই আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

নবীজি বললেন, শেষ পর্যন্ত যেহেতু সত্য কথাই বলেছ, সুতরাং যাঁর জন্য সত্য বলেছ, তাঁর অপেক্ষা করো। আমিও তাঁর অপেক্ষা করছি। ফয়সালাও তিনিই করবেন। এক্ষেত্রে আমি নীরবতাই অবলম্বন করলাম। আরো দুই সাহাবি ছিলেন হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়্যা ও হযরত জেরার বিন রবী। তাঁরাও উপস্থিত হয়ে সত্য কথা বলে দিলেন। নবীজি তাঁদেরও বললেন, অপেক্ষা করো। তাঁরা অপেক্ষা করছেন। নবীজি প্রথম পদক্ষেপটি নিলেন। সাহাবাদের বললেন, এদের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দাও।

দেখো, নিজের ভোগবিলাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া থেকে বিরত থাকলেন। মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্ক হলো আল্লাহর জন্য। যেখানে দীনের কাজে তোমরা নেই, সেখানে তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে না। সবাইকে নিষেধ করে দিলেন এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে না। হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, অন্য দুজন সাহাবি বয়স্ক ছিলেন। তারা ঘরে বসে থাকেন। কিন্তু আমি যুবক মানুষ– বাইরে যেতে হয়। নামায পড়ার জন্যও আসতাম। তবে অন্তরে ব্যথা ছিল, কীভাবে নবীজিকে মুখ দেখাই। সুতরাং আমি টের পেতাম, নবীজি আমাকে দেখছেন। কিন্তু আমি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তিনি এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। আমি মনে-মনে ভাবতাম, তিনি তো আমাকে দেখছেন; কিন্তু অবজ্ঞাস্বরূপ দেখছেন। আমি

মসজিদে আগমন করতাম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। একদা সকালবেলা সূর্য উদিত হলো। চতুর্দিক আলোকিত হচ্ছে। কিন্তু আমার হৃদয়ে সেই চিন্তার আঁধার ছেয়ে আছে। আমার এমন মনে হতো যে, না জানি আমার পরিণাম কী হবে। আমি অত্যন্ত বিমর্ষ। আমার এক সাথি ছিল আবু কাতাদা। আমি তার বাগানে গেলাম যে, তার সঙ্গে একটু কথা বলে আসি; হয়তো আমার ব্যথা কিছুটা লাঘব হবে। আমি তাকে সালাম করলাম। সে জবাব দিল না। আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম। সে আমাকে উপেক্ষা করল। আমি তাকে বললাম, আবু কাতাদা! তুমি আমার সাথি। ছোট বেলায় এক সঙ্গে খেলাধুলা করেছি, একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমি কেমন তা তুমি ভালো করেই জান। তুমি জান, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।

আবু কাতাদা জবাব দিলেন, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

আল্লাহু আকবার! হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, আবু কাতাদার একথায় আমার চোখে পানি এসে গেল।

দেখুন, সাহাবায়ে কেরামের কেমন ঈমান ছিল। সব সময় এক সঙ্গে থাকতেন। গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নবীজি বলেছেন, তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দাও। তিনি বন্ধ করে দিলেন। হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, আমার চিন্তার রেখা আরো অন্ধকার হলো। অবশেষে আমি একদিন বাজারে গেলাম। কতিপয় লোক পরস্পর বলাবলি করল, কা'ব কে? তখন কেউ বলে দিল, এ হচ্ছে কা'ব। তখন সে আমার নিকট আগমন করে বলল, সিরিয়ার গাসসানের বাদশাহ তোমাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেই হতভাগা তাদের এই ভালোবাসা ভঙ্গ করতে চেয়েছিল। চিঠিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমি জানতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে কথাবার্তার বয়কট চলছে। তুমি তো পৃথিবীতে এমন নিম্ন শ্রেণির লোক হিসেবে জন্ম নাওনি। তুমি আমাদের নিকট চলে আসো। আমরা তোমাকে সসম্মানে বরণ করব। অনেক সময় এমন হয় যে, পিতা সন্তানকে শায়েস্তা করার জন্যে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ প্রদান করে। তখন মানুষ ওই কাজ করে, যা আজ গাসসানের বাদশাহ তোমার সঙ্গে করেছে। আমাদের নিকট আসো; আমরা তোমাকে উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করব।

কোনো-কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করে। আর যে বন্ধু খারাপ প্রকৃতির হয়, সে ভালোবাসার কথা বলে। ভাই! এ হাদীছের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করো।

তিনি চিঠিটা পড়লেন। তিনি বলেন, আমি ওই সময় একটা চুলা খুঁজছিলাম যে, এই চিঠিটা চুলায় নিক্ষেপ করব। আর আমি অত্যন্ত অস্থির হলাম যে, হায়! আমি এত দুর্ভাগা হয়ে গেলাম যে, আজ হতভাগা খ্রিষ্টান আমাকে ধর্মান্তর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি নবীজির সান্নিধ্যের হক আদায় করেছেন। আমাদের সাথেও কেউ এমন করতে চাইলে আমরা এমন আচরণ করব। তার লালায়িত জিহ্বাকে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করব। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে একদূত এসে আমাকে সংবাদ দিল, নবীজি বলেছেন স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি তাকে তালাক দিয়ে দেব? সে বলল, না; স্বামী-স্ত্রীর প্রমোদ থেকে বিরত থাকো। আমি ভাবলাম, আমি যুবক মানুষ; স্ত্রীও কাছে আছে। কীভাবে থাকব? আর কতদিন এই পরীক্ষা চলবে, তা-ও জানা নেই। সুতরাং আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। সে বলল, শুনেছি হেলাল ইবনে উমাইয়্যার ব্যাপারে এমন নির্দেশ এসেছে। তখন তার স্ত্রী নবীজির দরবারে গিয়ে আবদার জানাল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বৃদ্ধ ও অসুস্থ লোক। সেবা করার মতো কোনো লোক নেই। অনুমতি দিলে আমি তার সেবা করব। তখন নবীজি বললেন, ঠিক আছে; যাও, সেবা করার অনুমতি দেওয়া হলো– অন্য কিছু নয়। সুতরাং চলুন, আমরা গিয়ে একসঙ্গে থাকার অনুমতি নিয়ে আসি। তিনি বললেন, আমার মন চাচ্ছে না যে, আমার মাহবুব নারাজ হবেন আর আমি গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে থাকার অনুমতি চাইব। আমি বললাম, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। একাকি থাকার মধ্যেই আমার কল্যাণ নিহিত। লোকজনও আমার সঙ্গে কথা বলছে না। এবার যদি স্ত্রী থেকেও পৃথক হয়ে যাই, তাহলে মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে পারব।

যখন পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হলো, তখন নবীজি হযরত উম্মে সালামার ঘরে থাকাবস্থায় ওহী নাযিল হলো, যার মধ্যে এদের তাওবা কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কিতাবে আছে, হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) জানতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এখনই তাদের সংবাদটা দিয়ে দেব? তিনি বললেন, এখন বললে মানুষ ঘুম থেকে জেগে যাবে। এতে তাদের কষ্ট হবে।

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, আমি যখন এই সংবাদটা জানতে পারলাম, তখন থেকে হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর প্রতি আমার আলাদা বিশ্বাস জন্মে যায়। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকি। বিশ্বাস তো পূর্বে

থেকেই ভালো ছিল। তবে এরপর থেকে আরো গভীর হলো। তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন।

সুতরাং ভাই! আমাদের সম্মুখে কেউ বিপদে নিপতিত হলে আমরা তার বিপদ লাঘব করার চেষ্টা করব। তিনি বলেন, সকালে সূর্য উদিত হলো। নবীজি সকল সাহাবাকে সংবাদটা জানিয়ে দিলেন। তখন এক সাহাবি, যার নাম হামযা ইবনে আমর দাউসী; তিনি আমাকে সংবাদ দিলেন এবং তা প্রচার করলেন। তার কথা শুনে আমি এত খুশি হলাম যে, আমার নিকট পরনের যে-কাপড়টা ছিল তা আমি তাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম। সুতরাং এখানে আমরা শিক্ষা পেলাম, কেউ খুশির সংবাদ বহন করলে তাকে হাদিয়া দেওয়া সুন্নত। সাহাবায়ে কেরাম আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, আমি বের হলাম। মসজিদে নববীতে যাব। রাস্তায় মোবারক মোবারক বলে মানুষ স্লোগান দিতে লাগল। অনেক কষ্টে আমি মসজিদে পৌঁছলাম। তালহা সেখানে বসা ছিলেন। আমাকে দেখামাত্রই দৌঁড়ে এসে আমার সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সেই সাক্ষাৎ এখনো আমার স্মরণ আছে।

কারণ কী ছিল? কারণ ছিল, মুসলমানরা যখন হিজরত করে মদিনায় গিয়েছিলেন, তখন নবীজি হযরত তালহা ও হযরত কা'ব (রাযি.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং বোঝা গেল, দীনের খাতিরে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হয়। তাই ভাইয়ের বিপদে তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। ভাইয়ের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে তা দূর করা জরুরি।

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, সাহাবাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর আমি নবীজির খেদমতে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, নবীজির চেহারা পূর্ণিমার চাদের মতো ঝলমল করছে। এটি নবীজির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, অতি আনন্দের সময়ও নবীজির চেহারা চাঁদের মতো চকচক করত। নবীজি বললেন, কা'ব! আজকের দিন তোমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিন। যে দিন মানুষের তাওবা কবুল হয়, সেই দিনটি তার জীবনের উত্তম দিন। আফসোস! যদি আমাদের আজকের মাহফিলটা আমাদের জীবনের ওই দিন হতো! আজ যদি আমরা সেই রকম তাওবা করতে পারতাম।

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, আমি নবীজির নিকট আবদার জানালাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সম্পদের কারণে আমি জিহাদে বের হতে অলসতা করেছি। সুতরাং এ সম্পদ আমি সদকা করে দিতে চাই। নবীজি বললেন,

নিজের জীবন যাপনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে বাকি সম্পদ সদকা করে দাও। সুতরাং ফাদাক-এর কিছু জমি রেখে বাকি সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। অতঃপর আমি নবীজিকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ সুসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? নবীজি বললেন, তোমার মঙ্গল হোক; এই সুসংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন–

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

'...এবং অপর তিনজন যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। আর তারা বুঝতে পারল, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয় নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিশ্চয় আল্লাহ দয়াশীল, করুণাময়।'[১]

এবার আমাদের চিন্তার বিষয় হলো, খুব সহজে দেখা যায় যে, মিথ্যা বললে ছাড়া পেয়ে যাব আর সত্য বললে বিপদের পাহাড় মাথায় চেপে বসবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম বাহ্যিক অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। তাঁরা শরীয়তকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শরীয়ত বলছে সত্য কথা বল। তারা সত্যই বলেছেন। এতে বিপদের পাহাড় ধসে মাথায় পড়লে হাসিমুখে বরণ করে নেব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার পাহাড় মাথায় ধারণ করেছেন। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ চাইলে তাঁর নবীকে জানিয়ে দেবেন, আমরা তাওবা করেছি। তিনি আমাদের তাওবা কবুল করেছেন। তারা এই কষ্ট সহ্য করার পর আল্লাহ সেটি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ কুরআন পাঠ করে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.)-এর কথা স্মরণ করবে। তারা কেমন পুরস্কার পেয়েছিলেন! জান্নাতিরা তাদের ঘটনা পাঠ করবে।

সুতরাং ভাই! আমাদের সত্যের সাথি হওয়া চাই। প্রাথমিক অবস্থায় সংকট দেখা দিলেও সত্যের কারণে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন,

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

আমাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। তাই, দাঙ্গাহাঙ্গামা, গীবত, পরশ্রীকাতরতার প্রতি পা বাড়াবেন না। ধৈর্য, নীরবতা ও পরহেযগারিকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন, দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা দান করবেন।

শরীয়তের ওপর অটল থাকাও দাওয়াত

সায়্যেদুনা হযরত ওমর (রাযি.)-এর নিকট এক খ্রিস্টান শাহাজাদাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো। সে মুসলমানদের প্রচুর কষ্ট দিয়েছে। সুতরাং সবাই বললেন, তাকে হত্যা করাই উচিত। সকলের পরামর্শক্রমে হযরত ওমর (রাযি.) তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলেন। তাকে মৃত্যুর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। জল্লাদ প্রস্তুত রয়েছে। অভ্যাস অনুযায়ী হযরত ওমর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো কিছুর চাহিদা আছে কি? সে বলল, আমি এক গ্লাস পানি পান করতে চাই। হযরত ওমর (রাযি.) তাকে পানি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পানি দেওয়া হলো। সে পানির পেয়ালাটা হাতে নিয়ে কাঁপতে লাগল। ওমর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, কাঁপছ কেন? সে বলল, আমার ভয় হচ্ছে, আমি পানি পান করতে শুরু করি আর আমাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়ে যায়। তাহলে আমার আর পানি পান করা হবে না। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে; তুমি এই পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হবে না। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি সত্য বলেছেন যে, আমি এ পানি পানি পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হবে না। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ; তুমি এই পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যার আদেশ দেওয়া হবে না।

একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি তার হাতের পেয়ালাটা উপুড় করে সবটুকু পানি মাটিতে ফেলে দিল এবং বলল, আমীরুল মুমিনীন! এখন আর আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। কারণ, আপনি বলেছেন, আমি এই পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন না। আর এ পানি আমার আর কোনোদিনও পান করা হবে না। কেননা, এ পানি তো জমিন পান করে নিয়েছে।

যদি আমাদের মতো মানুষ হতেন, তাহলে কী করতেন? বলতেন, বাটপার কোথাকার! কোথায় চালাকি করছিস! জল্লাদকে হুকুম দিতেন, এই মুহূর্তে তাকে শেষ করে দাও। কিন্তু হযরত ওমর (রাযি.)-এর ঈমানের দৃঢ়তা দেখুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি কথা দিয়েছি, এই পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না। এবার যেহেতু তুমি আর এই পানি

কোনোদিনও পান করতে পারবে না; সুতরাং তোমার মৃত্যুদণ্ডের রায় আমি রহিত করে দিলাম।

সাহাবা কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন, এ কেমন কথা! ইসলামের এত বড় শত্রু, তাকে এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে? জল্লাদকে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিলেন। যখন জল্লাদ চলে যাচ্ছে, তখন শাহজাদা বলল, আমীরুল মুমিনীন! যেহেতু মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম; এবার আমি পড়ে নিলাম 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলাল্লাহ।' উপস্থিত সবাই অবাক। হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! মুক্তি পেয়ে কালেমা পড়ার রহস্য কী? মুক্তি পাওয়ার পূর্বেও তো পড়তে পারতে? সে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমি পূর্বেই পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু ভাবলাম, এখন যদি কালেমা পাঠ করি, তাহলে মানুষ বলবে, আমি মৃত্যুর ভয়ে কালেমা পাঠ করেছি। তাই কোনো কৌশল খুঁজছিলাম, যাতে আমি মৃত্যু থেকে রেহাই পেয়ে যাই। ফলে এ কৌশলের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার পর আমি আনন্দ চিত্তে কালেমা পাঠ করলাম। এবার মানুষ আমাকে মৃত্যুর ভয়ের অপবাদ দিতে পারবে না। কারণ, আমি ইসলামের সত্যতা দর্শন করেই মুসলমান হয়েছি।

দেখুন, সত্যের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য কীভাবে আসে। সুতরাং আমরাও কানুন বানিয়ে নেব যে, শরীয়তের বিধানমতো জীবন গড়ব, সত্যের সঙ্গে অবস্থান নেব, সুন্নতের ওপর আমাল করব। বাহ্যিক অবস্থার প্রতি তাকাব না। আল্লাহ নিজেই আমাদের অবস্থাকে আমাদের অনুকূল করে দেবেন। আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করবেন। দীনের ওপর আমাদের অটল থাকা চাই। এর জন্য যদি আমাদের শহীদও হতে হয়, তবে এ আমাদের সৌভাগ্য। তা আমরা হাসিমুখে বরণ করে নেব। আমাদের দেহ থেকে জান পৃথক করা হতে পারে, তবু আমাদের ঈমান যেন হনন না করতে পারে। কী করবে? আগুনে জ্বালাবে, ফাঁসিতে চড়াবে। প্রাণে হত্যা করবে? ওলামায়ে কেরামের অন্তরে দীনের প্রতি এমন ভালোবাসা থাকলে এর প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর পড়বে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর দৃঢ়তা

ঈমানের ওপর সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ়তা দেখুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর দৃঢ়তা লক্ষ করুন। শত্রুরা ঘেরাও করে নিয়েছে। তিনি জানতে পেরেছেন, সাথিদের অধিকাংশই শহীদ হয়ে গেছেন। কয়েকজন বেঁচে আছেন শুধু। ভাবলেন, আমিও তো শহীদ হয়ে যাব; সুতরাং

শেষবারের মতো মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিই। ভেতরে গেলেন, আম্মাজান কেনম আছেন? আমি শেষবারের মতো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

বৃদ্ধা মা, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। বললেন, বাবা কী হয়েছে? এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আম্মাজান! আমার সাথিদের অধিকাংশই শহীদ হয়ে গেছেন। মনে হয় আমারও সময় বেশি নেই। তাই আপনার দু'আ নিতে এসেছি। আমার জন্য দু'আ করুন। মা বললেন, বাবা! তুমি হকের সঙ্গে আছ, নাকি বাতিলের সঙ্গে আছ? বললেন, আম্মাজান হকের সঙ্গে আছি। মা বললেন, তাহলে ঘাবড়াচ্ছ কেন? বাবা! হাসিমুখে বরণ করে নাও।

দেখুন, বৃদ্ধা মা। অন্ধ হয়ে গেছেন। কিন্তু সন্তানকে কেমন উৎসাহ দিচ্ছেন। এটি নবীজির সান্নিধ্যের শিক্ষা। তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, পুত্র যুদ্ধের পোশাক পরিহিত। বললেন, বাবা! এ পোশাক পরিধান করেছ কেন? আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখেছেন তা তো হবেই। বললেন, আম্মাজান! আমার ভয় হচ্ছে আমি শহীদ হওয়ার পর হতভাগারা আমার লাশ বিকৃত করে দেবে। মা বললেন, বাবা! বকরি জবাই করে হালাল করে দেওয়ার পর তার চামড়া ছিলালে তার কোনো কষ্ট হয় না।

বৃদ্ধা মা তার সন্তানকে শিক্ষা দিচ্ছেন। নবীজি আমাদেরকে যে-শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বললেন, আচ্ছা আম্মাজান! আমি চলে যাচ্ছি। যখন বললেন, আম্মাজান! আমি বের হচ্ছি, তখন তাঁর অন্ধ বৃদ্ধা মা হযরত আসমা (রাযি.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এ আমার সন্তান, যে প্রচণ্ড গরমের লম্বা দিনে সারাদিন রোযা রেখেছে, যে কনকনে শীতের দীর্ঘ রাত নামাযের মুসল্লায় কাটিয়েছে। খেদমত করে তার পিতামাতাকে খুশি রেখেছে। হে আল্লাহ! আমি তার প্রতি খুশী; তুমিও খুশি হয়ে যাও। তারপর ছেলেকে বললেন, বাবা! আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না; তুমি একটু আমার কাছে আস। আমি তোমার গালে একটি চুমু দেব। তোমার গায়ের ঘ্রাণ শুঁকব।

কেমন পাহাড়ের মতো হৃদয় আল্লাহ তাঁদের দান করেছিলেন!

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.)-এর দৃঢ়তা

কিছুদিন আগের কথা। দেওবন্দি ওলামায়ে কেরামদের এক শিষ্য হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.)। তাঁর মা হযরত খাজা মির্জা

জানজানাঁ (রহ.)-এর নিকট বাইয়াত ছিলেন। মির্জা জানজানাঁ (রহ.)-এর বরকতে তাঁর মায়ের অন্তরে ঈমানের নূর চমকাত। মা তাঁর দুই সন্তাকে ডেকে বললেন, মুহাম্মদ আলী! নিজের জীবনটা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে উৎসর্গ করে দেবে। সুতরাং তিনি প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, হে আল্লাহ মুসলমানদেরকে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি দাও। তখন ফিরিঙ্গিদের শাসন ছিল। ওই সময় আল্লাহ তাঁকে ইল্‌ম দান করেছিলেন। তিনি পত্রিকায় লিখতেন। তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ আমাদেরকে দাসত্বের জীবন থেকে যেন মুক্তি দেন। তার প্রচার সম্পর্কে বৃটিশরা অবগত হওয়ার পর তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করো না। অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। তখন মাওলানা মুহাম্মদ আলী (রহ.) এই কবিতাটি রচনা করলেন–

تم یو ہی سمجھا کہ فنا میرے لئے ہے
پر غیب میں سامان بقا میرے لئے ہے
پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو
خوش ہوں کہ یہ پیغام قضا میرے لئے ہے
یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مے کش
مگر آج کی گھنگھور گھٹا میرے ل ئے ہے
کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے
اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا
اکسیر یہی ایک دوا میرے لئے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

'তোমরা তো ভাবছ, আমি ধ্বংস হয়ে যাব, অথচ অদৃশ্যে (পরকালে) আমার স্থায়িত্ব রয়েছে।

হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রাযি.)-এর জন্য যে-সংবাদ এসেছিল, আমার জন্য সেই বার্তা আসার কারণে আমি আনন্দিত।

এমনিতেই তো কালো মেঘের আড়ালে সবাই হত্যার জন্য মত্ত। তদুপরি বর্তমানের মেঘের ঘনকালো ছায়া আমার জন্য।

সারা সৃষ্টি আমার বিরোধী হলেও আমার কী আসে যায়। আমার এক মালিক আমার সঙ্গে থাকলে তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ রাস্তায় খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে যে মৃত্যু আসবে, এটিই আমার প্রতিবিধান।

তাওহীদ তো হলো, হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন, এই বান্দা দোআলমের প্রতি বিরক্ত ছিল একমাত্র আমার জন্য।

অতঃপর মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.) ইচ্ছা করলেন, আমি ইংল্যান্ডে চলে যাব। সেখানে অবস্থান করে মুসলমাদের অবস্থা দর্শন করে সে ব্যাপারে লেখালেখি করব, যাতে সেখানকার জনসাধারণও উপলব্ধি করতে পারে আমি কী চাচ্ছি। তাহলে মূল রহস্য প্রকাশ পাবে। যাওয়ার সময় নিয়ত করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করব না। কয়েক বছর চলে গেল। তাঁর যুবতি কন্যা ফাতেমা গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তাররা শেষ জবাব দিয়ে দিল। তার মা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সর্বশেষ কোনো চাহিদা থাকলে বলো। মেয়ে বলল, মা! আমার মন চাচ্ছে যদি মৃত্যুর আগে একবার আব্বাজানকে দেখতে পারতাম! মা বললেন, ঠিক আছে; চিঠি লেখো।

তাঁর যুবতি কন্যা চিঠি লিখল–

'আব্বা! আমার জীবনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি এখন মৃত্যুর প্রহর গুণছি। মৃত্যুর পূর্বে আপনাকে এক নজর দেখতে চাই।'

চিঠি পেয়ে তিনি তার অপর পৃষ্ঠায় কয়েক লাইন কবিতা লিখে দিলেন–

میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں
تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں
تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اسکو
نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں

'আমি অপারগ। আমার আল্লাহ্ তো অপারগ নন। আমি তোমার থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তিনি তো দূরে নন। তোমার সুস্থতা আমার কাম্য। তবে মাওলার যদি মঞ্জুর না হয়, তা হলেও আমি রাজী।'

ঈমান কাকে বলে দেখুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন ঈমান দান করুন। সত্যিকারের তাওবা করে পবিত্র জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন

'স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভালোবাসার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সৃষ্টির ভালোবাসা পরিশেষে বিচ্ছেদে রূপান্তিরিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী পরিমাণ ভালোবাসা থাকে! কিন্তু মৃত্যু তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দেয়, পরস্পরে দূরত্ব এসে যায়। মাতাপিতার ভালোবাসা যতই গভীর হোক মৃত্যু তা নিঃশেষ করে দেয়।

কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসার পরিণাম হলো মিলন। স্মরণ রাখবেন, যারা সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা রাখবে, কোনো একদিন তাদের এই ভালোবাসার বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। আর যারা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা গড়বে একদিন না একদিন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।'

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

وَقَالَ الْمَشَائِخُ: مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

পার্থিব সম্পর্কের ভিত্তি উদ্দেশ্যের ওপর

আল্লাহ মানবজাতিকে প্রকম্পিত হৃদয় ও অস্থির মস্তিষ্ক দান করেছেন। অনুভূতি ও আবেগবান মানুষ তার জীবনে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করে। তবে প্রত্যেক সম্পর্কের পেছনে কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য নিহিত। উদাহরণস্বরূপ মাতাপিতার সম্পর্ক দেখুন। সন্তানের সঙ্গে সবচেয়ে দৃঢ় সম্পর্ক পিতামাতার। তবে এর পেছনেও উদ্দেশ্য রয়েছে। পিতামাতা চিন্তা করেন, যদি আমাদের কোনো সন্তান হয়, তাহলে সে আমাদের ওয়ারিশ হবে। বার্ধক্যে আমাদের সেবা-যত্ন করবে। সুতরাং মাতাপিতার জন্য সন্তানের প্রয়োজন আর সন্তানের জন্যও মাতাপিতার প্রয়োজন। মাতাপিতা সন্তানকে লালনপালন করবেন, শিক্ষা-দীক্ষা দেবেন। নতুবা অনেক সময় দেখা যায়, মাতাপিতার প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে সন্তান জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন গভীর হয়? স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রয়োজন, স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন। একজন গৃহিণী থাকলে তার ঘরের পরিবেশ পরিপাটি

রাখবে। স্ত্রী থাকলে সন্তান হবে, যে ভবিষ্যতে তার পাশে দাঁড়াবে। সন্তান থাকলে তার জন্য মাতৃচ্ছায়ার প্রয়োজন। স্ত্রীর জন্য স্বামী একান্ত প্রয়োজন, যে তার জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনা করবে।

ছাত্র ও ওস্তাদের সম্পর্ক

ছাত্র-ওস্তাদের সম্পর্কের পেছনেও উদ্দেশ্য রয়েছে। ছাত্রের উদ্দেশ্য থাকে, ওস্তাদ থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করব। সে অনেক দূরের সফর করে অনেক কষ্ট সহ্য করে তাঁর নিকট আগমন করে। ওস্তাদের উদ্দেশ্য হলো, আমি যা শিক্ষা করেছি, সেগুলো যেন স্মৃতিপট থেকে বিলুপ্ত না হয়। আমাকে শিক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে। এরপর পড়ানোর মধ্যে আরো অনেক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক

ডাক্তাররা বলে, আমরা সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু মজুরি তো উচ্চ হারেই নিচ্ছে। সুতরাং ডাক্তারের জন্য রোগীর প্রয়োজন আর রোগীর জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন।

মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক

শ্রমিক না থাকলে মালিক তার ফ্যাক্টরি একা চালাতে পারবে না। এমনিভাবে মালিক বেতন-ভাতা না দিলে শ্রমিক কাজ করতে পারবে না। তার পরিবারের আহার্য যোগাতে পারবে না। সুতরাং উভয়ে একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক

আপনারা চিন্তা করলে দেখবেন, বন্ধুত্বের মধ্যেও স্বার্থ নিহিত। একই শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। এক এলাকায় বাস করছে। পরস্পর সুখ-দুঃখে শেয়ার করছে। প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন নিহিত রয়েছে।

পীর ও মুরীদের সম্পর্ক

মুরীদ তার পীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, যাতে আমার প্রশিক্ষণ হয়। ফলে আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং এখানেও তো প্রয়োজন রয়েছে। এটা জরুরি নয় যে, সকল ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার প্রয়োজন হবে। পরকালের সফলতা অর্জন করা এটিও তো একটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য। সুতরাং পৃথিবীর সকল সম্পর্কের পেছনেই উদ্দেশ্য রয়েছে।

দুটি উদ্দেশ্যহীন সম্পর্ক

কিন্তু দুটি সম্পর্ক এমন রয়েছে, যার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই।

(১) বান্দার প্রতি আল্লাহর সম্পর্ক : বান্দার প্রতি আল্লাহর সম্পর্কের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নেই। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন–

عَبْدِىْ كُلُّكَ يُرِيْدُكَ لِنَفْسِهٖ وَاَنَا اُرِيْدُكَ لَكَ

'হে আমার বান্দা পৃথিবীর সকলেই তার নিজের স্বার্থে তোমাকে ভালোবাসে। আর আমি তোমাকে তোমার কল্যাণের জন্য ভালোবাসি।'

اَدْعُوْكَ لِلْوَصْلِ فَتَأْبٰى • اَبْعَثُ رُسُلِىْ فِى الطَّلَبِ

তোমাকে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছি আর তুমি অস্বীকার করছ। আমি নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছি, তারা তোমাদের হৃদয়ে তলব স্থাপন করবেন। হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করছি।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ

'আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির নীড়ের প্রতি আহ্বান করছেন।'[১]

আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি, জান্নাতে আসো আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। তোমরা আমার দাওয়াত অগ্রাহ্য করলে। আমার রাসূলদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি। তারা তোমাদেরকে আমার সাক্ষাতের বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন। তোমাদেরকে এর জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। আল্লাহর ভালোবাসা স্বার্থবিহীন। বিশ্বের সকল মানুষ কাফের হয়ে গেলে আল্লাহর ক্ষমতায় কোনো প্রকার হ্রাস হবে না। সারা দুনিয়া অনুগত হয়ে গেলে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে কোনো প্রকার বৃদ্ধি হবে না। সুতরাং বান্দার সঙ্গে আল্লাহর ভালোবাসা উদ্দেশ্যবিহীন। এতে কোনো প্রকার স্বার্থ নিহিত নয়।

(২) উম্মতের প্রতি নবীজির ভালোবাসা : দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে উম্মতের প্রতি নবীর ভালোবাসা। কেননা, নবীজির এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যে, মানুষ মুসলমান হলে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ২৫

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন–

لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

'আল্লাহ তোমার সামনের পেছনের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।'[১]

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

'হে আমার হাবীব! তোমার প্রভু অতিশীঘ্রই তোমাকে এ পরিমাণ দান করবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।'[২]

সুতরাং এতে প্রতিভাত হয়, আল্লাহর হাবীবের কোনো প্রয়োজন নেই। তবু তিনি উম্মতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন, কাঁদতেন। এত দীর্ঘ নামায পড়তেন যে, পা মোবারক ফুলে যেত। এটি হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। সুতরাং সমস্ত পৃথিবীর ভালোবাসা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। কিন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এবং উম্মতের প্রতি রাসূলের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ।

পার্থিব ভালোবাসার অবস্থা

পৃথিবীর ভালোবাসার অবস্থা হলো, যে-ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, সে একদিন তার উদ্দেশ্য পূরণ করে নেয়। যখন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তার চোখ পরিবর্তন হয়ে যায়। এজন্য আপনারা দেখে থাকবেন, পার্থিব ভালোবাসার মধ্যে সারা জীবন অভিযোগ থাকে। স্বামীর কাছ থেকে শুনলে স্ত্রীর প্রতি অভিযোগ, এটা করে না সেটা করে না। স্ত্রীর কাছ থেকে শুনলে স্বামীর প্রতি অভিযোগ– সময়মতো ঘরে আসে না, আমার কোনো খোঁজ রাখে না ইত্যাদি।

تجھے اور کی تمنا میرے دل میں تو ہی تو ہے

আমি করি ভাই-ভাই; তার চোখে পানি নাই।

সুতরাং যার পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে, তার পেছনে দৌড়াচ্ছি আর যার মধ্যে রয়েছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করছি না। অথচ যার পেছনে আমরা দৌড়াচ্ছি তার পেছনে দৌড়ে আমাদের কোনো লাভ নেই। কোনো কবি বলেন–

---

১. সূরা ফাতাহ : আয়াত ২
২. সূরা যোহা : আয়াত ৫

کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا
زمیں ملی ہے تو پھر آسماں نہیں ملتا
جسے دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے
زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا
بھرے جہاں میں ممکن نہیں پیار نہ ہو
جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا

'কোনো দিন কেউ পরিপূর্ণ জাহান পায় না। জমিন পেলেও আসমান পাবে না।

যাকে দেখবেন নিজের প্রতি নিজে চিন্তিত অথবা তোমার প্রতি কারো ভালোবাসা, সেখানে জবান পাবে; কিন্তু অন্তর পাবে না।

অতঃপর জেনে রেখো, পৃথিবীতে তুমি প্রিয় হওয়া সম্ভব নয়। যা আশা করছ, তা পরিপূর্ণ এখানে পাবে না।'

কোথাও দেখা যায় স্বামীর প্রতি স্ত্রী সন্তুষ্ট নয়, কোথাও দেখা যায় স্ত্রীর প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট নয়। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের মিল নেই। সন্তানের সাথে মাতাপিতার সম্পর্ক নেই।

সুতরাং পার্থিব ভালোবাসার পরিণাম হচ্ছে অভিযোগ। পার্থিব ভালোবাসার ঊর্ধগমন এটাই হয় যে, উভয় পক্ষের কিছু আবেগ প্রকাশ পায়। কোনো কবি বলেন–

الفت کا جب مزا ہے کہ ہوں وہ بھی بیقرار
دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی

'ভালোবাসার স্বাদ তখনই হয়, যখন উভয় পক্ষ অস্থির হয় এবং উভয় পক্ষে সমান তালে আগুন জ্বলে। এটা হচ্ছে পার্থিব ভালোবাসার অবস্থা।'

আল্লাহর ভালোবাসার অবস্থা

এবার আল্লাহর ভালোবাসার কিছু অবস্থা জেনে নিন। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা কেমন? হাদীছ শরীফে এসেছে, হে আমার বান্দা! তুমি আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হলে আমার রহমত তোমার প্রতি দুই বিঘত অগ্রসর হয়।

وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

তুমি আমার প্রতি হেঁটে-হেঁটে অগ্রসর হলে আমার রহমত দৌড়ে তোমার প্রতি অগ্রসর হয়।

সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয়, বান্দার তুলনায় আল্লাহর ভালোবাসা গভীর। এই ভালোবাসার ঊর্ধ্বগমন কী? যে-ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, তার এমন একটা সময় আসে যে, আল্লাহ বলেন–

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا

আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে।

আল্লাহর ভালোবাসার সোপান দেখুন, তিনি বান্দার সঙ্গে কেমন আচরণ করেন!

স্রষ্টাও সৃষ্টির ভালোবাসার পার্থক্য

(১) মিলন ও বিচ্ছেদের পার্থক্য : স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভালোবাসার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সৃষ্টির ভালোবাসা পরিশেষে বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী পরিমাণ ভালোবাসা থাকে! কিন্তু মৃত্যু তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দেয়, পরস্পরে দূরত্ব এসে যায়। মাতাপিতার ভালোবাসা যতই গভীর হোক মৃত্যু তা নিঃশেষ করে দেয়।

কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসার পরিণাম হলো মিলন। স্মরণ রাখবেন, যারা সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা রাখবে, কোনো একদিন তাদের এই ভালোবাসার বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। আর যারা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা গড়বে একদিন না একদিন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

(২) হিংসুকের দল : পরস্পরে ভালোবাসা থাকলে এদের মধ্যে পরস্পরে কোনো-না-কোনো বিষয়ে বিদ্বেষও থাকবে। তাই পার্থিব ভালোবাসার মধ্যে বিদ্বেষ লুকায়িত। পক্ষান্তরে আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসার রহস্য হলো দিন-দিন ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্যে বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। তাই কোনো কবি বলেন–

یوں تو ہوتی ہے رقابت لازما عشاق میں
عشق مولی ہے مگر اس تہمت بد سے بری

(৩) আশেক-মাশুকের সম্পর্ক : আশেক-মাশুকের মধ্যে সাধারণতই শত্রুতা সম্পৃক্ত। কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা এই অপবাদ থেকে মুক্ত। আল্লাহর ভালবাসায় শত্রুতা নেই। যতজনই আল্লাহকে চাবে, তাদের পরস্পরে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে, শত্রুতা ও বিদ্বেষ আসবে না।

(৪) ভালোবাসার প্রথম উপস্থাপন : পার্থিব ভালোবাসা উপস্থাপন করতে হয়। যে ভালোবাসবে, সে প্রথমে উপস্থাপ করবে। আল্লাহর ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রথম উপস্থাপন কে করবে? আল্লাহই প্রথম উপস্থাপন করেন। হযরত ইমাম কুরতুবি (রহ.) হযরত আবু যায়েদের এ উক্তি বর্ণনা করেন যে, ৪টি বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমার ভুল ধারণা ছিল। কুরআন শিক্ষার পর আমার সেই ভুল দূরীভূত হয়েছে। এটি দর্শনীয় সূক্ষ্মতা।

প্রথম বিষয় : আমি মনে করতাম, আমি প্রথমে আল্লাহকে ভালোবাসব; তারপর তিনি আমাকে ভালোবাসবেন। যখন কুরআন পাঠ করলাম, তখন দেখলাম, তাতে রয়েছে–

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

'তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে।'[১]

তখন আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ প্রথমে ভালোবাসেন। তারপর মানুষ তাঁকে ভালোবাসে।

দ্বিতীয় বিষয় : আমার ধারণা ছিল, আমি প্রথমে আল্লাহর প্রতি রাজি হব; তারপর তিনি আমার প্রতি রাজি হবেন। যখন কুরআন পড়লাম, তখন দেখলাম, তাতে রয়েছে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট; তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'[২]

তৃতীয় বিষয় : আমার ধারণা ছিল, আমি প্রথমে আল্লাহর যিকির করব; তারপর তিনি আমার আলোচনা করবেন। কিন্তু কুরআন পাঠ করে দেখলাম, আল্লাহ বলেছেন–

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪
২. সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ৮

وَمَا يَذْكُرُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللهُ

'আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে কেউ যিকির করতে পারে না।'[১]

আল্লাহ প্রথমে চান; তারপর মানুষ তাকে স্মরণ করে।

চতুর্থ বিষয় : আমার ধারণা ছিল, আমি প্রথমে তাওবা করি; তারপর আল্লাহর রহমত আমার প্রতি বর্ষিত হতে থাকে। যখন কুরআন পড়লাম, তখন দেখলাম, আল্লাহ বলছেন–

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوْا

'আল্লাহ তাদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, যাতে তারা তাওবা করে।'[২]

সুতরাং আল্লাহর রহমত আগে বর্ষিত হয়; তারপর বান্দা তাওবা করার সৌভাগ্য পায়। কেমন দয়াময় মালিক, যিনি চান, আমার বান্দা আমার দিকে ধাবিত হোক।

(৫) পার্টনার : পার্থিব ভালোবাসার পার্টনার সহ্য করা যায় না। সৃষ্টিজীব আরেকজনকে ভালোবেসে তার থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়, আমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। এটা পার্থিব ভালোবাসার পরিণাম। একমাত্র আমি তোমাকে ভালোবাসছি, তুমি আমাকে ভালোবাসবে, অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর ভালোবাসার রূপরেখা দেখুন। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন সেই সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে–

আল্লাহ জিবারাঈল (আ.)কে ডেকে বলেন, জিবরাঈল! আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি। তখন জিবরাঈল (আ.) আকাশে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। সেই ঘোষণা শুনে সকল ফেরেশতা স্লোগান দিয়ে ওঠেন, আমরাও আল্লাহর সেই অলিকে ভালোবাসি। এরপর জিবরাঈল (আ.) পৃথিবীতে এসে ঘোষণা দেন, যা মানুষের কান শুনতে পায় না; কিন্তু তার অন্তর শুনতে পায়।

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ

'পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করে দেন।'

---

১. সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৫৬

২. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

তারপর আল্লাহ প্রত্যেক অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করে দেন। ফলে সবাই তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।

সুতরাং ভাই! পার্থিব ভালোবাসার ব্যবস্থাপনা হলো, আমি ছাড়া কেউ তোমার প্রতি ভালোবাসা রাখতে পাববে না আর আল্লাহর ভালোবাসার ব্যবস্থাপনা হলো, আমি তোমাকে ভালোবাসি; সুতরাং প্রত্যেকেই যেন তোমাকে ভালোবাসে। কাজেই সৃষ্টি চায়, তোমার দেহটা আমার কাছে চাই। অন্তর যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাক। আর আল্লাহ বলেন, বান্দা! তোমার অন্তরটা আমার হওয়া চাই। তোমার দেহ যেখানেই যাক তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

মহব্বতের দলিল

বান্দার প্রতি আল্লাহর সত্যিকারের ভালোবাসার দলিল থাকে। এবার আল্লাহর ভালোবাসার দলিল শুনুন। যার সঙ্গে ভালোবাসা থাকে, মানুষ তাকে যতটুকু সম্ভব কিছু দিয়ে থাকে। এরপরও বলে, ভাই! আমি আপনাকে কিছু দিতে পারলাম না। আর বন্ধু সামান্য কিছু উপহার দিলে তাতে আনন্দে অবাক হয়ে যায়। তাকে অনেক কিছু মনে করে। এবার দেখুন, আল্লাহ আমাদেরকে এত বড় পৃথিবী দিয়েছেন। অসংখ্য নেয়ামতরাজি দান করেছেন। তারপর আল্লাহ বলেন–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, দুনিয়ার আসবাবপত্র সামান্য।'[১]

হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে সামান্যই দান করেছি। পক্ষান্তরে বান্দার জীবন সীমিত, তার আমলও সীমিত। আর সে তার জীবনে আল্লাহকে স্মরণও করে সীমিতহারে। কিন্তু আল্লাহ বলেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ

'অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারী নারী ও পুরুষ।'[২]

সুতরাং আল্লাহ সামান্য পেয়েও আধিক্যের শব্দ উল্লেখ করেছেন আর তিনি এত পরিমাণ দান করে قليل (অল্প) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এজন্যই মাখলুকের ভালোবাসা ও আল্লাহর ভালোবাসায় কোনো তুলনা হয় না।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৭৭
২. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৫

আল্লাহর বন্ধু কে?

এবার প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর বন্ধু কে? আল্লাহ বলেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'জেনে রাখো; যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনো ভয়ও নেই আর তাদের কোনো চিন্তাও নেই।'[১]

এখানে আল্লাহ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। خوف ভয় خزن চিন্তা। خزن বলা হয় হৃদয়ের ব্যাধিকে, মনের চিন্তাকে। আর خوف বলা হয় বাহ্যিক ভয়কে। সুতরাং আল্লাহ বললেন, আমার বন্ধুদের হৃদয়েরও চিন্তা নেই, বাহ্যিক ভয়ও নেই। তারা কারা?

আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

'যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেযগারি অবলম্বন করেছে?'[২]

সুতরাং এতে প্রতিভাত হয় যে, তাকওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

'আল্লাহর বন্ধু তারা, যারা পরহেযগার।'[৩]

সুতরাং ভাই আমাদের বিবেকের পরিশুদ্ধি হওয়া চাই। বর্তমানে সাধারণ মানুষ বলে, অর্ধ উলঙ্গ আধা অলি আর পূর্ণ উলঙ্গ পূর্ণ অলি। পক্ষান্তরে কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয়, যে-ব্যক্তি ঈমান আনে ও পরহেযগারি অবলম্বন করে, সে আল্লাহর অলি। শুনুন হাদীছ কী বলে–

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'তাওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।'

যে-বান্দা নিজের কৃত অপরাধের ওপর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে, আল্লাহ তাকে তাঁর বন্ধুদের তালিকাভুক্ত করে নেবেন।

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৩
২. সূরা ইউনুছ : আয়াত ৬৩
৩. সুরা আনফাল : আয়াত ৩৪

হাদীছ শরীফে আরো একটি কথা বলা হয়েছে–

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'নিজ হাতে উর্পাজনকারী আল্লাহর বন্ধু।'

সুতরাং আল্লাহর বন্ধুত্বকে জায়নামাযের সঙ্গে নথিভুক্ত করো না। শুধু জায়নামাযে বসে থাকলেই আল্লাহর অলি হওয়া যায় না। কত মানুষ রয়েছে, যাদের ওপর তার পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আছে। পরিবারের সকলের জন্য সে-ই একমাত্র অবলম্বন। সে কাজ করে, পরিশ্রম করে পরিবারের সকলের আহার্যের ব্যবস্থা করে। তারা হালাল রুজি উপার্জনের কারণে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অলিদের সঙ্গে শামিল করেন। তাদের জীবিকা অর্জনের শ্রমকে আল্লাহ ইবাদতের মধ্যে গণ্য করেন। আমি অধম এ-জীবনে এমন লোকও দেখেছি, যে পুলিশের চাকরি করত। কিন্তু আমাদের এই তরিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। সে চাকরিজীবনেও কোনোদিন তাহাজ্জুদের নামায বাদ দেয়নি। সুতরাং ভাই! হালাল জীবিকা অর্জনের মাধ্যমেও মানুষ আল্লাহর অলি হতে পারে। আল্লাহ বলেন–

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

'আল্লাহ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।'[১]

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ পরহেযগারদের ভালোবাসেন।'[২]

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

'ইনসাফকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন।'[৩]

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীকে ভালোবাসেন।'[৪]

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৪
২. সূরা তাওবা : আয়াত ৭
৩. সূরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮
৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯

'আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীকেও ভালোবাসেন।'[১]

কত সুন্দর ধর্ম! আমাদেরকে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিয়েছে। এমন যেন না হয় যে, তোমরা মসজিদে আসবে আর তোমাদের গায়ে ঘামের গন্ধ থাকবে, মুখে লালার গন্ধ থাকবে, মুখে গন্দ থাকলে এলাচি ব্যবহার করো, টুথপেস্ট ব্যবহার করো, ঘামের গন্ধ থাকলে গোসল করো, পোশাক পরিবর্তন করো, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করলে সেই রাস্তায় সুগন্ধির সুবাস দীর্ঘক্ষণ থাকত। নবীজি বলেন–

اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُكُمْ

আমি তোমাদের হৃদয়ের ব্যথার সাথি। ব্যথিত অন্তরকে আল্লাহ নিজের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেন। যারা গরিব, যারা নিঃস্ব, অত্যাচারিত, কারো সীমালঙ্ঘনের কারণে ব্যথিত, নবীজি বলেন, এমন অবস্থায় যাদের হৃদয় ব্যথিত, তাদের হৃদয়ে তোমরা সন্ধান করো; আল্লাহর দর্শন পাবে। কোনো কবি বলেন–

مسجد ڈھادے مندر ڈھادے، ڈھادے جو کچھ ڈھیندا ایں

پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا اے

'মসজিদ ভাঙো, মন্দির ভাঙো; কিন্তু কারো অন্তর ভেঙো না। এটা আল্লাহ সহ্য করতে পারেন না।'

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলাফল

১. আল্লাহর তত্ত্বাবধান : আল্লাহ কাউকে ভালোবাসলে তিনি তার দায়িত্বশীল হয়ে যান। কুরআন বলে–

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

'আল্লাহ পুণ্যবানদের দায়িত্বশীল।'[২]

দায়িত্বশীল বলা হয় অভিভাবককে। কারো লাভ-ক্ষতির দায়িত্বশীল, তার প্রয়োজন পূর্ণকারী; তাকে অভিভাবক বলে। সুতরাং আল্লাহ মানুষের

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২২২
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৯৬

অভিভাবক হয়ে যান। এবার ভেবে দেখুন, শিশুর অভিভাবক হয় তার পিতা। সন্তানের কোনো চিন্তা থাকে না। তার লেখাপড়ার খরচ, ইউনিফর্ম ক্রয় করার টাকা, বই-পুস্তক কোথা থেকে আসবে, আমি স্কুলে কীভাবে যাব এগুলোর কোনো চিন্তা নেই– আমার আব্বু আছেন। তিনি আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। এক ছেলে তার বন্ধুকে বলছে, আমি হজ করতে যাচ্ছি। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, তুমি বিমানের টিকেট পেয়েছ? বলল, না। এহরামের কাপড় খরিদ করেছ? না। হজ কীভাবে করতে হয় তা জান? না। সেখানে হোটেল বুকিং দিয়েছ? না। তুমি কিছুই করলে না; তাহলে হজ করবে কীভাবে? ছেলে জবাব দিল, আমি আমার আব্বুর সঙ্গে যাচ্ছি। এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার বন্ধুর সকল প্রশ্নের জবাব হয়ে গেল। কারণ, পিতা সঙ্গে থাকলে তার আর কোনো কিছুর জন্য ভাবতে হবে না। পিতা-ই সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন।

সুতরাং ভাই! পিতার ব্যবস্থাপনার ওপর যেভাবে সন্তানের বিশ্বাস থাকে, তাকে কোনো কিছুর জন্য ভাবতে হয় না। কারণ, তার দায়িত্বশীল তার পিতা; অতএব যার দায়িত্বশীল স্বয়ং আল্লাহ হয়ে যাবেন, তার ভাবনা কীসের! তিনি কি পিতার চেয়ে অমনোযোগী হয়ে তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন? হাদীছ শরীফে এসেছে, হে আমার বান্দা! তুমি দিনের শুরুতে কয়েক রাকাত নামায আমার জন্য আদায় করে নাও; আমি তোমার সারা দিনের কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। তোমার সকল কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব। একস্থানে আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দ্বারা ভরে দেব। আল্লাহু আকবার!

এক তওবাকারীর মাথার ওপর রহমতের ছায়া

এক তরুণ। তার প্রতিবেশীর এক গৃহপরিচারিকার প্রতি তার চিত্ত আকর্ষিত হয়ে যায়। সে তাকে বলল, দেখো, আমি তোমার জন্য পাগলপারা হয়ে গেছি। I Miss you তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। যেমনটা বর্তমান যুগের চিত্র। মেয়ে বলল, দেখো, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তবে আমি আল্লাহকে ভয় করি। আমি তোমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখতে পারব না। নেককার মেয়ে। তার কথায় ছেলের হৃদয়ে প্রভাব পড়ে যায়। সে ভাবল, এ একজন সাধারণ গৃহপরিচারিকা। এ আল্লাহকে ভয় করছে আর আমি স্বাধীন পুরুষ। আমি তো তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তাহলে আমার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আসছে না কেন! আমি অবশ্যই গোনাহগার হয়ে গেছি।

সঙ্গে-সঙ্গে সে তওবা করল। শুধু তা-ই নয়। এরপর সে ইল্‌ম শিক্ষার জন্য পাগল হয়ে গেল। আমাকে ইল্‌ম শিক্ষা করতে হবে। সুতরাং সে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০/৬০ মাইল দূরে অন্য শহরে কোনো আলেমের নিকট ইল্‌ম শিক্ষার জন্য বের হয়ে গেল। রাস্তায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পরিচয় হলো। জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, অমুক শহরে অমুক আলেমের নিকট ইল্‌ম শিক্ষার জন্য যাচ্ছি। সে বলল, ঠিক আছে; আমিও ওই শহরেই যাব। চলো দুজন একসঙ্গে চলি।

সুতরাং উভয়ে একসঙ্গে দূরপাল্লায় পাড়ি দিচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, গরমের মৌসুম ছিল। মরুভূমির রাস্তা। তাদের প্রচণ্ড গরম অনুভব হচ্ছে। এমন সময় আকাশের একটা মেঘখণ্ড এসে তাদের ওপর ছায়া পরিবেশন করে তাদের সঙ্গে যেতে শুরু করল। তারা যেদিকে যাচ্ছে, সেই মেঘখণ্ডও ওই দিকেই যাচ্ছে। এবার যুবক ভাবল, এই মেঘখণ্ড আমাদের ছায়া দিচ্ছে। এটা অবশ্যই আমার সাথি ভদ্রলোকের আমলের খাতিরে হচ্ছে। আর সে ভাবছে, এই মেঘখণ্ড হয়তো আল্লাহ আমি বৃদ্ধের জন্যেই দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার! আল্লাহর কুদরত যে, যেখানে গিয়ে তারা দুজন দুই রাস্তা ধরল, উভয়ে যার-যার গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে, তখন মেঘখণ্ড সেই যুবকের সঙ্গে যেতে শুরু করল। সুবহানাল্লাহ! তখন ভদ্রলোক যুবকের নিকট আগমন করে জিজ্ঞেস করল, বাবা! তোমার এমন কী আমল আছে যে, সেই আমলের দরুন আল্লাহ এই মেঘখণ্ডকে তোমার সাথি বানিয়ে দিয়েছেন? সে বলল, জনাব! আমি একজন গোনাহগার যুবক। জীবনে এমন কোনো আমল করিনি, যার ফলে আমি আজ এ প্রচণ্ড তাপের মধ্যে আল্লাহর সাহায্য পাব। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, বর্তমানে আমি আমার কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে খাস নিয়তে আল্লাহর দরবারে তাওবা করেছি এবং আল্লাহকে রাজি-খুশি করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি। হয়তো এর ফলেই আল্লাহ আজ এ কঠিন সফরে আমাকে মেঘখণ্ডের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।

দেখুন ভাই! আল্লাহ কেমন সাহায্য করলেন যে, হে আমার বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ, আমি তোমার বন্ধুত্বকে গ্রহণ করে নিলাম। আমিও তো তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, বন্ধুত্ব কাকে বলে।

এক মুসলমানের ঘটনা। শায়খুল হাদীছ (রহ.) ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এক অগ্নিপূজকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, যাও মিয়া! তুমি পথভ্রষ্ট, আগুনের পূজা কর। আগুন তো মাখলুক। আমি মুসলমান; আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর ইবাদত করি। অগ্নিপূজকও বিভিন্নভাবে

দলিল উপস্থাপন করতে লাগল। পরিশেষে রাগের বশীভূত হয়ে মুসলমান ব্যক্তি বলল, ঠিক আছে; এসো; আমরা আগুনের নিকট যাব। আগুন তোমার খোদা, তুমি তার উপাসনা করছ। তুমি আগুনে হাত দেবে। আমিও দেব। আগুন যার হাত দগ্ধ করবে, সে মিথ্যাবাদী।

অগ্নিপূজক ঘাবড়ে গেল। মুসলমান ব্যক্তি ভাবল, সে সন্দেহ করছে। সুতরাং সে তার হাত ধরে উভয়ের হাত এক সঙ্গে আগুনে দিল। আল্লাহর কুদরত, কারো হাতই পোড়েনি। মুসলমান ব্যক্তি মনে-মনে ভাবতে লাগল, হে আল্লাহ! আমি আপনার একত্ববাদে বিশ্বাস করি। আমার হাত আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। সে তো অগ্নিপূজক ও পাপিষ্ঠ। তার হাত আপনি জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তার মনে এমন ভাব উদ্রেক হওয়ার ফলে আল্লাহ তার অন্তরে এলহাম করলেন, হে আমার বান্দা! আমি তার হাতকে কীভাবে জ্বালাব, যেখানে তুমি তার হাত ধরে রেখেছ।

সুবহানাল্লাহ! ভাই! এভাবেই যারা আল্লাহওয়ালাদের হাতের সঙ্গে নিজের হাতকে সম্পৃক্ত করে রাখবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তার দায়িত্বশীল হবেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর ফরমান

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বলতেন-

اَيُّهَا النَّاسُ اَصْلِحُوْا سَرَائِرَكُمْ تُصْلَحْ عَلَانِيَتُكُمْ

হে লোকসকল! তোমাদের অন্তর ঠিক করে নাও; তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা ঠিক করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ– তোমরা তোমাদের ভেতরটা সংশোধন করে নাও; তোমাদের বাহিরটা সংশোধন করে দেওয়া হবে।

وَاعْمَلُوْا لِاٰخِرَتِكُمْ تُكْفَوْا اَمْرَ دُنْيَاكُمْ

তোমরা পরকালের জন্য কাজ করো; তোমাদের পার্থিব কাজ পূর্ণ করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। তুমি দেখবেও না, তোমার কাজ সমাধা হয়ে যাবে। আপনারা দেখে থাকবেন, অনেক সময় কাজ সমাধা হতে-হতেও আটকে যায়। জনাব! মেয়েটার বিয়ের প্রস্তাব তো অনেক আসত; এখন আসছে না। হুজুর! আমার ছেলে ইন্টারভিউ দিয়েছে। খুব ভালো হয়েছে, সবাই খুশী। কিন্তু এখনো চাকরিটা হচ্ছে না। হুজুর বুঝতে

পারছি না। এই মনে হচ্ছে হয়ে যাবে; কিন্তু হচ্ছে না, এই যে আমরা জীবনে বিভিন্ন বিষয়ের অনুভব করে থাকি, আমাদের কাজ শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, ঝুলে থাকে, কাজে বরকত হয় না, এগুলো কীসের দলিল? যখন আল্লাহ্ আমাদের দায়িত্বশীল হয়ে যাবেন, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে কল্যাণের ব্যবহার করবেন। তখন বান্দার সমস্ত কাজ পরিপাটি হবে। এটা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়।

আল্লাহর জিম্মাদারি

বোখারি শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আগেকার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি অন্য দেশে গিয়ে টাকার সংকটে পড়ে যায়। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পাথেয়ও নেই। সেখানে কোনো পরিচিত লোকও নেই, যার নিকট থেকে ধার করবে। পরিশেষে একজন হৃদয়বান ব্যক্তিকে বলল, ভাই আপনি আমাকে কিছু টাকা করজ দেন। আমি বাড়িতে যাওয়ার পর আপনার টাকা ফেরত দেব। আর এখানে তো আমার কোনো পরিচিত লোক নেই। আপনার ঋণের জন্য আমি জামিন বানাব কাকে? সুতরাং আপনি বিশ্বাস করে আমাকে কিছু টাকা দিন। আপনার আমার লেনদেনের মধ্যে আমি আল্লাহকে আমার জামিনদার বানালাম।

সে বলল ঠিক আছে। যেহেতু আল্লাহকে জামিনদার বানিয়েছ; সুতরাং আমি তোমাকে টাকা দেব। টাকা ধার নিয়ে লোকটি নিজ বাড়িতে চলে আসে। অতঃপর তার টাকা ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। রাস্তায় বিরাট নদী ছিল। নদীতে যাওয়ার পর আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। নদী উথলে ওঠে। নদী পাড়ি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। লোকটি ভাবতে লাগল, এবার কী করা যায়। আমি তো তাকে কথা দিয়ে এসেছি; তার টাকা ফেরত দেব। আমাদের লেনদেনের মধ্যে আমি আল্লাহকে জামিন রেখেছিলাম। সুতরাং সেই জামিনদারের হাওলা করে তার টাকা দিয়ে দিই। এ কথা বলার পর লোকটি তার সামনে একটি লাকড়ি পেল। তাতে ছিদ্রও রয়েছে। সুতরাং সে তার কাছে প্রাপ্য টাকা সেই লাকড়ির ছিদ্রে রেখে ওই ব্যক্তির নামে একটি চিরকুট লিখল, ভাই! আবহাওয়ার দুর্যোগের কারণে আমি আপনার নিকট আসা সম্ভ হচ্ছে না। তাই আমাদের জামিনদারের হাওলা করে আপনার প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিলাম। অতঃপর সে এই লাকাড়িটি নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

এ দিকে ওই লোক লাকড়ি কাটার জন্য পাহাড়ে গেল। পাহাড়টা নদীর পাশেই ছিল। নামায পড়ার জন্য উজু করার উদ্দেশ্যে নদীতে গেল। গিয়ে দেখছে, একটি লাকড়ি নদীতে ভাসছে। সে ভাবল, আমি লাকড়ি সংগ্রহের জন্য পাহাড়ে এলাম, লাকড়ি দেখি নদীতে ভাসছে। সুতরাং এটা নিলে তো আমার অনেক লাভ হবে। এই বলে সে লাকড়িটি নিয়ে গেল। বাড়িতে নিয়ে লাকড়িটা চিরতে আরম্ভ করলে তা থেকে টাকা বের হতে থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার! এ লাকড়ির ভেতর টাকা এল কোথা থেকে। আবার এর মালিকইবা কে? এতক্ষণে টাকার ফাঁকে একটি চিরকুট পেয়ে যায়। তা পাঠ করে সে অবাক! আল্লাহকে জামিন রেখে যে পরদেশি আমার নিকট থেকে টাকা ধার নিয়েছিল, এ দেখি সেই টাকা, যার মালিক আমিই। সুবহানাল্লাহ! দেখুন, আল্লাহ জামিন হলেন আর কীভাবে তার কাজ সমাধা হলো।

আল্লাহর হেফাযতের অদ্ভুদ ঘটনা

আল্লামা কারী সিদ্দীক বান্দোভী (রহ.) একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করলেন। অরণ্যে কোনো আবাদি নেই। আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা এমনই হয়। যেখানে আস্তানা করেন, সেখানে বসতি স্থাপিত হয়ে যায়। কোনো কবি বলেন–

عشق نے آباد کر ڈالے دشت و کوہسار

'ভালোবাসায় অরণ্য ও পর্বত আবাদ করে নেয়।'

আগেকার যুগে সোনা-রুপার টাকা হতো আর সেগুলো থলেতে ভরে নিয়ে যেতে হতো। আল্লামা কারী সিদ্দীক বান্দোভী (রহ.) মাদরাসার ঘর নির্মাণের জন্য কিছু টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে কতিপয় ডাকাত তার দেখা পায়। তারা কারী সাহেবের হাতে টাকার থলি দেখে আরো উৎসাহিত হলো। লোকটি একা-একা যাচ্ছে। সুতরাং তার টাকা ছিনতাই করা কোনো ব্যাপারই নয়। তারা কারী সাহেবের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তিনিও তাদের দেখেই বুঝে গেছেন, ওরা দুষ্কৃতিকারী লোক। তিনি টাকার থলি মাটিতে রেখে দিয়ে পথ চলছেন। ডাকাতরা দেখল, তিনি টাকার থলিটা মাটিতে রেখে দিয়েছেন। সুতরাং তারা তাঁকে কিছু বলল না।

তিনি চলে গেছেন। ওরা থলির নিকট এল। এবার থলি উঠাতে চাচ্ছে। কিন্তু মাটি থেকে থলি কিছুতেই পৃথক করতে পারছে না। অনেক জোরাজুরি করছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে তাদের একজনকে পাঠাল,

যাও ওই লোককে নিয়ে আস। হয়তো তিনি কোনো কামেল লোক হবেন। তিনি আগমন করলে তারা জিজ্ঞেস করল, এতে কী রয়েছে; এত ভারী লাগছে কেন? তিনি বললেন, এতে টাকা ছাড়া অন্য কিছু নেই। বলল, তাহলে আমরা এটা উঠাতে পারছি না কেন? তিনি বললেন শোনো, আমি যখন দেখলাম, তোমাদের ভাব খারাপ, তখন আমি এই থলিটা জমিনে রেখে আল্লাহর নিকট আবদার করলাম, হে আল্লাহ ওরা ধূর্ত লোক, ওদের হাত থেকে আমি এ টাকা রক্ষা করতে পারব না। সুতরাং আপনার দীনের উদ্দেশ্য জমাকৃত টাকা আপনার হাওলা করলাম। আপনার টাকা আপনিই রক্ষা করুন। কারী সাহেবের কথায় ডাকাতদের হৃদয়ে প্রভাব পড়ল। তারা তাঁর নিকট তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেল এবং তার সঙ্গে গিয়ে তারা নিজহাতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করল। শুধু তা-ই নয়; ডাকাতরা কারী সাহেবের মাদরাসার সর্বপ্রথম ছাত্র হলো।

সুতরাং ভাই! আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তিনি ডাকাতদের তাঁর অলি বানান, ডাকাতের সরদারকে গাউছ বানান। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তার পর দেখো, তোমার কাজ কীভাবে সমাধা হয়। তাই আল্লাহ বলেন–

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝

'ঈমানদারদের দায়িত্বশীল আল্লাহ। কাফেরদের কোনো দায়িত্বশীল নেই।'[১]

রিযিকে বরকত

একটি অগ্রিম কথা শুনে নাও। যারা আল্লাহর বন্ধু হতে পারবে, তাদের রিযিকে বরকত হবে। বর্তমানে আপনারা লক্ষ করে দেখুন, ঘরে যতজন সদস্য আছে, সবাই রুজি করছে। তবু তাদের ব্যয় পরিপূর্ণ সংকুলান হচ্ছে না। ঘরের সকল সদস্য চাকরি করছে। এরপরও পরিবারের খরচ ঠিকমতো চালতে পারছে না। এর কারণ, রিযিকে বরকত নেই।

বেবরকতির দৃষ্টান্ত

আমার নিকট এক লোক এল। সে দুটি টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজার, লাখের উপরে তার বেতন। সে আমার নিকট এসে কেঁদে ফেলল, হুজুর

---

১. সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ১১

আমার জন্য দু'আ করবেন। আমি দুটি টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজার। আমার তিনটি সন্তান। তারা স্কুলে পড়ে। প্রতি মাসে আমি দুটি মিল থেকে দুলাখ টাকা বেতন ঘরে নিয়ে আসি। কিন্তু হুজুর! আমার টাকাতে বরকত হচ্ছে না। আমার পরিবারের খরচ আমি পুরাপুরি আদায় করতে পারছি না।

দেখুন ভাই! দুই লাখ টাকা বেতন পায় আর মাত্র তিনটি সন্তান নিয়ে পরিপূর্ণ ব্যয় করে পরিবার চালাতে পারছে না! আরেক লোক দু-হাজার টাকা বেতন পেয়ে পাঁচটি সন্তান নিয়ে কত সুখে দিন কাটায়! সুতরাং এ হলো বরকত ও বেবরকতির দৃষ্টান্ত। এদিকে বরকত নেই, ওদিকে বরকত আছে।

কুরআনের ঘোষণা

মানুষ যখন আল্লাহর বন্ধু হতে পারে, তখন তার রিযিকে বরকত চলে আসে। শুনুন কুরআন কী বলে–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

'যদি লোকালয়বাসী ঈমান আনত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের কল্যাণের দ্বার খুলে দিতাম।'[১]

এতে প্রতিভাত হয় যে, পরহেযগারির জীবন গ্রহণ করলে আল্লাহর কল্যাণের দরজা খুলে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিযিক আসতে থাকে। আল্লাহ বলেন–

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'আল্লাহ বান্দাকে এমনভাবে রিযিক দেন যে, সে ধারণাও করতে পারে না।'[২]

বরকতের দৃষ্টান্ত

এবার একটি ঘটনা শুনুন রিযিকে বরকত কীভাবে হয়। জনৈক আরব হিন্দুস্তানের এক বাদশাহর পারিবারিক ডাক্তার ছিল। অনেক দিন এদেশে থাকার পর নিজদেশে গমনের ইচ্ছা করল। বিদায় নেওয়ার জন্য বাদশাহর দরবারে এলে বাদশাহ তাকে একটা কমলা হাদিয়া দিলেন। সে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেটা গ্রহণ করল। এতদিন পর বাড়ি যাব; মনে-মনে তো আশা ছিল,

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬

২. সূরা তালাক : আয়াত ৩

বাদশাহ আমাকে অনেক উপঢৌকন দেবেন। এ কমলা দিয়ে আমি কী করব? তবে লোকটি ধৈর্যশীল ছিল। তাই ধৈর্যের সঙ্গে সেই লেবুটা গ্রহণ করে ব্যাগে রাখল যে, বাড়িতে গিয়ে তার বিবি-বাচ্চাদের দেবে। তারপর বাড়ির উদ্দেশে রওনা করল। জাহাজে আরোহণ করল।

ঘটনাক্রমে রাস্তায় অন্য দেশের এক বাদশাহর শাহজাদা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তাররা বলল, তাকে কমলালেবু খাওয়াতে হবে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? তার দেশের আবহাওয়া দূষিত। সেই দেশে কমলা পাওয়া যায় না। বাদশাহ চতুর্দিকে লোক পাঠালেন, যেকোনো মূল্যে কমলা সংগ্রহ করে নিয়ে আসো। আমার সন্তানকে বাঁচাতে হবে। পরিশেষে কতিপয় লোক ওই জাহাজেও সন্ধান করতে এল। তার নিকট কমলা পেয়ে তাকেসহ রাজদরবারে নিয়ে গেল। বাদশাহ আবদার জানালেন, বাবা আমার সন্তান গুরুতর অসুস্থ। এ মুহূর্তে তাকে কমলা খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন। তুমি দয়া করে তোমার কমলাটা দিয়ে দাও। সে খুশি মনে কমলাটা দিয়ে দিল।

বাদশাহর ছেলেকে কমলা খাওয়ানো হলো। আল্লাহর অপার মহিমা যে, বাদশাহর ছেলে সুস্থ হয়ে গেল। এবার বাদশাহ এই পথিককে কী পুরস্কার দেবেন তা তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। যাক বাদশাহ তাকে ভুরিভুরি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তার থলে ভরে দিলেন। এগুলো নিয়ে সে তার দেশে গেল। বিবি-বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। আনন্দচিত্তে তাদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে পুনরায় হিন্দুস্তানের বাদশাহর দরবারে চলে এল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কমলাটা কী করেছ? সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। বাদশাহ বললেন, তুমি ভুল করে ফেলেছ।

কেন জাহাঁপনা? ওটা আসলে কী ছিল? বাদশাহ বললেন, সামান্য টাকার লোভে তুমি এত মূল্যবান জিনিসটা বিক্রি করে দিলে!

কী হয়েছে জাহাঁপনা? আমাকে একটু খুলে বলুন।

আচ্ছা; ঠিক আছে। আজ রাত তুমি আমার শাহী মহলে আসবে।

রাত হলে লোকটি বাদশাহর দরবারে গেল। বাদশাহ নিজের বেশভূষা পরিবর্তন করে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হাঁটতে-হাঁটতে বাদশাহ একজন কামারের কর্মস্থলে গেলেন। কামার তার কাজে নিয়োজিত। তাকে দেখে কামার বলল, কী মিয়া এত দেরি হলো কেন?

বাদশাহ বললেন, জনাব! ক্ষমা করবেন। আজ আমার একটু ব্যস্ততা ছিল। বাদশাহ তার সামনে বসে গেলেন। হাতুড়ি হাতে নিয়ে কামারের সঙ্গে

লোহা পেটাতে আরম্ভ করলেন। দু-ঘন্টা কাজ করার পর কামার তাকে দুটি টাকা দিল। তিনি দুটি টাকা নিয়ে ফিরে এলেন।

এ দৃশ্য দেখে ডাক্তার অবাক হলো, তিনি বাদশাহ হয়ে এমন কাজ কীভাবে করেন? কেন করেন? এবার বাদশাহ বললেন, মিয়া! এ হচ্ছে নিজ হাতের হালাল উপার্জন। এই টাকা থেকে আমি তোমাকে ওই কমলাটা হাদিয়া দিয়েছিলাম। এটা হয়তো আরো অনেক উপকারে আসত। যাক তারপরও কম নয়। আল্লাহ এই হালাল উর্পাজনের বিনিময়ে সামান্য একটি কমলার মধ্যে তোমাকে যথেষ্ট বরকত দান করেছেন।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর নিকট এক লোক এসে বলল, হুজুর! হজ করতে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি; দু'আ করবেন। তিনি তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে বললেন, ভাই ঠিক আছে; যান আমাদের জন্য দু'আ করবেন আর প্রয়োজন হলে এই সামান্য পয়সা খরচ করবেন।

সে রওনা দিল। রাস্তায় গিয়ে এক কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। জিজ্ঞেস করল, ভাই! আপনারা কোথায় যাবেন? তারা বলল, আমরা হজের ইচ্ছা করেছি; মক্কায় যাব। আপনি কোথায় যাবেন? বলল, আমিও সেই ইচ্ছায়ই বের হয়েছি।

তারা বলল, আচ্ছা ভালো, তাহলে আমাদের সঙ্গে আসুন; আমরা একসঙ্গেই যাব। আমাদের আরেকজন সাথি আসার কথা ছিল। সে আসতে পারেনি। তার বাহন (উট) খালি রয়েছে। সেটা হাঁকিয়ে নেওয়ার জন্য আরেকজন লোকের একান্ত প্রয়োজন। আপনি এসে যান; এ উটে আরোহণ করুন।

আল্লাহু আকবার! সে উটে আরোহণ করল। সাথি পেল, বাহন পেল। সারা পথ তারা তাকে অতি সমাদর করে আহার করাল। অবশেষে তারা মক্কায় পৌঁছে হজ আদায় করল। হজ করার সময় তাদেরকে হারিয়ে ফেলল। হজের কার্যক্রম শেষ। বাড়িতে চলে আসবে, এমন সময় দেখল তার দেশের কতিপয় লোক হজ করে বাড়িতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলো, পরিচয় হলো। তারা বলল, ভাই! আমাদের সঙ্গে চলুন; আমাদের এক সাথি এখানে মৃত্যুবরণ করেছে। তার বাহনটি খালি। আপনি আমাদের সঙ্গে এসে যান। আপনার কোনো সমস্যা হবে না।

সে তাদের সঙ্গে রওনা করল। দেশে ফিরে হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল যে, হুজুর! খুবই

আরামে ও শান্তিতে যাওয়া-আসা হয়েছে। তিনি বললেন, মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তোমার হজ কবুল করুন। আচ্ছা তাহলে তোমার কোনো খরচই হয়নি। অতএব আমার পয়সাটা দিয়ে দাও। সে তা দিয়ে দিল।

দেখুন, আল্লাহ কেমন বরকত দান করেছেন। আল্লাহওয়ালার চার আনার সিকিও ব্যবহৃত হলো না।

এক বুযুর্গের পুত্র পিতাকে জিজ্ঞেস করল, আব্বাজান! বরকত কাকে বলে আমাকে একটু বাস্তবে দেখিয়ে দেন। তিনি বললেন, বাবা! এই ইঞ্জিনটা দেখছ? বলল, জী আব্বা! বললেন, তোমার বয়স বত্রিশ বছর। তোমার জন্মের আগে এটা ক্রয় করেছিলাম। অথচ এখনো এটা নির্বিঘ্নে চলছে। কোনো সমস্যা হচ্ছে না। যদি বরকত না হতো, তাহলে আজ এটা, কাল সেটা জ্বলে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেত। এর খরচই উসূল করা যেত না।

সূক্ষ্ম বিষয়

কিছু ঘোড়া থাকে সাধারণ। সেগুলো দশ-পনেরো হাজারে ক্রয় করা যায়। আর কিছু ঘোড়া থাকে দৌড়প্রতিযোগিতার ঘোড়া। সেগুলোর দাম মাশাআল্লাহ পাঁচ লাখ, দশ লাখ, পনেরো লাখ পর্যন্ত হয়। আমাদের এক আত্মীয় চৌধুরি সাহেব বলেন, আমার ঘোড়াটার মূল্য পঁচিশ লাখ টাকা। সুবহানাল্লাহ! এ দিকে পঁচিশ হাজার আর ওই দিকে পচিশ লাখ। কেন? এটা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ঘোড়া। এটা সাধারণ ঘোড়া নয়। এবার যদি কোনো নির্বোধ ওই পঁচিশ লাখ টাকার ঘোড়ার মালিককে বলে, জনাব আপনার ঘোড়াটা কিছু সময়ের জন্য দেন; আমার টাঙ্গা গাড়িতে ব্যবহার করব। তাহলে বলুন তখন মালিক তাকে কী বলবে? বলবে, তোর সাহস তো কম নয়। তোর বিবেক কি নষ্ট হয়ে গেছে? এটা কি টাঙ্গা গাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী? সুতরাং ভাই!

যারা আল্লাহর কাজ করে, তারা দীনের ময়দানে আল্লাহর বিজয়ী ঘোড়ার মতো। তাকে আল্লাহ দুনিয়া নামক ঘোড়ার গাড়িতে ব্যবহার করবেন। তার কোনো কাজ আটকাও থাকবে না। আল্লাহ তার সবকিছু পরিপাটি করে দেবেন।

আল্লাহর ওকালতি

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট।'[1]

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

'তিনি উত্তম দায়িত্ববান এবং সর্বোত্তম উকিল।'[২]

উকিল হন অযোগ্য লোকের কর্ম সম্পাদনের জন্য। আপনারা দেখে থাকবেন, ঘরে ছেলের ব্যাপারে কোনো কথা হলে বাপ উকিল হয়ে বলেন, আমার ছেলের সঙ্গে আপনার কী কথা? আমার সঙ্গে কথা বলুন। কারো স্ত্রীর সঙ্গে কোনো বিষয় হলে স্বামী বলে, তার সঙ্গে কীসের আলাপ; আমার সঙ্গে বলুন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দার উকিল হয়ে তার সমস্ত কাজ পরিশুদ্ধ করে দেন। এবার একটু গভীর মনোযোগের সাথে শুনুন। মুনাফিকদের যখন বলা হলো, তোমরা ঈমান আনয়ন করো, তখন তারা বলল–

اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ

'আমরা নির্বোধদের মতো ঈমান আনয়ন করব নাকি।'[৩]

সাহাবাদের তারা নির্বোধ আখ্যায়িত করল! এর জবাবে বলা হলো–

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ

'আরে! তারা নিজেরাই নির্বোধ!'[৪]

যেভাবে ছেলের বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলা পিতা শুনতে চায় না, স্ত্রীর বিষয়ে কোনো আলোচনা এলে সঙ্গে-সঙ্গে তার জবাব দিয়ে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে চান না। পবিত্র কুরআন সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিয়ে দিয়েছে। একলোক নবীজিকে পাগল বলল। আল্লাহ তাঁর হাবীবকে সান্ত্বনা দিলেন–

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩
২. সূরা আনফাল : আয়াত ৪০
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩
৪. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢

'কলম ও তার লিপিবদ্ধ বিষয়ের শপথ। তোমার মালিকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।'[১]

কেমন ভালোবাসাপূর্ণ কথা! আগে সান্ত্বনা দিলেন যে, তুমি পাগল নও। তারপর বলছেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣

'যে অধিক শপথকারী ও লাঞ্ছিত, আপনি তোদের অনুসরণ করবেন না। সে পশ্চাতে নিন্দা করে, চোগলখোরি করে, যে ভালো কাজে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘন করে, সে পাপিষ্ঠ ও কঠোর; তদুপরি কুখ্যাত।'[২]

আল্লাহ ওই লোকের ক্ষেত্রে নয়টি শব্দ বলেছেন, যেগুলোকে আমরা সচরাচর গালি মনে করি। সেই নয়টি শব্দ আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করলেন। আমার হাবীবকে তুই পাগল বললি আর আমি তার জবাব দেব না? সুতরাং আরো দেখুন, আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের কীভাবে রক্ষা করেন। খাওলা বিনতে ছা'লাবা বৃদ্ধা মহিলা। তার স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে তার মায়ের সঙ্গে তুলনা করল– তুমি আমার মায়ের মতো। এর নাম জিহার। এভাবে বললে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। মহিলা নবীজির দরবারে আগমন করল, হুজুর! আমি বৃদ্ধা মহিলা। আমার আর বিয়ের বয়স নেই। কেউ আমাকে বিয়ে করবেন না। তার নিকট থেকে চলে এলে আমি অসহায় হয়ে যাব। তাছাড়া তার ঔরসে আমার কয়েকটি সন্তান রয়েছে। তাদের ছেড়ে থাকা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের জন্য কোনো ফয়সালা করুন। নবীজি বলে দিলেন, না; হবে না, তোমাদের তালাক হয়ে গেছে। তোমরা পৃথক হয়ে যাও। মহিলা হাইকোর্ট থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করল। আল্লাহ বললেন–

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ

'আমি ওই বৃদ্ধা মহিলার বিতণ্ডা শুনেছি, যখন সে তোমার নিকট তার স্বামীর ব্যাপারে কথা বলছিল। অতঃপর সে আল্লাহর দরবারে তার অভিযোগ পেশ করছে।'[৩]

---

১. সূরা কলম : আয়াত ১, ২
২. সূরা কলম : আয়াত ১০- ১৩
৩. সূরা মুজাদালা : আয়াত ১

এরপর তাদের সমাধান হলো। কেমন দয়াময় প্রভু যে, যারা তার প্রতি নিবিষ্ট হয়, তাকে তিনি নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নেন।

নবীজির নিকট একবার কোরাইশদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক এল। নবীজি তাদের উপদেশ দিচ্ছেন। এমন সময় এক অন্ধ লোক নবীজির দরবারে উপস্থিত হলেন। কিছু জিজ্ঞেস করবেন। তখন নবীজি বললেন, ভাই! একটু বসুন; আমি ওদের সঙ্গে আলাপ করছি। সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন না। তবে তার আগমন আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেছে। তাই পবিত্র কুরআনে তার আলোচনা শুরু করে দিলেন–

عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦

'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার নিকট এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো? অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার উপকার হতো। পরন্তু যারা বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন!'[১]

এ সমস্ত শব্দের অনুবাদ করার সাহস আমার নেই। আল্লাহ তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ সম্বোধন করেছেন। আমার এক বান্দার সঙ্গে আপনি বিমুখতার আচরণ করলেন কেন? নবীজির দৃষ্টিকোণও সঠিক ছিল। ডাক্তারের নিকট দুজন রোগী আগমন করল। একজন ক্যান্সারের রোগী, অন্যজন সর্দির রোগী। তখন ডাক্তার সর্দির রোগীকে বসিয়ে রেখে ক্যান্সারের রোগীকে জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা করবে। কোরাইশের ওই রোগীরা ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল। তখন বিজ্ঞ ডাক্তারের রীতি হলো, এরা যেন বাতেনি রোগে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। সে তো তার সর্দির চিকিৎসার জন্য আগমন করেছে। তার চিকিৎসা একটু পরে করলেও চলবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন ভালোবাসাপূর্ণ সম্বোধন করেছেন। আল্লাহওয়ালাগণ তো ওয়ারিশ নন। তাদের ওয়ারিশ স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং ভেবে দেখুন! যাদের ওয়ারিশ আল্লাহ, তাদের অবস্থা কী হতে পারে?

চিন্তার মাঝে সান্ত্বনা

এজন্যই পৃথিবীতে কোনো চিন্তার রেখা দেখা দিলে আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন। তোমার কোনো সাথির কোনো প্রকার সমস্যা হলে

---

১. সূরা আবাসা : আয়াত ১-৬

তুমি যেমন তার মাল বুকিং দিয়ে থাক, তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাল বুকিং দিয়ে থাকেন। দেখুন, মক্কায় কাফেররা নবীজিকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে লাগল। কেউ পাগল বলে, কেউ জাদুকর বলে। এতে আল্লাহর হাবীবের মনে কষ্ট হয়। তখন আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিলেন–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

'আমি জানি, যারা এ সমস্ত কথা বলে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে।'[১]

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

'আপনি আপনার প্রভুর তাসবীহ পাঠ করুন এবং সেজদা আদায় করুন।'[২]

সেই সেজদা ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ আপনার চিন্তা দূর করে দেবেন। কুরআনি প্রেসক্রিপশন পরিক্ষিত ও যাচাইকৃত। কোনো হিংসুক কোনো বিরোধী, কোনো শত্রু তোমাকে কষ্ট দিলে গীবত করবে না, ইটের জবাব পাথর দ্বারা পরিশোধ করবে না। কুরআন বলে এমতাস্থায় তুমি

وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

'নামায আদায়কারী হও।'[৩]

আল্লাহর সামনে হাত উঠাও। আল্লাহ তোমার চিন্তা হৃদয় থেকে মুছে দেবেন। এটি কুরআনি প্রেসক্রিপশন। আল্লাহ বলেন–

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

'ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।'[৪]

অন্যত্র বলেন–

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

'আর আপনার রবের জন্য ধৈর্য ধরুন।'[৫]

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ৯৭
২. সূরা হিজ্‌র : আয়াত ৯৮
৩. সূরা হিজ্‌র : আয়াত ৯৮
৪. সূরা রূম : আয়াত ৬০
৫. সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৭

যেমনভাবে মা তার সন্তানকে উপদেশ দেয়, বাবা! আমার দিকে তাকিয়ে তুমি নীরব হয়ে যাও। তেমনিভাবে আল্লাহ বলেন–

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

'তারা যা বলছে, এর ওপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো।'[১]

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

'তুমি ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, তুমি আমার সম্মুখে আছ।'[২]

আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন আমি তোমাকে দেখছি।

হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর জীবনীতে উল্লেখ আছে যে, তিনি নিজেই বলেন, মাঝে-মাঝে আল্লাহ আমার অন্তরে এলহাম করতেন, হে আবদুল কাদির! তোমার ওপর আমার যে অধিকার রয়েছে, আমি যে তোমার মালিক, তোমার সৃষ্টিকর্তা সেই অধিকারের শপথ! তুমি উন্নত পোশাক পরিধান করো, আমি নয়ন ভরে তোমাকে দেখব। সুতরাং ভাই! যারা আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, আল্লাহ সেই বন্ধুত্ব পূর্ণ করেন। কোনো কবি বলেন–

ہر مرحلہ غم پہ ملی دل کو تسلی
ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے

'চিন্তার সকল ঘাটেই সান্ত্বনা পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিপদের বাঁকে তোমার নাম স্মরণ করি।'

জান ও মালের সংরক্ষণ

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জান, মাল ও ইজ্জত-আবরু সবকিছু সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন–

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

'হে আমার হাবীব! আমি মানুষদের থেকে তোমাকে হেফাযত করব।'[৩]

সুতরাং ভাই! আল্লাহ প্রাণের ও হেফাযত করবেন।

---

১. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩৯
২. সূরা তূর : আয়াত ৪৮
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৬৭

আল্লাহর এক অলি ছিলেন। বাদশাহ কোনো বিষয়ে তাঁর ওপর নারাজ হয়ে যান। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁকে ধরে আমার নিকট নিয়ে আসো; আমি তাকে বাঘের মুখে সোপর্দ করব। তৎকালের মৃত্যদণ্ডের জন্য ফাঁসির মঞ্চ ছিল না। তাই কারো ওপর মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ হলে রাগ মেটানোর জন্য তাঁকে বাঘের সামনে অর্পণ করা হতো।

পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। তার স্ত্রী অনুনয়বিনয় করল। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তারা তাকে নিয়ে এল। স্ত্রী সেখানে বসে কাঁদতে লাগল। বাদশাহর দরবারে উপস্থিত করা হলে বাদশাহ তাঁকে বাঘের সামনে পেশ করার নির্দেশ দিলেন। উজির তা-ই করল। ক্ষুধার্ত বাঘ বুযুর্গের সামনে এসে তার পা স্পর্শ করে সালাম জানিয়ে তার পা জিহ্বা দ্বারা চাটতে শুরু করল। উজির খুব চতুর লোক ছিল। সে বাদশাহর নিকট এসে বিস্তারিত বর্ণনা করে বলল, জাহাঁপনা! তিনি কামেল লোক; অতি শীঘ্র তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নতুবা আপনার বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বাদশাহ তা-ই করলেন। তিনি সুস্থ শরীরে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

স্ত্রী এখনো কাঁদছে। তিনি তাকে সালাম জানালেন। বললেন, কী ব্যাপার; আপনি মুক্তি পেলেন কীভাবে? স্বামীকে পেয়ে স্ত্রী যেন অমাবশ্যার চাঁদ হাতে পেল। তিনি বললেন, এই-এই ব্যাপার; বাঘ এসে আমার পা চাটতে শুরু করল। স্ত্রী বলল, আচ্ছা মেনে নিলাম, বাঘ আপনাকে সম্মান জানিয়েছে। তবে সত্য করে বলুন তো, বাঘ যখন আপনাকে খাওয়ার জন্য এল, তখন তাকে দেখে আপনার অবস্থা কী হয়েছিল। তিনি বললেন, কিছুই না। তার হা করা মুখ দেখে আমি ভাবছিলাম, এটা যদি আমাকে কামড় দেয়, তাহলে তার মুখের লালা আমার গায়ে লেগে যাবে। তাহলে ওর মুখের লালা পাক, নাকি নাপাক এ নিয়ে আমি ভাবছিলাম। এতক্ষণে সে এসে আমাকে সালাম জানাল। আল্লাহু আকবার! দেখুন, আল্লাহওয়ালাদের মৃত্যুর কোনো ভয় নেই।

আমি অধমের সম্মানিত শ্বশুর আলেম ও নেককারদের সরদার আল্লামা খাজা আবদুল মালেক সিদ্দিকী (রহ.) স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বে দিল্লির নিকটবর্তী একস্থানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই স্থানের বর্তমান নাম হচ্ছে গাজী আবাদ। সেখানে কুরআনের শিক্ষা দেওয়া হতো। তিন-চারশ ছাত্র ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অন্যান্য ওস্তাদগণ বললেন, হুজুর! যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। সুতরাং কিছু দিনের জন্য মাদরাসা বন্ধ

দেওয়া দরকার। তিনি বললেন, ভাই! কুরআনের শিক্ষা বন্ধ করতে আমার অন্তরে কষ্ট লাগে। আল্লাহর নাম নিয়ে শিক্ষা চালু রাখুন। মাদরাসার পার্শ্বেই শিখ সম্প্রদায়ের বস্তি। একদা মাদরাসার এক শিক্ষক বাইরে পায়চারি করতে বের হলেন। এক শিখ লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, ভাই মাদরাসায় সেনাবাহিনী নিযুক্ত রেখেছেন! তিনি বললেন, কেন? কী হয়েছে? সে বলল, এই যে পাশের গ্রামের শিখ লোকেরা এ পর্যন্ত তিনবার পরামর্শ করে চাপাতি, দা, রামদা নিয়ে আপনাদের মাদরাসা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়েছে। তারা এই মুসলিম ছাত্রদের দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দেবে। কিন্তু মাদরাসার নিকটে এলে দেখা যায়, মাদরাসার চতুর্দিক পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। ফলে সবাই ফিরে যায়।

তিনি মাদরাসায় এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হযরত খাজা আবদুল মালেক সিদ্দিকী (রহ.) তাজাল্লিয়াত নামক গ্রন্থে লিখেছেন, তারা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতা। তারা মাদরাসা হেফাযত করছিল। কারণ, এখানে কুরআনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মাদরাসার মধ্যে কোনো প্রকার গোনাহের কাজ হচ্ছে না। ছোট ছাত্রদের সঙ্গে বড় ছাত্রদের কখনো মিশতে দেওয়া হচ্ছে না। সর্বক্ষণ নেগরানির মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, তাকরার ও আমলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং ভাই! আল্লাহওয়ালা হলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তার জানের হেফাযত করেন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মালেরও হেফাযত করা হয়। আল্লাহওয়ালাদের মাল পচে না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

'নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের। এর পাদদেশে রয়েছে তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।'[১]

হযরত খিজির (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) যাচ্ছেন। রাস্তায় একটা দেওয়াল ধসে যাচ্ছে। হযরত খিজির (আ.) সেটাকে হাত লাগিয়ে সোজা করে দিলেন। কোনো পারিশ্রমিক নিলেন না। এর পূর্বে তারা ওই শহরে আতিথেয়তা খুঁজেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁদের আপ্যায়ন করেনি। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমরা ক্ষুধায় কাতর। কেউ আমাদের আপ্যায়ন করল না। আর আপনি বিনামূল্যে এই দেওয়ালটা মেরামত করে দিলেন!

---

১. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৮২

এখানে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করলেই তো আমাদের আহারের ব্যবস্থা হয়ে যেত। তখন হযরত খিজির (আ.) বললেন–

এ দেওয়ালটা শহরের দুটি এতিম শিশুর। তাদের পিতা পুণ্যবান ছিল। এই দেওয়ালের নিচে তাদের জন্য কিছু সম্পদ তাদের পূর্বপুরুষ পুঁতে রেখে গেছেন। ওরা বড় হলে তা বের করবে। শিশুদুটি এখনো ছোট। সুতরাং এখন যদি দেওয়ালটি ভেঙে যায়, তাহলে এর নিচের সম্পদ লোকজন নিয়ে যাবে– ওরা পাবে না। তাই বিনামূল্যে মেরামত করে দিয়ে আমি এতিমের মাল সংরক্ষণ করেছি। হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত

كَانَ بَيْنَ الْيَتِيْمَيْنِ وَبَيْنِ الْأَبِ الصَّالِحِ سَبْعَةُ آبَاءٍ

ওই এতিম সন্তান ও যে পুণ্যবান ব্যক্তি তাদের পূর্বপুরুষ এ সম্পদ পুঁতে রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে সাত সিঁড়ি অতিক্রান্ত হয়েছে।

দেখুন, আল্লাহ পুণ্যবানদের সম্পদ সাত সিঁড়ি পর্যন্ত হেফাযত করে রেখেছেন। আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ততদিন রাখতে পারেন।

ইবরাহীম (আ.)কে আগুন থেকে সংরক্ষণ

হযরত ইবরাহীম (আ.)কে আগুন থেকে হেফাযত করা হলো। ইসলামের প্রথম যুগে নবীজির ইন্তেকালের কিছুদিন পর মুসায়লামাতুল কাযযাব নামে এক ভণ্ড নবুওতের দাবি করল। সেখানে আবু মুসলিম খাওলানি নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। মুসায়লামা তাকে ডেকে নিয়ে বলল, তুমি আমাকে নবী মেনে নাও। তিনি বললেন, তা কখনো সম্ভব নয়। তুমি মিথ্যাবাদী। সে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহর অসীম শক্তি যে, তিনি তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। আগুন তাঁর কোনো ক্ষতি করল না। অতঃপর তিনি মদিনায় চলে আসেন। হযরত ওমর (রহ.)-এর যুগ ছিল। মসজিদে নামায আদায় করে বের হচ্ছেন। তাঁর প্রতি হযরত ওমর (রাযি.)-এর দৃষ্টি পড়ল। এ তো অপরিচিত লোক দেখা যাচ্ছে! ভাই! আপনার বাড়ি কোথায়?

বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমার বাড়ি অমুক দেশে মুসায়লামাতুল কাযযাবের এলাকায়। আমীরুল মুমিনীন বললেন, আমরা জানতে পারলাম, সেই এলাকায় মুসায়লামাকে নবী স্বীকার না করার কারণে একজনকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে; কিন্তু আগুন তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। সে সম্পর্কে আপনি যা জানেন আমাদের বলুন। বললেন, হুজুর! সেই অধম

আমিই। সেখানে আমাদের নিরাপত্তা নেই। তাই মদিনায় চলে এসেছি। ওমর (রাযি.) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রেখেছেন, যাদের সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কল্যাণমূলক আচরণ করা হয়, যা আগেকার যুগে নবীগণের সঙ্গে করা হতো।

সম্মানের হেফাযত

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জানের হেফাযত করেন, মালের হেফাযত করেন, ইজ্জত ও সম্ভ্রমের হেফাযত করেন। দেখুন, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর অপরূপা স্ত্রী সারা (আ.)কে নিয়ে সফর করছেন। রাস্তায় এক জালেম বাদশাহ ছিল। সে ঘাঁটে-ঘাঁটে তার লোক বসিয়ে রেখেছিল, সুন্দরী রমণীদের দেখলে আমার নিকট নিয়ে আসবে। যাদের মস্তিষ্ক বিগড়ে যায়, দুর্দশা যার সাথি হয়, তারা-ই এমন কাজ করে। বদশাহর পুলিশ বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে গেল। কী করবেন? তারা তো অপারগ; কিছুই করার নেই। রাত হলো। বাদশাহ তার খারাপ উদ্দেশ্যে তার কামরায় আসতে ইচ্ছা করল। তাঁর দিকে হাত বাড়াতেই তার হাত অবশ হয়ে গেল। সে তার নিকট ক্ষমা চাইল। তিনি ক্ষমা করে দিলেন। তার হাত ভালো হয়ে গেল। পুনরায় নিয়ত খারাপ করল। দ্বিতীয়বার তার হাত অকেজো হয়ে গেল। এভাবে যখন তিনবার হলো, তখন সে বুঝতে পারল, এ কোনো সাধারণ নারী নয়। এ অবশ্যই আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দী হবে। সে বিবি সারাকে মুক্তি দিল এবং তার এক দাসী হযরত হাজেরা (আ.)কে তার সেবা করার জন্য দান করল। হাদীছ শরীফে এসেছে, হযরত সারা (আ.) বলেছিলেন–

كَفَّ اللهُ عَنِّيْ يَدَ الْفَاجِرِ وَاَخْدَمَنِيْ هَاجِرَةَ

আল্লাহ ওই পাপিষ্ঠের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন এবং আমার সেবার জন্যে হাজেরাকে আমার জন্য দান করলেন।

সুতরাং ভাই! যারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জান, মাল ও ইজ্জত সবকিছু হেফাযত করবেন।

সাহায্য ও সহায়তা

আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের সাহায্য করবেন। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমি সংক্ষেপে বলছি। নতুবা বিষয়টি বুঝতে অনেক দীর্ঘ ও প্রচুর সময়ের দরকার। ঈমানদারদের আল্লাহ কীভাবে সাহায্য করেন।

আল্লাহ বলেন–

وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

'আর স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে অল্প, দেশে পরাজিত অবস্থায় পড়ে ছিলে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলে যে, তোমাদের যেন অন্যরা ছো মেরে নিয়ে না যায়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন। নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।'[১]

বোঝা গেল, তিনি দুর্বলদের সাহায্য করেন। হাদীছে কুদসীতে আছে–

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

যে-ব্যক্তি আমার বন্ধুদের সঙ্গে বৈরিতা দেখাবে, তার সঙ্গে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।

আল্লাহ যুদ্ধের ঘোষণা দেন। এর মর্ম কী? দুনিয়াতে যেমন বলা হয়, মিয়া! সাহস থাকলে আমার ছেলের ওপর হাত তুলে দেখ তো। আমার লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে পার; তবু আমার ছেলের একটা লোমও তোমরা ছিড়তে পারবে না। আল্লাহর যুদ্ধের ঘোষণা হুবহু এ-রকম–

وَ لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

'আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোনো পন্থা রাখেন না।'[২]

আল্লাহর সাহায্যের অবস্থা

আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে কেমন সাহায্য করেছেন? আর কিছু বুঝে এলেও একটি বিষয় বোঝে আসে না। সেটা কী? মদিনার নিকটবর্তী ইহুদিদের বস্তি ছিল। তাদের সেই লোকালয় আমি অধম দর্শন করেছি। আল্লাহু আকবার! দেড় মিটার চওড়া দেওয়াল। আমাদের এখানে তো ৩ ইঞ্চি ৫ ইঞ্চি কিংবা ৯ ইঞ্চি দেওয়াল হয় আর ১৩ ইঞ্চি খুঁটি হয়। আর খায়বার কেল্লার দেওয়াল দেড় মিটার চওড়া ছিল। কেমন মজবুত! ফলে মুসলমানরা ভাবলেন, আমরা ইহুদিদের এই কেল্লা জয় করতে পারর না। ইহুদিরাও ভাবল, মুসলমানরা এই কেল্লা জয় করতে সক্ষম হবে না।

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ২৬

২. সূরা নিসা : আয়াত ১৪১

উভয় দিক থেকে একই রকম মন্তব্য। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন, তা মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ ইহুদিদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় ঢেলে দিলেন। তখন তারা পরস্পরে ভাবতে লাগল, এমন যেন না হয় যে, মুসলমানরা আমাদের ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তখন তাদের একজন বলল, ভাই! আমাদের জন্য উচিত হলো, আমাদের বিবি-বাচ্চা ধনসম্পদ এখান থেকে স্থানান্তর করে নিই। এর ওপর তারা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে নিল। এবার তারা মালসামানা সরাতে আরম্ভ করল। মুসলমানরা সে বিষয়ে অবগত হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করল। এমন দুর্ভেদ্য কেল্লাটা আল্লাহ মুসলমানদের হাতে বিজিত করাতে চেয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۤ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

'তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে। তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি এমন দিক থেকে এল, তারা যার কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করেছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মানরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।'[১]

এভাবেই আল্লাহ সাহায্য করেন। তাই তো মক্কা বিজয়ের সময় নবীজি শুকরিয়া আদায় করেছিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْاَحْزَابَ كُلَّهُ

'সমস্ত প্রশংসা সেই এক আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং প্রতিপক্ষের সবগুলো গোষ্ঠীকে পরাস্ত করেছেন।'

---

১. সূরা হাশর : আয়াত ২

সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ

আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তার ভালোবাসা শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। রুহুল মাআনীতে লিখেছেন, আল্লাহ ওই বান্দার বংশধরদের সাত স্তর পর্যন্ত তাদের ঈমান হেফাযত রাখেন।

طُوْبٰى لِلذُّرِّيَّةِ الْمُؤْمِنِ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُمْ كَيْفَ يُحْفَظُوْنَ مِنْ بَعْدِهٖ

আল্লাহওয়ালাদের জন্য মোবারকবাদ! অতঃপর তাদের বংশধরদের জন্যও মোবারকবাদ! এর পর তাদের পরবর্তীদেরও জন্য। এজন্যই আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের দু'আ আমাদেরকে পাহারা দেয়। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, স্বয়ং আল্লাহ তাদের সংরক্ষণকারী হয়ে যান। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে–

قَالَ ابْنُ الْمُنْقَدِرِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَحْفَظُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهٗ وَوَلَدَ وَلَدِهٖ وَعِتْرَتَهٗ وَعَشِيْرَتَهٗ وَاَهْلَهٗ فِيْ حِفْظِ اللّٰهِ مَادَامَ فِيْهِ

আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের খাতিরে তার সন্তান, সন্তানের সন্তান, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে হেফাযত করেন যতদিন পর্যন্ত ওই বান্দা থাকে। সুতরাং ভাই! আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করুন।

দু'আ কবুল হয়

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন। যেমন– শিশু কান্না করলে সঙ্গে-সঙ্গে তার মা তার প্রতি মনোযোগী হয়ে যায়। কারণ, সে তাকে লালনপালন করে। আল্লাহ বান্দাকে মাতাপিতার চেয়ে কোটি গুণ বেশি ভালোবাসেন, তার সবকিছুর ব্যবস্থা করেন। অতএব, সেই বান্দা যখন আল্লাহর দরবারে কাঁদবে, চোখের পানি ফেলবে, আল্লাহ সঙ্গে-সঙ্গে তার ডাকের জবাব দেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

وَاِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهٗ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهٗ

আমার কোনো অলি আমার কাছে প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তা দান করি। আমার নিকট আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় দান করি। আমার নামে কোনো শপথ করলে আমি তা পূর্ণ করি।

সুতরাং আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার মুখটা নাড়া দিয়ে আমার কাছে চাও; আমি তোমাকে দান করতে পারলে খুশি হই।

মাখলুকের অন্তরে তার ভয় ঢেলে দেওয়া

সৃষ্টজীবের অন্তরে আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের ভয় সঞ্চায় করেন। এটি আল্লাহওয়ালাদের বিশেষ প্রভাব।

নবীজি বলেন–

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

'ভয়ের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন।'

হাদীছ শরীফে এসেছে, নবীজি কোথাও সফর করলে এক মাসের পথ দূরে থাকতেই তাঁর ভয় চলে যেত। অর্থাৎ– এক মাসের পথ দূরে কেউ থাকলে তার অন্তরে নবীজির ভয় প্রভাব ফেলত। কোনো কবি বলেন–

نہ تاج وتخت میں نہ لشکر وسپاہ میں ہے
جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

তাজ, সিংহাসন, সেনা ও সৈনিকের মধ্যেও নেই, যা মহান ব্যক্তির নিকট বিদ্যমান রয়েছে।

বাদশাহ আল্লাহওয়ালাদের খাদেম

স্মরণ রাখবেন, দুনিয়ার বাদশাহদের খাদেম হয় পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আর আল্লাহওয়ালাদের খাদেম হয় স্বয়ং বাদশাহর।

আমি সমরকন্দ সফরে গিয়েছিলাম। কেউ বলল, আপনি কি তাইমুর লং-এর সমাধি দেখেছেন? আমি বললাম, না। বলল, চলো একবার দেখে আসি। ইতিহাসের সন্ধানী হয়ে আমি তার সমাধি দেখতে গেলাম। দরজার মধ্যে দেখলাম, 'বিশ্বজয়ী' শব্দটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভেতরে গেলাম। দেখলাম, প্রথমে একটি কবর। তার নিচে ধারবাহিকভাবে আরো তিনটি কবর রয়েছে। আমি দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, তাইমুর লং-এর কবর কি মাঝেরটা? সে বলল, না; তাইমুর লং-এর কবর হলো উপরেরটা। তিনি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, আমার শায়খের পায়ের নিচে আমাকে সমাহিত কোরো। কারণ, আমার শায়খের দু'আর বরকতে আমি বিশ্ব জয় করেছি। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তাঁকে তাঁর শায়খের পায়ের নিচে সমাহিত করা হয়েছে একেবারে ঘেঁষে-ঘেঁষে। মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা রাখা হয়েছে।

একদা ইসালে ছাওয়াবের জন্য খাজা মাসুম (রহ.)-এর মাজারে গেলাম। সেখানে দেখলাম, হযরতের কবরের একটু আগে রাস্তার মধ্যে একটি কবর রয়েছে। তার দুপার্শ্ব দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে সড়ক আগে হয়েছে, নাকি কবর আগে হয়েছে? লোকজন উত্তর দিল, রাস্তা আগেই ছিল। তাহলে রাস্তায় মধ্যে কবর দেওয়া হলো কেন? একজন বলল, এই কবর হচ্ছে আফগানিস্তানের এক বাদশাহর। সে শায়খ (রহ.)-এর খুব ভক্ত ছিল। মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে গেল, আমার শায়খের মাজারে যাতায়াতের রাস্তায় আমাকে সমাহিত করো, যাতে শায়খের মাজারে আগত পথচারীদের পায়ের সংস্পর্শ আমি পাই এবং তাদের থেকে কিছু হাদিয়ার অংশীদার হই।

সুতরাং ভাই! আমি বলছিলাম, দুনিয়ার বাদশাহর খাদেম হয় সাধারণ মানুষ আর আল্লাহওয়ালাদের খাদেম হয় স্বয়ং বাদশাহ।

সৃষ্টিজীব তার অনুগত হয়ে যায়

আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে সৃষ্টিকুল তার অনুগত হয়ে যায়। সকলে তার সেবা করে, তার কোনো কাজ করার সুযোগ পেলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে।

আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস এ চারটি বস্তুর সমন্বয়ে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। হযরত ওমর (রাযি.)কে আল্লাহ এর প্রতিকৃতি বানিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে তাঁর ক্ষমতা চলত।

দেখুন, একদা মদীনার বাইরে একটি অগ্নিস্ফূলিঙ্গ দেখা গেল। সেটি মদিনার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। হযরত ওমর (রাযি.) হযরত তামীমদারি (রাযি.)কে বললেন, এর একটা বিহিত করো। হাদীছ শরীফে এসেছে, তিনি নিজের চাদরকে চাবুক বানিয়ে আগুনকে হাঁকাতে লাগলেন। যেভাবে মানুষ গাধাকে হাঁকায়, সেভাবে আগে-পিছে হয়ে হাঁকিয়ে আগুনকে তার উৎস স্থানে নিয়ে গেলেন। এরপর কোনো দিন সেই আগুন বের হয়নি।

পানির ওপর তার ক্ষমতা চলত। শীতকালে নীল দরিয়ার পানি আসছে না। মানুষ ও জীবজন্তু সবাই পানির জন্য হাহাকার করছে। হযরত ওমর (রাযি.) একটি চিঠি লিখে একজনকে দিয়ে পাঠালেন, যাও, নীলের মাঝখানে এটা রেখে দিয়ো। হযরত ওমর (রাযি.) তাতে লিখলেন, হে নীল নদ! তুমি যদি তোমার নিজ ক্ষমতায় প্রবাহিত হও, তাহলে আমার জন্য তোমার পানির কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় জারি হও এবং বন্ধ

হও, তাহলে আমীরুল মুমিনীন ওমর তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে, আল্লাহর হুকুমে তুমি প্রবাহিত হয়ে যাও।

নদীর মাঝখানে এই চিঠি রাখার সঙ্গে-সঙ্গে পানি প্রবাহিত হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত কোনো দিন তা বন্ধ হয়নি। আমি অধমের একবার নীল দরিয়া দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আমি তার প্রবাহ পরিদর্শন করেছি আর হযরত ওমর (রাযি.)-এর কথা স্মরণ করেছি যে, আগুন-পানি সব কিছুর ওপর তার ক্ষমতা চলত।

হাদীছ শরীফে এসেছে, হযরত ওমর (রাযি.) মদিনায় দাঁড়িয়ে আছেন। জমিনে ভূমিকম্প শুরু হলো। হযরত ওমর (রাযি.) পা দ্বারা জমিনে আঘাত করেল, হে জমিন! তুমি কাঁপছ কেন? ওমর কি তোমার বুকে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি? তাহলে কাঁপছ কেন? স্তব্ধ হও। সঙ্গে-সঙ্গে ভূমিকম্প শান্ত হয়ে গেল।

বাতাসে তার ক্ষমতা চলত। মদিনার মসজিদে খুতবা দিচ্ছেন। বহু দূরে মুসলমানদের একটি দল কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করছে। এমতাবস্থায় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শত্রুরা আক্রমণ করার ইচ্ছা করল। সেটা করতে পারলে মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত ছিল। সেই দলের সেনাপতি ছিলেন হযরত সারিয়া (রাযি.)। হযরত ওমর (রাযি.) খুতবার মধ্যেই বলে উঠলেন,

يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ

'হে সারিয়া! পাহাড়ের পেছনে তাকাও।'

মদিনা থেকে শত-শত মাইল দূরে মুসলিম সেনাপতির কানে সেই আওয়াজ পৌঁছে গেল।

বাতাসও তার আদেশ পালন করল।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) সেনাপতি। ইরান অভিযানে যাবেন। রাস্তায় নদী পড়ল। আল্লাহর নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাথিরাও নেমে গেলেন। ঘোড়াসহ তারা নিরাপদে নদী পার হয়ে গেলেন। ওপারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নদীতে কারো কোনো কিছু পড়েনি তো? এক সাহাবি বললেন, আমার পানপাত্র নদীতে পড়ে গেছে। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) নদীকে হুকুম দিলেন, আমার সাথির পানপাত্র ফিরিয়ে দাও। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিশাল ঢেউ এল। এর সঙ্গে ওই সাহাবির পানপাত্র ডাঙ্গায় চলে এল।

কবি বলেন–

لگاتا ہے تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا

حکم دیتا تھا دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا

নারায়ে তাকবীরের আওয়াজে দুর্গ চুরমার হয়ে যায়। আর আদেশ করলে নদী প্রশস্ত রাস্তা খুলে দেয়। যারা আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়, আল্লাহ তাকে হৃদয় জগতের বাদশাহ বানিয়ে দেন।

আজমীর শরীফে এক বৃটিশ পর্যটক এসেছিল। সে ওখানে গিয়ে বর্ণনা করল, জীবনে বহু শাসক দেখেছি। তারা জীবিত অবস্থায় শাসন করে। আর এই প্রথম দেখলাম, একলোক মৃত অবস্থায় জমিনের নিচে শুয়ে থেকে জীবিত মানুষের ওপর শাসন করছে।

স্বজন ও প্রিয়জনের ওপর রহমত

যারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত শুধু তাদের ও তাদের আওলাদের ওপর হয় না, বরং স্বজন-প্রিয়জন সবার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। হাদীছ শরীফে এসেছে–

هُمْ رِجَالٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

আল্লাহওয়ালাগণ এমন ব্যক্তিত্ব, যাদের সাথি-সঙ্গীরাও হতভাগা হয় না। মুহাদ্দিছীনে কেরাম এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হতভাগা তারা, যাদের ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু হয় না। এতে প্রতিভাত হয়, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অর্জনকারীগণের শেষ পরিণাম ভালো হয়, তাদের মৃত্যুকালে কালেমা নসিব হয়।

একদা এক খ্রিষ্টান, এক ইহুদি ও এক মুসলমান লোক কোথাও সফরে যাচ্ছে। সঙ্গে রাখা খাবার শেষ হওয়ার পর তারা পরামর্শ করল, ভাই! প্রত্যেকে এক-এক দিন করে প্রার্থনা করব। আল্লাহ আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রথম দিনই পড়ল মুসলমান ব্যক্তির পালা। সে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে দাও। ফলে একলোক কিছু ভাত-তরকারীসহ একটি পাত্র নিয়ে উপস্থিত হলো। পরের দিন খ্রিষ্টান লোকের পালা এল। সে দু'আ করল। একলোক দুটি হান্ডি নিয়ে উপস্থিত হলো। তা দেখে খ্রিষ্টান ব্যক্তি খুব খুশি হলো যেমন খুশি হয়েছিল আগের দিন মুসলমান ব্যক্তি।

আজ ওই মুসলমান অত্যন্ত অস্থির হলো। খ্রিষ্টান ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ভাই, তুমি অস্থির হচ্ছ কেন? সে বলল, ভাই! আমি অস্থির হচ্ছি এজন্য যে, ইসলাম হচ্ছে সত্য ধর্ম। গতকাল আমার দু'আর বরকতে একটি হান্ডি এলে আমি খুশি হয়েছিলাম যে, আল্লাহ আমার ও আমার ধর্মের সম্মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, তোমার দু'আয় দুটি হান্ডি এসেছে। সে বলল, ভাই! এতে অস্থিরতার কোনো কারণ নেই। বরং তোমার জন্য দুটি সুসংবাদ রয়েছে। প্রথম সুসংবাদ হলো, আমি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেছি। দ্বিতীয় সুসংবাদ হলো, আমি তোমার উসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে আবদার জানিয়েছি, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা সফরে এসেছে। খাওয়ার কিছুই নেই। তাই তার উসিলায় আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দাও। তাই আল্লাহ আজ আমাদের দুটি হান্ডির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মৃত্যুর সময় উত্তম আচরণ করা হবে

হাদীছ শরীফে এসেছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তার মৃত্যুকষ্ট হবে না। ঘি থেকে যেরকম একটি চুল উঠানো হয়, তেমনিভাবে আজরাইল (আ.) সতর্কতার সঙ্গে তার প্রাণ বের করবেন। জান্নাতের ফেরেশতারা সুগন্ধিযুক্ত জান্নাতের রুমাল এনে তার বুকের ওপর রাখেন। আরামের সাথে সুগন্ধির মাধ্যমে তার থেকে প্রাণ বের করা হয়। অতঃপর কবরে রাখা হলে আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, আমার বান্দা দুনিয়াতে খুব ক্লান্তি ভোগ করেছে। এবার তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করো।

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوْسِ

'হে আমার বান্দা! নতুন জীবনসঙ্গিনীকে নিয়ে বাসর রাতের সুখনিদ্রার মতো আজ ঘুমিয়ে পড়ো।'

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, নতুন বাসর ঘরে যেভাবে মানুষ সুখনিদ্রা যায়, তেমনিভাবে তারা কবরে ঘুমাবে। অতঃপর বাসরঘরে যেমন নিজের প্রিয়জন আলতভাবে স্পর্শ করে তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে, ঠিক তেমনিভাবে কাল কেয়ামতের ময়দানে তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তাকে মায়াবী সুরে ডেকে তাকে ঘুম থেকে জাগাবেন।

হাশর দিনের অভ্যর্থনা

আল্লাহ তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীগণকে হাশরের দিন নিজে এসে অভ্যর্থনা জানাবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের লাঞ্ছিত করবেন না।

আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

'আল্লাহ কেয়ামতের দিন নবীগণকে এবং তার সঙ্গে ঈমান আনয়নকারী মুমিনদেরকে লজ্জিত করবেন না।'[১]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, কয়েক বছর পর প্রবাসী স্বামীর আগমনের সংবাদ পেয়ে যেমন স্ত্রী ঘরবাড়ি, সন্তানাদি ও মালসামানা পরিপাটি করে; নিজেও সেজেগুজে অপেক্ষমাণ হৃদয়ে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানায়, তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য জান্নাত ইত্যাদি প্রস্তুত করে তাদের অভ্যর্থনা জানান। আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

'হে প্রশান্ত আত্মা! সন্তুষ্ট হয়ে তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করো আর আমার প্রিয় বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'[২]

বিনা হিসাবে জান্নাত দেবেন

কেয়ামতের দিন মানুষের হিসাব কীভাবে হবে? হাদীছ শরীফে এসেছে, মানুষ হিসাব দেবে আর এদিকে মুমিনগণ মেশকের টিলায় অবস্থান করবে। নেক বান্দাদের জন্য হাশরের দিনটি সত্তর হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে না। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, মুমিন বান্দাদের কেয়ামতের দিনটি ফজরের দু-রাকাত সুন্নাত নামায আদায়ের সময়ের পরিমাণ হবে। তিনি বলেন, নবীজির সবচেয়ে সংকীর্ণ নামায ছিল ফজরের দু-রাকাত সুন্নাত নামায। এই নামায তিনি অতি তাড়াতাড়ি পড়ে নিতেন। সুতরাং মুমিনগণ কেয়ামাতের দিনটিকে ওই দু-রাকাত সুন্নাত নামাযের সমপরিমাণ মনে করবে। এর মধ্যেও তাদের মাথায় নূরের টুপি থাকবে, মাথার ওপর আরশের

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ৮

২. সূরা ফাজ্‌র : আয়াত ২৭-৩০

ছায়া থাকবে। এতক্ষণে সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আল্লাহ মুমিন বান্দাদের বলবেন, যাও তোমরা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। আমি অধম সর্বদা আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করুন। একদা আমি নবীজির হাদীছ পাঠ করছিলাম। নবীজি বলেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে দেওয়া হবে। এ হাদীছ অর্ধেক পাঠ করার পর আমার অনুভূতি হলো, এ তো সাধারণ ব্যাপার। কোটি-কোটি উম্মতের মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাহলে আমরা কি সেই হিসাবের অন্তভুর্ক্ত হব? আমাদের মতো গোনাহগার তো সত্তর হাজারের ধারেকাছেও থাকতে পারবে না। আমরা যে দু'আ করি, তা কি কোনো হিসাবে পড়বে? এরপর হাদীছের বাকি অংশ পাঠ করে অন্তর খুশি হয়ে গেল। নবীজি বলেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর এদের প্রতিজন তাদের সঙ্গে আরো সত্তর হাজার করে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, এবার সত্তর হাজারকে সত্তর হাজারের সঙ্গে গুণ দিলে কতজন হয় হিসাব করুন।

হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহ একজন হাফেযকে তার সঙ্গে কমপক্ষে আরো দশজন লোক সঙ্গে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত ছিল। আর একজন আলেমকে কমপক্ষে চারশ লোক সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দেবেন। আল্লাহু আকবার!

সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তাঁর অলিদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। সাথে-সাথে তাদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদেরও পার্মিশন দেবেন। আর সেই পার্মিশন বা অনুমতিপ্রাপ্তদের মধ্যে হাফেযগণ থাকবে। হাদীছ শরীফে এসেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ আলেমদের সম্বোধন করে বলবেন–

يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّيْ لَمْ أَضَعْ فِيْكُمْ عِلْمِيْ لِأُعَذِّبَكُمْ

হে আলেম সম্প্রদায়! আমি তোমাদের বুকে ইল্‌ম এজন্য দান করিনি যে, আজ তোমাদের শাস্তি দেব। যাও; আজ তোমরা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও। ওই সময় উপলব্ধি করতে পারবেন, আল্লাহর নিকট এই দীনের মূল্য কত।

বংশধরদের সঙ্গে বিশেষ নমনীয়তা

কেয়ামতের দিন আল্লাহর বন্ধুদের সন্তানদের কী অবস্থা হবে। পৃথিবীতে তো আল্লাহ তাদের জান, মাল, ইজ্জত সবকিছু হেফাযত করবেন। কেয়ামতের দিন কী করবেন? আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

'যারা ঈমানদার এবং ঈমানের সঙ্গে তাদের সন্তানরা তাদের অনুসরণ করে, আমি তাদের সন্তানকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্র হ্রাস করব না।'[১]

আল্লাহওয়ালাদের সন্তানরা যদি নেক কাজের চেষ্টা করে, পুণ্যবান হওয়ার জন্য সাধনা করে, তাহলে তারা তাদের পিতামাতাদের স্তরে পৌঁছতে না পারলেও আমি কেয়ামতের দিন তাদেরক তাদের পুণ্যবান পিতামাতাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেব, যাতে তারা তাদের পিতামাতাদের সঙ্গে পেয়ে খুশি থাকে। সুতরাং আল্লাহওয়ালাদের সন্তানের ওপর আল্লাহর রহমত হয়। তাদের সঙ্গে সম্পর্ককারীদের ওপর আল্লাহর রহমত হয়। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ সাধারণ মানুষের ওপর খুশি হলে তাদের জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। আর যখন কোনো আলেমের ওপর খুশি হন, তখন তার জন্য জান্নাতে একটি শহর আবাদ করেন। আলেমদের জন্য শহর আবাদ করেন কেন? আপনারা হয়তো আঞ্চলিক একটি বাগ্‌ধারা শুনেছেন 'চেয়ার তো চেয়ারম্যানের জন্য'। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের জন্য স্টেজ সাজাবেন। তাদের সঙ্গে সম্পর্ককারীদের জন্য আল্লাহ স্টেজ তৈরি করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

'যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদের দলে-দলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[২]

সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ মুত্তাকীদের দলে-দলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। শুধু নেক বান্দারা একা নন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক

---

১. সূরা তূর : আয়াত ২১
২. সূরা যুমার : আয়াত ৭৩

স্থাপনকারীরাও তাদের দলভুক্ত হবে। আমাদের মাশায়েখদের সঙ্গে যদি আমরা সম্পর্ক রাখি, তাহলে আল্লাহর রীতি হচ্ছে, নবীজি বলেন–

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

'মানুষ তার সঙ্গে থাকবে, যাদের সঙ্গে তাদের মহব্বত থাকবে।'

এটি আল্লাহর বিধান। আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের মাশায়েখদের সঙ্গে থাকার তাওফীক দান করুন।

জান্নাতে আপ্যায়ন করা হবে

আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত স্থাপন করে আল্লাহর বন্ধু হতে পারলে আল্লাহ জান্নাতে আমাদের আপ্যায়ন করবেন। সাধারণভাবে তো সকল জান্নাতিকেই আপ্যায়ন করা হবে। কিন্তু আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। ঘরে মেহমান এলে তার সঙ্গে তিন প্রকারের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

১. জগ-গ্লাস ও ঠান্ডা পানি সামনে উপস্থিত করা হয়। যার প্রয়োজন আছে, সে নিজহাতে ঢেলে পান করে নেবে।

২. বিশেষ কোনো মেহমান এলে চাকরকে বলে দেয়, মেহমানের সেবা করো; তার যেন কোনো প্রকার কষ্ট না হয়।

৩. একেবারে ঘনিষ্ঠ বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তির আগমন হলে মেজবান নিজে এসে তার সব কিছুর ব্যবস্থা করে।

পরকালেও এ রকম ব্যবস্থা করা হবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

'প্রবাহিত ঝরনা, যা থেকে নৈকট্যশীল বান্দাগণ পান করবে।'[১]

অতএব, জান্নাতের এয়ারকুলার ঝরনা থেকে নৈকট্যশীল বান্দাগণ পান করবে। আর কতিপয় বান্দা এমন হবে যে, আল্লাহ বলেন–

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

'তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।'[২]

---

১. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ২৮
২. সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত ১৭, ১৮

জান্নাতের মধ্যে হুর-গেলমান থাকবে, সেবক থাকবে। কিশোর থাকবে, যারা সেবা করবে। তাদের হাতে জগ-গ্লাস থাকবে। তারা জান্নাতিদের পান করাবে। আল্লাহ বলেন, তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, আমার সঙ্গে যাদের একান্ত ভালোবাসা থাকবে।

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

'তাদের প্রভু তাদেরকে পবিত্র শরাব পান করাবেন।'[১]

তাদেরকে আল্লাহ নিজহাতে পান করাবেন।

বন্ধুর সন্তুষ্টি

সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং আল্লাহ জান্নাতিদেরকে তার সন্তুষ্টি দান করবেন। ঈমানদারগণ পৃথিবীতে বলত–

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا

আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট। পরকালে আল্লাহ জান্নাতিদের বলবেন, হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহর এ সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় নেয়ামত। কুরআন বলে–

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ

'আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে মহান।'[২]

দিদারে এলাহী

বন্ধুত্বের সর্ববৃহৎ পুরস্কার হলো জান্নাতে আল্লাহর দর্শন। আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

'মুমিন বান্দারা জান্নাতে যা চাবে তা-ই দেওয়া হবে। অতিরিক্তও দেওয়া হবে।'[৩]

অতিরিক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তা হলো আল্লাহ তাদেরকে তার দর্শন দেবেন। তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর এ দিদার জান্নাতের সকল নেয়ামত থেকে শ্রেষ্ঠ। এর দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। সময় হলে অন্য কোনো দিন আলোচনা করব।

---

১. সূরা দাহ্‌র : আয়াত ২১
২. সূরা তাওবা : আয়াত ৭২
৩. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩৫

সারাংশ

আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপন করলে দুনিয়া, কবর, হাশর ও জান্নাতে ওই সমস্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে। আর শয়তানি ভালোবাসার পরিণাম কী? দুনিয়াতে অস্থিরতা, আক্ষেপ, অভিযোগ আর পরকালে বরবাদি। দুনিয়ার শয়তানি ভালোবাসা সম্পর্কে কুরআন কী বলে শুনুন–

اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

'দুনিয়ার বন্ধুগণ পরস্পরে একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। একমাত্র মুত্তাকীরা ব্যতীত।'[১]

সুতরাং নফসানি ও শয়তানি ভালোবাসার পরিণাম হলো, তারা পরস্পরে শত্রু হয়ে যাবে। পরকালেও তারা বলবে–

يَا وَيْلَتٰى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'[২]

আফসোস করতে থাকবে, কেন তাকে বন্ধু বানিয়েছিলাম। সুতরাং দুনিয়ার বন্ধুত্ব আখেরাতের পরিতাপের কারণ। আরো শুনুন কুরআন কী বলে। যখন ফয়সালা হবে আর জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে যাবে, তখন শয়তান বলবে–

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ

'যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন আর আমি তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা দিয়েছিলাম; অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের ওপর তো আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদের ডেকেছি অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব, তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না; বরং নিজেদেরই ভর্ৎসনা করো।'[৩]

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৬৭
২. সূরা ফুরকান : আয়াত ২৮
৩. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ২২

তখন আক্ষেপ করবে, কেন শয়তানের অনুসরণ করেছিলাম, কেন নিজের নফসের ভালোবাসায় মত্ত ছিলাম এবং আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়ে জীবন যাপন করেছিলাম। সুতরাং এতেই প্রতিভাত হয় বন্ধুত্ব করার যোগ্য পাত্র কে? একমাত্র আল্লাহ। অতএব আসুন, আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপন করুন। মাওলানা রুমী (রহ.) খুব সুন্দর একটি কবিতা রচনা করেছেন–

عشق بامردہ نباشد پائدار * عشق را با حی و با قیوم دار

মৃতের সঙ্গে ভালোবাসা সুদৃঢ় হয় না। চিরঞ্জীব আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপন করো। নবীজি ইরশাদ করেন–

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا

আমি যদি দুনিয়াতে কাউকে বন্ধু বানাতাম, তাহলে অবশ্যই আবুবকরকে বানাতাম। কিন্তু আমি দুনিয়াতেও আল্লাহকে বন্ধু বানিয়েছি। অতএব, বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহর সঙ্গে। মাখলুখের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হবে আল্লাহর জন্য। সুতরাং ভাই! দুনিয়ার মধ্যে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে তা-ও আল্লাহর জন্য করো। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী করো। তাহলে সেটি আমাদের ইবাদতে গণ্য হবে। বন্ধুত্ব মানুষের সঙ্গে থাকলে হৃদয় আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে।

আল্লাহ বন্ধুত্ব পূর্ণ করেন

আমরা আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে আল্লাহ বন্ধুত্বের হক আদায় করবেন।

একটি ঘটনা শুনুন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকও যাচ্ছেন। রাস্তায় কাদা ছিল। মুরব্বীর জুতার ছিটা মহিলার কাপড়ে লেগে যায়। এতে ভদ্র লোক রাগান্বিত হয়ে মুরব্বীকে থাপ্পড় মারে– অন্ধ কোথাকার! দেখছিস না পাশে লোক যাচ্ছে! জুতা সামলিয়ে হাঁটতে পারিস না! মুরব্বী কোনো জবাব দিল না।

কিছু দূর যাওয়ার পর একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হচ্ছে। সেখানে ওই ভদ্রলোকের পা পিছলে পড়ে গেলে মাথা ফেটে মারা যায়। মহিলা অভিযোগ করল, এই মুরব্বী আমার স্বামীর জন্য বদদোয়া করেছে; তাই আমার স্বামী মারা গেছে। লোকজনও বলল, ঠিকই আছে। তুমি বদদোয়া করলে কেন? এবার এর খেসারাত দিতে হবে। মুরব্বী বলল, ভাই! আমি ওর জন্য বদদোয়া করিনি। আমার জুতার কাদা তার স্ত্রীর কাপড়ে লেগেছে। সে

তার স্ত্রীকে অধিক ভালোবাসে। তাই এটা সে সহ্য করতে পারেনি। সঙ্গে-সঙ্গে তার স্ত্রীর কষ্টদাতাকে শাস্তি দিয়েছে। তেমনিভাবে আমাকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি আমাকে অহেতুক শাস্তি দেওয়াটা সহ্য করতে পারেননি, তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে এ্যাকশন নিয়েছেন। তাকে শাস্তি দিয়েছেন। আমার কিছু করার নেই।

সুতরাং ভাই! আল্লাহ তাঁর ভালোবাসার হক আদায় করেন। তাযকেরাতুল আউলিয়ায় আছে, হযরত রাবেয়া বসরি (রহ.) নিজকক্ষে শুয়ে আছেন। এক চোর এল। একটি চাদর সামনে পেয়ে তা নিয়ে যেতে ইচ্ছা করল। চাদর হাতে ধারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে সে আর কিছু দেখতে পেল না। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, ব্যাপার কী? কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? চাদরটা ফেলে দিল। এবার দরজা দেখে বের হলো। বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শুনছে, একটি অদৃশ্য আওয়াজ তাকে সম্বোধন করে বলছে, হে চোর! এক বন্ধু ঘুমিয়ে আছে; আরেক বন্ধু তো ঘুমায়নি। এখানে একটা চড়ুইপাখি তার পাখা নাড়া দেওয়ার সুযোগ নেই। তুমি চুরি করবে কীভাবে?

সুতরাং ভাই! এক বন্ধু ঘুমিয়ে আছেন; আরেক বন্ধু সজাগ থেকে তাঁর বন্ধুত্বের হক আদায় করছেন। অতএব ভাই! আমরা আজ অঙ্গীকার করব। আমরা একটি নতুন জীবনের সূচনা করব। হে আল্লাহ! আজ আমরা নতুন ঈমানে কুরআনি জীবন গড়ার জন্য সংকল্প করলাম, হে আল্লাহ! আজ পর্যন্ত আমরা উদাসীন জীবনে মত্ত ছিলাম। দুয়ারে দুয়ারে হোঁচট খাচ্ছিলাম। হে আল্লাহ! অবশেষে আপনার দুয়ারের সন্ধান পেলাম। সুতরাং আমরা আপনার দরবারে এসে গেছি। হে আল্লাহ! এখন আর অন্যদিকে তাড়িয়ে দিয়ো না। বারবার ধাক্কা হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের টুটাফাটা ভালোবাসা কবুল করুন। ভাই! যখন আল্লাহর ভালোবাসার রাস্তায় কদম বাড়াবেন, তখন আল্লাহর রহমত দৌড়ে এসে আপনাকে-আমাকে স্বাগতম জানাবে।

প্রশিক্ষণের মজলিসের অর্জন

আপনারা প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ এই গরম মৌসুমে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসে সাধনা করছেন। আপনাদের বরকতে আল্লাহ আবহাওয়াকে অনুকূল করে দিয়েছেন। আজ মাহফিলের শেষ দিন। এই মাহফিল থেকে কিছু ফলাফল গ্রহণ করা চাই। ফলাফল হলো, হে আল্লাহ! আজ আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। আমাদের গোনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার ঘর থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে

বের করে দেবেন না। হে আল্লাহ! দুয়ারে-দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে শরীরে ক্লান্তি এসে গেছে। অস্থিরতার হোঁচট খেয়ে দুর্বল হয়ে গেছি। হে আমাদের মালিক! কার সামনে বুকের ব্যথা প্রকাশ করব? আমার বুকের গোপন রহস্য আপনি জানেন। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনার রহমতের দৃষ্টি দিন। আমাদের আজকের সংকল্প গ্রহণ করুন। আমাদেরকে আপনার বন্ধুদের তালিকাভুক্ত করুন। ভাই! আমাদের বুযুর্গগণ এই চিন্তায় জীবন কাটিয়েছেন। আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর সঙ্গে মিলে যান। কিন্তু কী করব? যে অন্তরের দিকে তাকাবেন, তা-ই দেখবেন দুনিয়ার মধ্যে ডুবে আছে। মাখলুকের বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে।

আমার ওস্তাদ বলতেন–

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا

بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا

যাকে আমি অবস্থাবান অন্তর বলি, কেউ এমন নয়। ভূতের বান্দা পাওয়া যায়; কিন্তু আল্লাহর বান্দা পাওয়া যায় না।

বর্তমানে আল্লাহর বান্দাদের সন্ধান করা কঠিন। আফসোস! যদি আজ আমরা গোনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে এই অঙ্গীকার করতে পারতাম, হে আল্লাহ! আমরা গোনাহ থেকে তাওবা করছি। ভবিষ্যতে পুণ্যময় জীবন গড়ার ইচ্ছা করছি। হে আল্লাহ! আপনাকে ভালোবাসার সংকল্প করছি। আপনার ভালোবাসায় আমাদের হৃদয় ভরে দাও। যারা আপনাকে ভালোবাসেন, আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

ফেতনা থেকে বাঁচব কীভাবে

'সূরা কাহ্‌ফ আমাদের কী শিক্ষা দেয়? সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করলে তাতে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা জানা যায়। কতিপয় যুবক ছিল। আল্লাহ বলেন–

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'কতিপয় যুবক তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনয়ন করল। আমি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিলাম।'

তারা নিজের ঈমান রক্ষা করা ও অত্যাচারী শাসকের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে গেল। আল্লাহ তাদের একটি গুহায় আশ্রয় দিলেন। তারা শুয়ে গেল। সে গুহায় প্রবেশ করে তাদের ঈমান রক্ষা করে। তারা যখন জাগ্রত হলো, তখন ওই বাদশাহও চলে গেল। তার অত্যাচারও নির্মূল হয়ে গেল। সুতরাং সূরা কাহ্‌ফ আমাদের শিক্ষা দেয়, যেভাবে ওই যুবকরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়ে তাদের ঈমান রক্ষা করেছিল, সেভাবে আমরা বর্তমানে গুহায় আশ্রয় নিয়ে আমাদের ঈমান রক্ষা করতে হবে।'

ফেতনা থেকে বাঁচব কীভাবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

ইসলাম সর্বশেষ ধর্ম

বিদায় হজের সময় নবীজি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হলে কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হয়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর সকল নেয়ামত পূর্ণ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয়, আমাদের ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম। আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। আমরা সর্বশেষ উম্মত। কতিপয় ইহুদি এ আয়াত শুনে মন্তব্য করেছিল, আমাদের ওপর এ আয়াত নাযিল হলে আমরা আনন্দে নেচে উঠতাম। কারণ, এতে দীন পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা, আমরা সর্বদা নবীদের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করতাম।

দীন হেফাযত করা ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

আগেকার যুগে উল্লেখযোগ্য কোনো নবীর আগমন হলে তাঁর পরিচয় ও তাঁর দাওয়াতের বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য তাঁদের সহযোগী নবী আগমন করতেন। আমাদের নবীজির ওপর সেই ক্রমধারা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন দীনের কাজের দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামের ওপর।

পবিত্র কুরআন বলে–

وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

'আল্লাহওয়ালা ও ওলামায়ে কেরামকে দীনের রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তারা এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এটা তাদের অপরিহার্য দায়িত্ব যে, তারা দীনের সংরক্ষক।'[১]

তারা কুরআনের প্রতিটি আয়াতে দৃষ্টিপাত করবেন এবং তার সারাংশ ও বিধান জাতিকে শিক্ষা দেবেন। এটি তাদের দায়িত্ব।

দীনের শাখা ৪টি

নবীজি দীন প্রচার করেছেন আর এ উম্মত তা হেফাযত করেছেন। পবিত্র কুরআন নবীজির আগমনের ৪টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে।

আল্লাহ বলেন–

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

'তিনি তাদেরকে কুরআনের আয়াত শিক্ষা দেবেন। তাদের আত্মশুদ্ধি করবেন, কিতাবের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন।'[২]

সুতরাং এ সকল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে চার স্তরে দীনের কাজ করা হয়।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ

তাদেরকে কুরআন পাঠ করানো।

এটি দাওয়াতের কাজ।

وَيُزَكِّيْهِمْ

আত্মশুদ্ধি করবেন।

এটি যিকির ও বর্তমান যুগের খানকার কাজ।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

কিতাবের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন।

এটা বর্তমান যুগের মাদরাসার কাজ।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪

وَالْحِكْمَةَ

তাদেরকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন।

এটি হচ্ছে যারা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ হলো দীনের কাজের চার স্তর।

খোলাফারে রাশেদীনের আমলে দীনের প্রচার-প্রসার

সুতরাং এ উম্মত সর্বপ্রথম যে শক্তি অর্জন করেছে, তা হচ্ছে,

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

দাওয়াতের কাজ।

এ মেহনতের বদৌলতে আল্লাহ এই উম্মতকে চারটি খেলাফত দান করেছেন, যাকে আমরা খোলাফায়ে রাশেদীন বলে থাকি। তাদের যুগে দীনের খুব প্রচার হয়েছে। যেমন– হযরত আবুবকর (রাযি.) কুরআন একত্রিত করেছেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল। তখন ইসলামি রাজ্যের আয়তন ছিল ২২ লাখ বর্গমাইল। হযরত ওছমান (রাযি.)-এর শাসনামলে ইসলামি রাজ্যের আয়াতন হয় ৪৪ লাখ বর্গ মাইল। সুবহানাল্লাহ! হযরত ওছমান (রাযি.) হলেন কুরআনের প্রকাশক। তিনি কুরআনকে কপি আকারে বের করে সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন।

মুহাদ্দিছীন ও ফুকাহায়ে কেরামের যুগ

অতঃপর তাবেয়ীনদের যুগ শুরু হলো। আল্লাহ সেসব ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে দীনের প্রচার ও খেদমত নিয়েছেন। কেননা, এ দায়িত্বই হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের ওপর। এটাই তাঁদের কাজ। ওলামায়ে কেরামদের একটি জামাত হচ্ছেন মুহাদ্দিছীনে কেরাম, যারা নবীজির বাণী, কাজ, অবস্থা ও আদর্শ এক জায়গায় একত্রিত করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে তাঁরা অনেক পরিশ্রম করেছেন। দেশ হতে দেশান্তরে সফর করেছেন। কীভাবে হাদীছ বর্ণনাকারীদের পরিচয় অর্জন করেছেন সেটা ভিন্ন বিষয়বস্তু। তারপর ফুকাহায়ে কেরামের জামাত। যারা কুরআন-হাদীছ থেকে মাসায়েল সংগ্রহ করে দীনকে অলংকারপূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাঁদের দ্বারা দীনের বিশেষ খেদমত নিয়েছেন। অতএব, প্রত্যেক ফুকাহায়ে কেরাম দীনকে

নিবন্ধিত করার জন্য অনেক মেহনত করেছেন। এর ফলে আল্লাহ ফেকাহ্-এর চারটি মাযহাব দান করেছেন।

(১) হানাফী
(২) শাফেয়ী
(২) হাম্বলী
(৩) মালেকী

ফেকাহ-এর এ চারটি মাযহাব প্রসিদ্ধ। এটি ফুকাহায়ে কেরামের মেহনতের ফসল। এ রকম হাজার-হাজার ফকীহ ছিলেন। তবে তাদের মধ্যে যাদের অনুসরণ করা হতো, তাদের সংখ্যা প্রায় সতেরোজন। এদের মধ্যে চারজন এমন ছিলেন, যাদের আল্লাহ কবুল করে তাঁদের প্রসিদ্ধি বিস্তার করে দিয়েছেন। তাঁদের কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর উদাহরণ হলো, যেমন– এক বাপের ১৬ জন সন্তান ছিল। তাদের কেউ কেউ দু-বছর, চার বছর পর মারা গেছে। অবশেষে মাত্র চারজন বেঁচে আছে। সুতরাং তাঁর ওয়ারিশ হয়েছে মাত্র চারজন। এমনিভাবে দীনের অনেক ফকীহ ছিলেন। কিন্তু অবশেষে মাত্র চারজন বাকি আছেন। এদের মধ্যেই মাসায়েলসমূহ বণ্টিত হয়েছে। তাদের মাধ্যমে দীনের প্রচার হয়েছে। এমনকি বড়-বড় মুহাদ্দিছীনে কেরামও তাদের অনুসরণ করেছেন। হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.), যাকে ইমামুল আযম বা বড় ইমাম বলা হয়। কেননা, সকল মুহাদ্দিছ ও ফকীহ কোনো-না-কোনোভাবে তাঁর শাগরেদ হয়েছেন। হয়তো সরাসরি ছাত্র হয়েছেন, না হয় তাঁর ছাত্রের মাধ্যেমে ছাত্র হয়েছেন।

সূফী-সাধকদের যুগ

ফুকাহায়ে কেরামের যুগের পর সূফী-সাধকদের এর যুগ এল। আল্লাহ তাঁদের মাধ্যমে দীনের অনেক খেদমত নিয়েছেন। তারা মানুষের আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রচুর মেহনত করেছেন। আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করে দিয়েছেন। দুনিয়া থেকে বিমুখ করে আখেরাতমুখী করেছেন। এমনকি রাজ্যের মধ্যে তাঁদের দ্বারা দীন প্রচার করেছেন। সুতরাং বলা যায়, আমাদের এ অঞ্চলে সূফী-সাধকদের মাধ্যমে দীন এসেছে। অতঃপর ওলামায়ে কেরাম সেটি সংগ্রহ করেছেন। হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহ.) বাঙলা মুলুকে এক সফর করেছিলেন, যার ফলে সাত লাখ হিন্দু মুসলমান হয়েছিল এবং সত্তর লাখ মুসলমান তাওবা করে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হয়েছিল। আল্লাহ

তাঁদের দ্বারা এভাবেই ইসলামের বিস্তার করেছিলেন। একজন মনীষী একজন লোকের হেদায়াতের মাধ্যম হয়েছিলেন। অতঃপর এদের মাধ্যমেই এ উম্মতের মধ্যে তরীকতের এ চার তরিকা জারি হয়। যথা (১) চিশতিয়া (২) কাদিরিয়া (৩) সোহরাওয়ারদিয়া (৪) নকশবন্দিয়া।

যখন দীন পরিপূর্ণ হলো, মুহাদ্দিছীনে কেরাম হাদীছসমূহকে তাঁদের সিনায় ও কিতাবে সংরক্ষণ করেছেন, ফুকাহায়ে কেরাম মৌলিক ও শাখাগত সকল মাসায়েলকে একত্রিত করে কিতাবে হেফাযত করেছেন। সূফী-সাধকগণ অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য মেহমত করেছেন। মানুষের হৃদয়ে এখলাছ কীভাবে আসে, তা শিক্ষা দিয়েছেন। তখন দীন আরো অলংকৃত হয়েছে।

যুগের বাদশাহগণ মাশায়েখগণের দরজায়

শত-শত বছর এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, উম্মত এই দীনের ওপর আমল করেছে। এমনকি সমকালীন বাদশাহগণ পর্যন্ত মাশায়েখগণের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের নিকট থেকে দু'আ নিয়েছেন।

হযরত আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)-এর সঙ্গে মাহমুদ গজনবি (রহ.)-এর মহব্বত

হযরত সুলতান মাহমুদ গজনবি (রহ.) হযরত খাজা আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)-এর দরবারে আসা যাওয়া করতেন। তাঁর অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। এমনকি কিতাবে তাঁর ক্ষমা পাওয়ার একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

তিনি যখন হযরত খাজা আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)-এর খানকায় আগমন করলেন, তখন সেখানকার খোদাপ্রেমিক খাদেমরা ঝাড় দিচ্ছিল। এতে ধুলাবালি উড়ছিল। তিনি সেই ধুলাবালি নিজের চেহারায় মেখেছিলেন যে, এগুলো আল্লাহওয়ালাদের পায়ের ধুলা। এখানে আল্লাহ-আল্লাহ উচ্চারিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর একব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, মাহমুদ তোমার অবস্থা কী? তিনি বললেন, আমি যে হযরত আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)-এর খানকার ধুলাবালি মুখে মেখেছিলাম, তা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হলে আল্লাহ বললেন, এই চেহারাকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা দগ্ধ করা যাবে না।

আর হযরত আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতার চিত্র দেখুন। তিনি বসে আছেন। মাথার চুলগুলো খুব লম্বা ছিল। বর্তমান যুগের মতো তখন তো স্যাম্পু-সাবান ছিল না। মাথায় উকুন হয়ে গেল। খুশকি পড়ল। যার ফলে মাথায় কিছু খুঁজলিও হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে না তা খুশকির কারণে হয়েছে, নাকি উকুনের কারণে হয়েছে। এক শাগরেদকে বললেন, ভাই! আজ শুক্রবার দিন। আমি গোসল করব আর আমার মাথায় দেখ তো এত চুলকাচ্ছে কেন? শাগরেদ মাথা আঁচড়াতে লাগল। তিনি নিচের দিকে মাথা রেখে বসে আছেন। এতক্ষণে সুলতান মাহমুদ গজনবি তাঁর খানকায় উপস্থিত হলেন। শাগরেদ বলল, হুজুর! বাদশাহ আসছেন। বারবার বলছে; কিন্তু তাঁর কোনো খবর নেই। শেষ পর্যন্ত মাথাটা একটু নাড়া দিয়ে তাঁকে সচেতন করল। তিনি বললেন, ওহ কী হয়েছে? সে বলল, বাদশাহ এসেছেন। বললেন, হো এই কথা! আমি তো ভাবছি, মনে হয় কোনো বড় একটা উঁকুন ধরেছ; তাই এমন করছ।

দেখুন, তারা দুনিয়া থেকে কী পরিমাণ বিমুখ ছিলেন। সুলতান মাহমুদ গজনবি সামনে গেলেন। কথাবার্তা বললেন। তিনি একটা থলে বের করে দিলেন– হুজুর! এতে আপনার জন্য কিছু হাদিয়া রয়েছে। তিনি সেটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বারবার বলার পর বললেন, ঠিক আছে; তাহলে তুমি এই রুটিটা খাও। একটা পরিত্যক্ত শুকনা রুটি সামনে দেওয়া হলো।

এবার কী হলো? যুগের বাদশাহ, শাহী মহলে লালিত, নরম ও তাজা খাবার খাওয়ায় অভ্যস্ত। এখন এই শুকনা রুটি কী করে খাওয়া যায়। অবশেষে খেতে শুরু করলেন। শুকনা শক্ত রুটির টুকরা বাদশাহর গলায় আটকা পড়ে গেল। কোনোক্রমেই ভেতরে যাচ্ছে না। অপারগ হয়ে বাদশাহ বললেন, হুজুর ভেতরে তো যাচ্ছে না; খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন, এই রুটি যেভাবে তোমার গলায় আটকা পড়ে গেছে, এভাবে তোমার হাদিয়াও আমার গলায় আটকে যাবে। সুতরাং আমি এটা গ্রহণ করতে পারব না।

সুলতান মাহমুদ গজনবি বুঝে গেলেন, তিনি দুনিয়াবিমুখ। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন না। পরিশেষে বললেন, হুজুর! আমি আপনার দু'আ নেওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি। সোমনাথে অভিযান চালাতে হবে। এ পর্যন্ত কয়েকবার সেখানে আক্রমণ করেছি; কিন্তু সকল কাফের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যায়। এবার ইচ্ছা করেছি, আমার অভিযানের সঙ্গে আল্লাহওয়ালাদের দু'আকে সঙ্গী বানাব। সুতরাং আপনি দু'আ করুন।

তিনি দু'আ করলেন এবং একটি জুব্বা হাদিয়া দিলেন, যাও; এই জুব্বাটা পরিধান করে অভিযান চালাও। তারপরও যদি বিজয় কঠিন হয়, তাহলে দু-রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! যদি আপনার দরবারে এই জুব্বার মালিকের সামান্যও গ্রহণযোগ্যতা থাকে, তাহলে তাঁর উসিলায় আমাদের বিজয় দান করো।

সুলতান মাহমুদ গজনবি চলে গেলেন। সেনা বাহিনী নিয়ে সোমনাথ আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ করতে-করতে এমন একটা সময় এল যে, এবারও মুসলমানরা পরাজিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুলতান সামনে আছেন। পেছনে যুদ্ধ চলছে। মুসলমানরা পলায়ন করতে শুরু করেছে। তাদের পা পিছলে গেছে। কারণ, কাফেররা জান বাজি দিয়ে আক্রমণ করছে। কেননা, এটা তাদের কুফরি রাজ্যের ঘাঁটি। সুলতান তাঁর বাহন থেকে নেমে দু-রাকাত নামায আদায় করলেন। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহর সাহায্য এসে গেল। মুসলমানরা পুনরায় আক্রমণ চালাল। পরিশেষে আল্লাহ সোমনাথ দুর্গের বিজয় দান করলেন।

সোমনাথ দুর্গ বিজয়ের পর মুসলমানরা খুব খুশি হলো। এবার শির্ক দূরীভূত হবে। কাফেরদের আড্ডা শেষ হলো। বিজয়ের পর কাফেররা প্রস্তাব দিল, আপনারা আমাদের মূর্তিগুলো চুরমার করবেন না। এগুলো আমাদের ফেরত দিয়ে দিন। আমরা এগুলোর ওজনে আপনাদেরকে সোনা দান করব।

মাহমুদ গজনবি জবাব দিলেন, সোনার বিনিময়ে এগুলো হস্তান্তর করলে পৃথিবীর মানুষ আমাকে মূর্তিপূজারি বলবে। মূর্তি বিনাশকারী বলবে না। সুতরাং আমি মূর্তি বিক্রি করতে চাই না। আমি মূর্তি ভাঙতে চাই। তারা সেগুলো একটা-একটা করে ভাঙতে লাগল। তখন এগুলোর ভেতর থেকে হিরে ও মনি-মুক্তা বের হতে লাগল, যার মূল্য এগুলোর সমপরিমাণ ওজনের সোনা থেকে তিন গুণ বেশি হলো।

দেখুন, আল্লাহ কেমন বিজয় দান করেছেন। অতঃপর তিনি ভাবলেন, এবার আমার শায়েখকে বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা দরকার। তিনি হযরত খাজা আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)-এর খানকায় গিয়ে বিজয়ের সুসংবাদ জানালেন। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সুলতান! বলো তো তুমি ওই সময় কী দু'আ করেছিলে? তিনি বললেন, হুজুর! আমি দু'আ করেছিল, হে আল্লাহ! আমাকে সোমনাথ-বিজয়ী বানিয়ে দাও। তিনি বললেন, তুমি ভুল করে ফেললে সুলতান! যদি তুমি ওই সময় এ দু'আ

করতে, হে আল্লাহ! আমাকে বিশ্বজয়ী বানিয়ে দাও, তাহলে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্ব তোমার হাতে বিজিত হতো।

কোনো কবি বলেন-

مگر مہماں فقیروں کے ہوئے ہیں بادشاہ اکثر

'মেহমান হয় কফিরের আর বাদশাহ তার প্রাচুর্যেই মত্ত থাকে।'

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুমিশ ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকি (রহ.)

এই কিছুদিন পূর্বের ঘটনা শুনুন। খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকি নামে এক বিখ্যাত মনীষী ছিলেন। বাদশাহ মোঘল সম্রাট ইলতুমিশ তাঁর প্রতি দুর্বল ছিলেন। তাঁকে ভালোবাসতেন, তাঁর প্রতি সুধারণা ছিল, তাঁর নিকট বাইয়াত হয়েছিলেন। যেখানে দেশের বাদশাহ কারো নিকট বাইয়াত হলো, সেখানে সাধারণ মানুষের কথা তো বলার প্রয়োজন মনে করি না। সুতরাং তিনি সর্বজনস্বীকৃত অলি ছিলেন। আল্লাহর শান দেখুন। তাঁর ইন্তেকাল হলো। জানাযায় লাখো মানুষ উপস্থিত হলো। কিছু জানাযা আছে, যার দ্বারা মৃত ব্যক্তি ফায়দা পায়। যেমন– হাদীছ শরীফে এসেছে, যার জানাযায় চল্লিশজন ঈমানদার লোক শরীক হয়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আর কিছু জানাযা আছে, যেখানে উপস্থিত হলে উপস্থিত জনতার ফায়দা হয়। হযরতের জানাযা এই প্রকারের ছিল। জানাযায় লাশ উপস্থিত করা হলো। জানাযা কে পড়াবে সেটা নিয়ে বলাবলি চলছে। এতক্ষণে শায়খের ওয়ারিশদের থেকে একজন সামনে এসে বলল, শায়খ মৃত্যুর সময় একটি অসিয়তনামা লিখে দিয়ে গেছেন। আমি তা পাঠ করে আপনাদের শোনাচ্ছি, যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত চারটি গুণ পাওয়া যাবে, সে আমার জানাযা পড়াবে।

প্রথম গুণ : যার জীবনে ফরজ নামাযের তাকবীরে উলা ছোটেনি। দেখুন, এই শর্তের পাল্লায় আমাদের উত্তোলন করা হলে আমাদের কী অবস্থা হবে। কী পীর আর কী শাগরেদ কারো পক্ষে বর্তমানে এই শর্ত পাওয়া দুষ্কর। মাঝে-মাঝে তো এমনও হয় যে, আযান শুনে মসজিদে যাচ্ছি; কিন্তু যেতে-যেতেই ইমাম এক রাকাত শেষ করে ফেলেন।

দ্বিতীয় গুণ : যার জীবনে তাহাজ্জুদের নামায বাদ পড়েনি। এ পাল্লায় আমাদের মাপা হলে আশা করি ফাস্ট ডিভিশনে ফেল করা কঠিন হবে না। কখনো অসুস্থতা, কখনো সফর, কখনো ঠান্ডা নানাবিধ বাধা তো আছেই।

তৃতীয় গুণ : যার জীবনে আসরের নামাযের চার রাকাত সুন্নত বাদ পড়েনি। এখানেও আমরা প্রথম শ্রেণির ফেল।

চতুর্থ গুণ : যে জীবনে কোনো দিন গায়রে মাহরামের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকায়নি। এবার কোন বীরপুরুষ আছেন যে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, আমার জীবনে এমন কাজ হয়নি। এখানেও আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ফেল। কারো জীবনে এরকম একটি শর্তও পাওয়া খুবই কঠিন। সুতরাং ঘোষণা হলো, যার জীবনে এই চারটি শর্ত একত্রে পাওয়া যাবে, তিনি আজকের জানাযার নামায পড়াবেন।

ঘোষণা শুনে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কে আছেন, যিনি আজকের এই জানাযার নামায পড়াবেন? তখন বিভিন্নজন বিভিন্ন প্রকার কথা বলতে থাকল। তিনি যে-শর্তগুলো দিয়েছেন, হয়তো আজ বিনা জানাযায়ই যেতে হবে।

কিন্তু ভাই! তিনি তো আল্লাহর অলি ছিলেন। তিনি জানতেন, আমার জানাযায় এমন লোক উপস্থিত হবে। কিছুক্ষণ পর এক লোক কেঁদে-কেঁদে সামনে অগ্রসর হলেন এবং লাশের মুখ থেকে কাপনের কাপড় সরিয়ে চেহারাটা দেখে তাকে সম্বোধন করে বললেন, হুজুর! আপনি চলে গেলেন; কিন্তু আমাকে লজ্জিত করে গেলেন। আমি আপনার কাছে কী অপরাধ করেছিলাম, যার দরুন আপনি আজ এ লাখো জনতার সামনে আমার গোপন রহস্য প্রকাশ করে গেলেন! তিনি বললেন, ভাইয়েরা! কাতার সোজা করুন। আমি আল্লাহকে হাজির-নাজির মেনে বলছি, আমার মধ্যে এ শর্তগুলো বিদ্যমান আছে। তিনি জানাযা পড়ালেন। তিনি হলেন তৎকালের বাদশাহ সুলতান ইলতুমিশ শামমুদ্দীন (রহ.)।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগির ও খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রহ.)

আরো কাছের সংবাদ শুনুন। হযরত খাজা মাসুম (রহ.)। তাঁর মাধ্যমে বাদশাহ আওরঙ্গজেব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব নকশবন্দি তরিকার অনুসারী ছিলেন। তৎকালের বাদশাহ ছিলেন। শায়খের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এক টাকাও ভাতা নিতেন না। নিজহাতে কুরআন লিখে যে সামান্য উপার্জন হতো, তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শুকনা রুটি, কোনো সময় লবণও সংগ্রহ হতো না।

এমন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন, যা শায়খের সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছিল। তিনি ফতোয়ায়ে আলমগিরি সংকলন করালেন, যা আল্লাহর দরবারে একটি মোতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, গোটা বিশ্বের মুসলিম আজ তার মুখাপেক্ষী। তিনি এত মহৎ কাজের আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয়, যুগের বাদশাহগণ মাশায়েখদের দরবারে আগমন করতেন আর তাঁদের জীবনের পরিবর্তন সাধন করতেন। এভাবে শত-শত বছর উম্মতের মধ্যে দীনের কাজ অব্যাহত থাকে।

একটা অভ্যন্তরীণ ফেতনা আকবরি ধর্ম

শত-শত বছর পর একটা অভ্যন্তরীণ ফেতনা প্রকাশ পেল, যে আমাদের ধর্মে ওপর আঘাত হানল। সেটা কোন ফেতনা? সেটা হলো উদাসীন শাসক ও রাজদরবারের মোল্লার ফেতনা। তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল উদাসীন বাদশাহ আকবর। আর রাজদরবারের মোল্লা ছিল মোল্লা আবুল ফজল ও মোল্লা আল ফয়জি, যারা ফতোয়া দিয়েছিল, সম্মানসূচক সেজদা জাযেয়। সুতরাং এই দুজনের বলে ধর্মের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ফেতনা শুরু হয়। ফলে বাদশাহ আকবর ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করে দিয়েছিল। সে ধর্মের একটা ঐক্যের রূপ দিয়েছিল যে, সকল ধর্ম এক। ফলে রাজ্যে সূর্যপূজা শুরু হয়। হিন্দু ধর্মের সম্মানার্থে রাজ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধ করেছিল। যে-হিন্দুরা মুসলমান হয়েছে, তারা পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরে যেতে হবে। শূকর, মদ ও সুদকে হালাল ঘোষণা দিয়েছিল। অপকর্মের নিয়মকে বৈধ বলেছিল। এগুলো ছিল বাদশাহ আকবরের গর্হিত কৃতিত্ব। বিশ্বস্ত ও দীনের ধারক-বাহক ওলামায়ে কেরামের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল যে, তোমরা কোনো কথা বলতে পারবে না। তাদেরকে তলব করে বলপ্রয়োগে তাদের থেকে সম্মানসূচক সেজদা আদায় করত।

ফেতনার দ্বার বন্ধ হলো কীভাবে?

তখনকার সময় এক আল্লাহর অলি এমন ছিলেন, যিনি তা'জীমি সেজদা করেননি। তিনি হলেন আল্লামা মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)। বাদশাহ জাহাঙ্গির সম্রাট আকবরের স্থলাভিষিক্ত হলো। সে তার পূর্বপুরুষদের ধারা অব্যাহত রেখে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)কে বাদশাহ জাহাঙ্গিরের দরবারে উপস্থিত করে তা'জীমি সেজদার নির্দেশ দেওয়া হলো। তিনি তা অস্বীকার করলেন যে, বাদশাহ জাহাঙ্গিরের

সামনে আমার ঘাড় নত হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে শায়খ মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)কে গোয়ালিয়ার দুর্গে দু-বছর বন্দী রাখা হলো, অমানুষিক নির্যাতন করা হলো। হযরতের ধারা এমন প্রচার হয়েছিল, যে লাখো মানুষ তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। কারাগারে প্রেরণের পর শাগরেদগণের অদ্ভুদ অবস্থা হয়েছিল। শায়খের শোকে তারা পাগলপারা হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা এখন কী করব? এমনকি সেনাপতি মীর নোমান শায়খের নিকট চিঠি লিখলেন, হুজুর! আমাদের এমন অস্থির অবস্থায় আত্মহত্যা জায়েয হবে কি? তিনি জবাবে লিখলেন, মীর নোমান! শান্ত হও। জেলখানায় আমার ওপর যে নির্যাতন চলছে, তাতে আমার রূহানি শক্তি আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জেলখানার বাইরে সম্ভব হতো না। আরো লিখলেন, আল্লাহ প্রথমে তাঁর জামাল গুণের মাধ্যমে আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এখন তাঁর জালাল গুণের মাধ্যমে আমাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এভাবে তিনি জনগণকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, শোনো, বাদশাহর জন্য তার রাজ্য কল্যাণকর, মন্ত্রীর জন্য তার মন্ত্রিত্ব কল্যাণকর। আমি তোমাদের রাজ্য থেকে কিছু চাই না। আমি চাই তোমরা দীনদার হয়ে যাও, ধার্মিক হয়ে যাও।

পরিশেষে অবস্থা এমন হলো যে, শায়খ বাদশাহর সৈনিকদের সঙ্গে রাত্রিযাপনের সুযোগ পেয়ে গেলেন। সেটা কীভাবে হলো? বাদশাহ জাহাঙ্গির তার দুর্গে কয়েকটি প্রবেশপথ রেখেছিল। ফলে তার ভয় হলো যে, কী জানি তার শাগরেদরা রাতে কোনো প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে আমাদের সর্বনাশ করে দেয় কিনা। তাই সে বলল, শায়খ আমাদের সঙ্গে থাকবে। ফলে সৈনিকদের সঙ্গে তাঁর রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হলো। এবার শায়খ সৈনিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সঙ্গে রাত কাটান। সুযোগকে গনিমত মনে করে তাদের উপদেশ দেন। ফলে যখন তারা বাস্তবে দেখল, তিনি তো সঠিক পথে আছেন; প্রকৃত পক্ষে তো তিনি বিদ্রোহী নন। শায়খের কথায় তাদের হৃদয়ে ছাপ লাগল। তাদের হৃদয়জগৎ পরিবর্তন হতে শুরু করল। এটা ওই সফর ছিল, যখন বাদশাহ জাহাঙ্গির চিউটে আক্রমণ করছিল। সেই সফরে শায়খ তাদের সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে সৈনিকরা একত্রিত হয়ে বাদশাহকে বলল, জনাব, যদি আপনি বাদশাহি চান, তাহলে এ মহান ব্যক্তি যা বলেন, তা মেনে নিন। নতুবা আমরা আপনাকে ছুটি (অবসর) দিচ্ছি।

এবার ছুটির কথা শুনে বাদশাহ সোজা হয়ে গেল। বলল, ঠিক আছে; তিনি যা বলেন, তা আমি মেনে নেব। ফলে শায়খ এ রাজ্য থেকে শিরক-বেদাতের অপসারণ করলেন, আকবরি ধর্মের অবসান ঘটালেন। সঠিক ধর্ম

তাদের সামনে হাজির করলেন। এভাবে সেই অভ্যন্তরীণ ফেতনা আল্লাহ্ শায়খ মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)-এর মাধ্যমে চিরতরে বিদায় করলেন।

বহিরাগত ফেতনা ইংরেজদের আধিপত্য

এরপর মুসলিম জাতি তাদের ধর্মের ওপর চলতে থাকে। কয়েকশ বছর পর পুনরায় তাদের ওপর এক বহিরাগত ফেতনা আপতিত হয়। সেই ফেতনা ছিল, ইউরোপীয়রা এ-দেশ দখল করে নিল। কেননা, পাক-ভারত একটি সম্মিলিত রাজ্য ছিল। তার ওপর ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। সেই ইংরেজরা বহির্বিশ্ব থেকে বণিক সেজে এদেশে এসেছিল আর শাসক হয়ে বসে গেল। এই চাল, সেই চক্রান্ত; অবশেষে শাসকের আসনে সমাসীন হলো। এবার যখন তারা শাসক হয়ে গেল, তখন তারা এদেশের জনগণের শত্রু ছিল না। তারা তাদের ধর্মের শত্রু ছিল। তারা এদের ধর্মান্তর করতে প্রচেষ্টা চালাল।

ইংরেজদের প্রথম চাল

সেই বহিরাগত আগ্রাসনের প্রথম পদক্ষেপ হলো, এদেশে ধর্ম মাদরাসার কারণে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সুতরাং মাদরাসাগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া চাই। তৎকালে এদেশের মাদরাসাসমূহ সরকারি বরাদ্দের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। যেমন– কোনো বান্দা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে তাতে কমপক্ষে পাঁচ বিঘা জমি ওয়াক্ফ করে দেওয়া হতো। এগুলোর আয় ছাত্রদের লেখা-পড়ায় খরচ করা হবে। এভাবেই মাদরাসা চলত। হাজার-হাজার মাদরাসা এই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতো। ইংরেজরা সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নিল, মাদরাসা-মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত জমি সরকারি খাতে নিয়ে গেল। এতে তারা মাদরাসার গলা টিপে ধরল। হাজার-হাজার মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেল।

যখন মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেল, এবার সাধারণ মানুষকে দীন শিক্ষা দেবে কে? দীন কীভাবে সংরক্ষিত থাকবে? সাথে-সাথে তারা আরেকটি চক্রান্ত করল। তাদের পাদ্রিদের (ধর্মগুরু) জমায়েত করে গ্রামেগঞ্জে পাঠিয়ে দিল। তারা সারা দেশে তাদের ধর্মের দাওয়াত দিয়ে এ উম্মতের মধ্যে ফেতনার বিষ ছড়িয়ে দিল। অতএব, তাদের আগমনের ফলে কাদিয়ানি ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইসলাম ধ্বংসের জন্য তারা এই চক্রান্ত চালাল।

ওলামায়ে কেরামের আন্দোলন

পরিশেষে মাদরাসার ওলামায়ে কেরাম ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে একটি মাদরাসা ছিল মাদরাসায়ে রহীমিয়া, যা হযরত শাহ ওলীউল্লা মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত, যে মহা মনীষীর মাধ্যমে আল্লাহ এদেশে হাদীছের প্রচার-প্রসারের উল্লেখযোগ্য খেদমত নিয়েছেন। এজন্যই তাঁকে হাদীছ শাস্ত্রের সনদের সমন্বয় বলা হয়। এদেশে ছোট-বড় যত মুহাদ্দিছ রয়েছেন, সকলেই আপন-আপন সনদের মধ্যে এই মহা মনীষীর নাম উল্লেখ করেন। হাদীছ শাস্ত্রের সনদ তাঁর মাধ্যম হয়ে নবীজি পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর তাঁর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলভী সর্বপ্রথম ফতোয়া প্রদান করেন, ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষার জন্য বর্তমানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ। ইংরেজদের থেকে এদেশ স্বাধীন করার মূল ভিত্তিই হচ্ছে এই ফতোয়া। তার এই ফতোয়ার পর ইংরেজরা এমন ক্ষিপ্ত হলো যে, বুল্ডোজার দিয়ে রহীমিয়া মাদরাসার ভবন ধূলিসাৎ করে দিল। তার পর একে-একে ওলামায়ে কেরামের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চলতে থাকে।

ওলামায়ে দেওবন্দের ত্যাগ

আপনারা কোনোদিন দেওবন্দ মাদরাসার ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারবেন এই দীন রক্ষার জন্য ওলামায়ে দেওবন্দ কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমনও হয়েছে যে, দিল্লিতে ইংরেজরা জলন্ত অঙ্গার প্রস্তুত করে ওলামায়ে দেওবন্দকে গ্রেফতার করে ওই অঙ্গারের সামনে উপস্থিত করে বলেছে, আমাদের সঙ্গ দাও; নতুবা এই অঙ্গারে নিক্ষেপ করে শেষ করে দেব। তারা সেই অঙ্গারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন; তবু নিজের ঈমান বিক্রি করেননি। এমনও হয়েছে যে, ওলামায়ে কেরামকে সারিবদ্ধ করে তাদের সম্মুখে শত-শত সৈনিক বন্দুক দিয়ে প্রস্তুত রেখে বলেছে, আমাদের সহায়তা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দাও। তারা অস্বীকার করলে একসঙ্গে গুলি করে সবাইকে জমিনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজদের বর্বরতার এমন চিত্রও হয়েছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরামের নামের তালিকা করে তাদের গ্রেফতার করে বলেছে, আমাদের সাথি হও; নতুবা জীবনের আশা ছেড়ে দাও। তারা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন; তবু ঈমান ত্যাগ করেননি। অতঃপর তাদেরকে গাছের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। বলা হয়, দিল্লি থেকে শুরু

করে পেশোয়ার পর্যন্ত জি.টি রোডের পার্শ্বে এমন কোনো গাছ ছিল না, যার মধ্যে ওলামায়ে দেওবন্দের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। এ দীনের খাতিরে ওলামায়ে কেরাম এমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমি একবার কাশ্মির গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক পুরাতন একটি গাছ দেখলাম, যার বয়স প্রায় একশ বা সোয়াশ বছর হবে। তখন সেখানকার লোকজন আমাকে বলল, এই গাছে অমুক-অমুক ওলামায়ে কেরামকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। সে গাছই ছিল তৎকালের সর্বশেষ গাছ। লাহোর শাহী মসজিদের দরজার মধ্যে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। ওলামায়ে কেরামকে ধরে-ধরে এনে সেখানে ফাঁসি দেওয়া হতো, যতক্ষণ পর্যন্ত লাশ নড়াচড়া করত, ততক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ তা দেখত। অতঃপর লাশের নড়াচড়া বন্ধ হলে আরেকজনের পালা আসত। এভাবে চব্বিশ ঘন্টা তাতে ওলামায়ে কেরামকে ফাঁসি দেওয়া হতো। তাদের ইচ্ছাই ছিল, তাদেরকে এমন শাস্তি দেব, যাতে তারা আমাদের কথা মেনে নেয় এবং সাধারণ মানুষ যেন তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে তওবা করে যে, আমাদের সন্তানকে মাদরাসায় লেখাপড়া করিয়ে আলেম বানাব না। সেই ওলামায়ে কেরামের আত্মসম্ভ্রমকে আমি সালাম জানাই। তাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন; তবু ঈমান বিসর্জন দেননি।

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ

'যারা আল্লাহর কিতাবকে শক্ত হাতে ধারণ করেছেন।'[১]

দীনকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করেছেন। ফলাফল কী হলো? পাপিষ্ঠদের অত্যাচার নির্মূল হলো। যদিও তারা পাহাড়ের ন্যায় অটল হয়ে অবস্থান নিয়েছিল। ওলামায়ে কেরাম তো দেখিয়েছেনই, তাদের শাগরেদরাও দেখিয়েছে। ইংরেজরা হযরত মুহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.)কে বলেছিল, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে আমরা তোমাকে শেষ করে দেব। জবাবে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন–

تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے
پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے
پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو
خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭০

یوں ابر سیاہ پہ فداں ہیں سبھی می کش
مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے
اللہ کی رستے کی جو موت آئے مسیحا
اکسیر یہی اک دوا میرے لیے ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
کہ یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لیے ہے

'তোমরা ভাবছ, আমার ধ্বংস হয়ে যাব।
অথচ অদৃশ্যে আমার জন্য সামান বাকি রয়েছে।
হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রাযি.)-এর প্রতি যে বার্তা এসেছিল,
আমি আনন্দিত যে, সেই ফয়সালা আমার জন্যও এসেছে।
এমনিতেই কালো মেঘের আড়ালে মাতালরা হত্যার জন্য মত্ত।
তদুপরি আজকের এই মেঘের ঘন কালো ছায়া আমার জন্য।
আল্লাহর রাস্তায় আমার যে মৃত্যু আসবে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে,
তা আমার জন্য একটি মহৌষধ।
তাওহীদ তো হলো এটি যে, হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন,
এই বান্দা দোজাহানের বিমুখ ছিল আমার জন্য।'

এভাবে দেওবন্দি ওলামায়ে কেরাম ইসলামের জন্য দৃঢ়পদ রয়েছেন। পরিশেষে আল্লাহ আমাদেরকে এই দীন দেখিয়েছেন। ইংরেজরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়েছে।

ইংরেজদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ

ইংরেজদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ওলামায়ে কেরামকে শহীদ করা। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করা। আল্লামা কবি ইকবাল বলেন–

مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں
مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں

'প্রাচ্যের লোক মাথা পেতে দেয় আর পশ্চিমারা তাদের স্বভাব পরিবর্তন করে দেয়।'

আমাদের অভ্যাস হলো, কারো সঙ্গে শত্রুতা থাকলে তার মাথা উড়িয়ে দাও। আর ইংরেজদের চরিত্র হলো কারো সঙ্গে বৈরিতা থাকলে তার ভাবমূর্তি নষ্ট করে দাও। সুতরাং তারা জনসাধারণের ভাবমূর্তি বিকৃত করে দিল। তা কীভাবে সাধিত হলো? তারা প্রথমে মানুষের ঈমান হননের পূর্বে রুটি, কাপড় ও আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। আর সাধারণ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই হলো অন্যে দেবে আমরা খাব। মানবজীবনের ইতিহাসে রুটির এমন মূল্য ছিল না যেমন মূল্য ইংরেজদের শাসনামলে ছিল। সকল মানুষকে রুটি-কাপড়ের ধাঁধায় লিপ্ত করেছিল। এমন মনে হতো যে, ঈমান কোনো বিষয় নয়, জীবনের আসল লক্ষ্যবস্তুই হচ্ছে রুটি। এভাবেই তারা সাধারণ মানুষের ভাবমূর্তি পাল্টে দিল। চামড়া তাদের কালোই ছিল; কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক ইংরেজদের মতো হয়ে গেল। তারা দুনিয়ার পিছে দৌড়াতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষা করো। টাকা উর্পাজন করো।

বর্তমানেও আপনারা আমাদের স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে তাকিয়ে দেখুন, মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে টাকা উপার্জন। অতএব, ইংরেজদের প্রধান দুটা কাজ ছিল।

এক. ওলামায়ে কেরামকে শহীদ করা এবং মাদরাসা বন্ধ করা।

দুই. সাধারণ মানুষের ভাবমূর্তি নষ্ট করে দুনিয়ার পিছে লাগিয়ে দেওয়া। অতঃপর আল্লাহ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন, তাদের প্রচেষ্টায় আল্লাহ এদেশ থেকে সেই হতভাগাদের বিতাড়িত করেছেন। কেননা, তারা আমাদের দীনের দুশমন ছিল। কোনো কবি বলেন–

دل کے میخانے مئے مغرب نے کر ڈالے خراب
ہے دل کے لیے موت مشینوں کی ایجاد

'পশ্চিমারা অন্তরের কীলক নষ্ট করে দিয়েছে। অন্তরের ঘাতক মেশিন তারা আবিষ্কার করেছে।'

তারা এদেশে আগমনের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের অন্তর নষ্ট করে ঈমানের জযবা শিথিল করা।

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمدی اس سے جسم سے نکال دو

'ওই দীনহীন লোকেরা, যারা মৃত্যুকে সামান্য পরিমাণ ও ভয় করে না, মুহাম্মদি আত্মার শক্তি তাদের হৃদয় থেকে বের করে দাও।'

আল্লামা ইকবাল বলেন–

ان امتوں کے باطن نہیں پاک

'তাদের ভেতরটা পবিত্র নয়।'

তারা ভেতরে কুমন্ত্রণা নিয়ে এদেশে আগমন করেছিল। এ উম্মতের হৃদয় থেকে ঈমান হনন করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ফলে আমাদের একটি বড় অংশ তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। এদের উদ্দেশে আল্লামা ইকবাল বলেন–

قمریانیت را نوا ہا خواستہ

سروہایت را قبا ہا خواستہ

آں نگاہش سر ما زاغ البصر

ہوئے قوم خویش از آید اگر

مے شناسد شمع و پروانہ را

نیک داند خویش وہم بیگانہ را

لیست منی گویدت مولائے ما

وائے ما اے وائے ما اے وائے ما

তোমার চাঁদসমূহের আলো ধারকৃত। তোমার মস্তিষ্কের কৃতিত্ব ধারকৃত। তারা ওই জাতি, যাদের দৃষ্টি নিস্তেজ দৃষ্টিবানদের দৃষ্টির উৎস। তারা দ্বিতীয়বার স্বজাতির প্রতি ফিরে এলেও বাতি ও পতঙ্গকে চিনবে এবং আপন ও পরকে ভালো করেই চিনতে পারবে। আমার মালিক! তুমি আমার নও। হায় আফসোস! হায় আফসোস! হায় আফসোস!

আমাদের কণ্ঠে তাদের কথা। আমাদের পরণে তাদের পোশাক। আমাদের নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করলে তিনি বলবেন, তোমরা আমার উম্মত নও। ওলামায়ে কেরামের ত্যাগও প্রচেষ্টায় আল্লাহ আমাদেরকে এমন দীনও দেখিয়েছেন। যখন ইংরেজরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে আল্লামা ইকবাল বলেন–

اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ
ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ
تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا
اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ
یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی
یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ
تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے
کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ

কারো কারিশমা কারো যুগের দুর্যোগ। এশিয়াতে ইউরোপীয় জাদু চুরমার হলো। এশিয়ার প্রাসাদে আমি এ রহস্য পেলাম। মস্তিষ্ক বিকৃত সম্প্রদায়ের জন্য এটা এশিয়ান বিজলি। এ বন্দেগি খোদায়ি, ওই বন্দেগি ভিখারীর। হয় আল্লাহর বান্দা হও, না হয় যুগের বীরপুরুষ হও। তোমার দৃষ্টিতে হৃদয় কাঁপত। কিন্তু এখন তোমার বীরত্ব হারিয়ে গেছে।

বহিরাগত ফেতনার খারাপ প্রভাব

ইংরেজরা এদেশ থেকে বিদায় নেওয়ার পরও সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি অনাসক্তি রয়ে গেল। ধর্মের প্রতি প্রেম হ্রাস হলো। তাদের উদ্দেশ্যই এটা ছিল যে, মানুষ তাদের সন্তানকে আলেম বানাবে না। মাদরাসার পরিবর্তে স্কুল-কলেজে পড়াবে। তাহলে তারা ভালো চাকরি করবে, অনেক টাকা বেতন পাবে। অর্থাৎ– তাদের ভাবমূর্তি বিকৃত হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই জীবিকা নির্বাহে মত্ত হয়ে আছে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যে ভিন্ন, তা ভুলে গেছে।

বহিরাগত ফেতনা বন্ধ হওয়া দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত

সেটা ছিল বহিরাগত ফেতনা। আর সেই ফেতনা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ একটি বহিরাগত মেহনতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই মেহনত হলো দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) যদিও

খানকার ব্যবস্থাপনার লোক ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তার মাধ্যমে দাওয়াত-তাবলীগের কাজের সূচনা করেছেন। দীনের সন্ধান সৃষ্টি করার জন্য উদাসীন ব্যক্তিদের দ্বারে-দ্বারে যাওয়ার একাজ আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে জারি করে দিয়েছেন।

দাওয়াতের কাজ শুরু হলো কীভাবে

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) উম্মতের অবস্থাশুদ্ধির ধ্যানে থাকতেন। সেই ধ্যানের ফলাফল হলো, একদিন স্বপ্নে দেখলেন, আমি তোমার দ্বারা দীনের কাজ নেব। খাব দেখে তিনি অত্যন্ত অস্থিরতায় ভুগছেন। সেই কাজ কীভাবে হবে? সুতরাং হযরত মাওলানা মাদানি (রহ.)-এর ভাইয়ের নিকট গিয়ে খাব প্রকাশ ও নিজের অস্থিরতার কথা বললেন। তিনি সান্ত্বনা দিলেন, এতে তোমার অস্থির হওয়ার কী আছে, খাবে তো তোমাকে বলা হয়নি যে, তোমাকে এ কাজ করতে হবে। তোমাকে বলা হয়েছে, তোমার কাছ থেকে এ কাজ নেবেন; সুতরাং কীভাবে নেবেন তা তিনিই ভালো জানেন। তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই।

হযরত ফজলে আলী কোরাইশি (রহ.)-এর এক খলিফা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাহদা (রহ.) যিনি এখনো জীবিত আছেন। তিনি মিসকীনপুর শরীফে গদিনশিন ছিলেন। অনেক বড় আলেম। একথা তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত মাওলানা আবদুল মালেক সিদ্দীক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি এ ঘটনা লিখে দিয়েছেন। কারণ, তিনি তা স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। সুতরাং আল্লামা আবদুল মালেক সিদ্দীকী (রহ.) আল্লামা ফজলে আলী কোরাইশি (রহ.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তারা তখন দারুল উলূম দেওবন্দে অবস্থান করছেন। তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আগমন করলেন।

তিনি বলেন, আমি দেখলাম, নবীজি আগমন করেছেন। লোকজন আসছে। তিনি মানুষের কাঁধে বিছানা উঠিয়ে দিয়ে বিদায় দিচ্ছেন। হুজুর! এর ব্যাখ্যা বলে দিন। হযরত আবদুল মালেক সিদ্দীকী সাহেব বললেন, মাওলানা! আপনি সফর থেকে এসেছেন। আপনার বিছানা কোথায়? তিনি বললেন, হুজুর এই আমার বিছানা। তিনি বিছানা নিয়ে হযরত ইলিয়াস (রহ.)-এর কাঁধে উঠিয়ে দিয়ে বললেন, মাওলানা! আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের জন্য বের হয়ে যাও; আমার দু'আ তোমার সঙ্গে থাকবে।

অবশেষে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) দীনের দাওয়াতের কাজে বেরিয়ে পড়েন। আমাদের মাশায়েখদের ভালোবাসা তাঁর সামনে ছিল। আল্লাহর শুকরিয়া, আল্লাহ তাঁর এ হিম্মত এত কবুল করেছেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় একশরও বেশি দেশে এ দাওয়াতের কাজ চলছে। উদাসীন লোকদের হৃদয়ে স্পৃহা সঞ্চার করা হচ্ছে এ কাজের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং বহিরাগত ফেতনার মোকাবেলায় আল্লাহ বহিরাগত মেহনমতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

'হালকা ও ভারী সরঞ্জামে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাও।'[১]

এর দ্বারা আল্লাহ জাতির ঈমানের হেফাযত করেছেন। সরকারি মোল্লা ও জালেম শাসকদের ফেতনার দ্বার বন্ধের জন্য আল্লাহ ভেতরের মেহনতকারীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর বহিরাগত ফেতনার দ্বার বন্ধের জন্য বহিরাগত লোকদের প্রস্তুত করেছেন। এটা দীন সংরক্ষণের পন্থা।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সোনালি বাণী

বর্তমানে ওলামা মাশায়েখ ও সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দীনের এ-কাজের দায়িত্ব পালন করছেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর একটি কথা খুবই বিস্ময়কর। তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থ মালফূযাতে কথাটি লিখেছেন। এটি সকলেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়–

'ইল্‌ম ও যিকির ব্যতীত দীনের কাজ করবেন, তাহলে শত বছরের ফেতনা বছরের মধ্যে এসে যাবে। পক্ষান্তরে ইল্‌ম-যিকিরের সঙ্গে কাজ করবেন, তাহলে শত বছরের হেদায়াত বছরের মধ্যে এসে যাবে। সুতরাং তাবলীগের কাজে যে-ছয়টি পয়েন্ট (নম্বর) রয়েছে, এগুলোর মধ্যে ইল্‌ম ও যিকির স্বতন্ত্র একটি পয়েন্ট বা নম্বর। প্রাথমিক অবস্থায় যারা তিন দিনের জন্য আগমন করত, তাদেরকে তিনি রায়পুরে তার খানকায় পাঠিয়ে দিতেন, যাও ভাই; সেখানে গিয়ে তিন দিন কাটিয়ে আসো। খানকায় আল্লাহওয়ালাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। আলহামদুলিল্লাহ! ইল্‌ম ও যিকিরের সঙ্গে কাজ করলে হেদায়াত অতি দ্রুত চলে আসে।

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ৪১

দু-প্রকারের মানুষ

এ উম্মতের মধ্যে মানুষ দুই প্রকার। কিছু মানুষের নিকট দাওয়াতের কাজ অগ্রগণ্য আর ইল্‌ম ও যিকির নিম্ন। কিছু মানুষের নিকট ইল্‌ম ও যিকির অগ্রগণ্য এবং দাওয়াতের কাজ নিম্ন। সুতরাং হেদায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা এরকম ভাবেই চলছে। উভয় মানুষ নিজ-নিজ কাজ করবে আর দীনের উন্নতি হবে। জামাতের সাথিরা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে মসজিদে আনবে আর আল্লাহওয়ালাগণ মসজিদে বসে তাদের বাতেনি অবস্থা সংশোধন করবেন। তখন মানুষ কামিয়াব হবে। উভয় দলের কাজই জরুরি।

সাইবার ফেতনা একটা আন্তর্জাতিক ফেতনা

এতক্ষণ পর্যন্ত অতীতের আলোচনা করছিলাম। এবার বর্তমান যুগের কথা শুনুন। বর্তমানে তৃতীয় আরেকটি ফেতনা উম্মতের ঘাড়ে চেপে বসেছে, যাকে বলা হয় বৈশ্বিক ফেতনা। পূর্বে দু-প্রকারের ফেতনা ছিল। অভ্যন্তরীণ ফেতনা ও বহিরাগত ফেতনা। অভ্যন্তরীণ ফেতনা বন্ধের জন্য পীর সাহেবগণ খানকায় কাজ করেছেন। আকবরি ধর্মকে নির্মূল করেছেন। আর বহিরাগত ফেতনা নির্মূলের জন্য আল্লাহ আরেক জামাত বের করে দিয়েছেন, যারা দ্বারে-দ্বারে গিয়ে উদাসীন লোকদেরকে উমুমি ও খুসুসি গাশতের মাধ্যমে সচেতন করে মসজিদে নিয়ে আসছেন। বর্তমানে আরেকটি ফেতনা মাথা চাড়া দিয়েছে, যাকে বলে বৈশ্বিক ফেতনা। সেটা কী? সেটা হচ্ছে বর্তমানে কাফেররা ইসলামি সভ্যতাকে মানবজীবন থেকে দূরীভূত করার জন্য একটা সাইবার যুদ্ধ শুরু করেছে। ছাত্ররা যাতে সহজে বুঝতে পারে, তাই আমি সহজ সরল ভাষায় বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব।

সাইবার ফেতনার হাতিয়ার দুটি

কাফেররা দুটি হাতিয়ার আবিষ্কার করল, যা আজ মুসলমানদের ঈমানকে হনন করছে। (১) Internte ইন্টারনেট (২) Cell Phone মোবাইল ফোন।

মুসলমানদের ঈমানবিধ্বংসী প্রথম হাতিয়ার ইন্টারনেট

Internte কে Enter in to the net বলা উচিত। অর্থাৎ– জালের মধ্যে প্রবেশ করো। মাদরাসার ছাত্ররা এখনো এর গভীরতা থেকে দূরে আছে। এ ইন্টারনেট বর্তমান পৃথিবীতে কেমন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে,

কত মানুষের ঈমান হরণ করছে তা ওই ব্যক্তি বলতে পারবে, যে বহির্বিশ্বে সফর করার সুযোগ পেয়েছে। উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা এমন ব্যাপক হয়েছে যে, ঘরে বসে ইন্টারনেটের মধ্যে উলঙ্গ নারী-পুরুষ দেখছে। সুতরাং বর্তমানে স্কুল-কলেজে ছাত্রদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, তোমরা ইন্টারনেটে গিয়ে এ বিষয়ে ইনফরমেশন নিয়ে আসো। অতএব, তারা কম্পিউটার নিয়ে বসে যায়। সে তো তার নিজের কাজই করছে কিন্তু কম্পিউটারে উলঙ্গ ছবি এসে যাচ্ছে। এগুলো দেখে কজন তার ঈমান হেফাযত করতে পারবে? তারা সেগুলোকে ব্যাপক করে দিয়েছে। ফলে কলেজ-ভার্সিটির ছাত্ররা ঘন্টার পর ঘন্টা নোংরা ছবি দেখতে থাকে। নোংরা মানুষদের দেখছে এবং এর যোগসূত্রও বের করে দিয়েছে এই যে, ফেসবুক-এর মাধ্যমে সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হাতিয়ার সেলফোন

দ্বিতীয় হাতিয়ার সেলফোন। একে আমি বলি হিলফোন। অর্থাৎ– জাহান্নামের ফোন। সে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যে মোবাইল ফোনের ফেতনা থেকে বেঁচে থেকে জান্নাতে যেতে পারবে। লাখ নয় কোটি-কোটি মানুষ কেয়ামতের দিন এই মোবাইল ফোনের কারণে জাহান্নামে যাবে। বিশ্বের ইতিহাসে মুসলমানদের ঈমান হনন করার জন্য মোবাইল ফোনের চেয়ে ধ্বংসাত্মক কোনো বস্তু আজ পর্যন্ত শয়তানের হাতে এসেছে বলে আমার মনে হয় না। এটা প্রয়োজনও, আপদও। আপনারা চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখুন, এই যে মোবাইল ফোন হাতে নিল, নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক করা শুরু করে দিল, কী নামাযী, কী তাহাজ্জুদগুযার, কী যিকিরকারী। সবার পেছনে লেগে সে তার কাজ করছে। সাথে-সাথে কাফেররা আরো প্লানিং করছে যে, কোম্পনিগুলোর সঙ্গে শেয়ার হচ্ছে, তারা বিশাল-বিশাল সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিচ্ছে। চলো বহুদূর কথা চলুক সারা রাত। রাতের বেলায় বিনামূল্যে। কোনো-কোনো লোক আমাদের বলেছে, রাতে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বলছে, যাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না-জায়েয। সুতরাং ভাই! যদি তিন-চার ঘন্টা গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে সে লেখাপড়া করবে কী? কলেজ-ভার্সিটির মধ্যে একটি ব্যাপক অভিযোগ হলো, প্রফেসররা বলেন, ছাত্ররা ক্লাসে এসে শুধু ঘুমায়। কারণ, সারারাত তার ঘুম হয়নি। এখন সে ঘুমাবে না তো কী করবে। লেখাপড়ায় তার মন বসে না। কিছু শুনলে তা স্মরণ ও থাকে না। আর ভাবতে থাকে–

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی

ورق ورق تیرا چہرہ دکھا دیتا ہے

'বই খুলে বসলে চোখে কান্না আসে। পাতায়-পাতায় তোমার মুখচ্ছবি ভাসে।'

গোটা জাতিকে এ-ভাবনায় মত্ত করে দিয়েছে। সুতরাং ভেবে দেখুন, তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন হবে।

গুগলের অনুসারী

এরপরও কিন্তু আমাদের দেশে তার প্রভাব কম। একবার আমি সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরার সময় বিমানবন্দরে একটি পত্রিকার হেডলাইন দেখলাম যে, বর্তমান বিশ্বে পাকিস্তানে ইন্টারনেটের ব্যবহার কম। পত্রিকাটা নিয়ে পড়লাম। সেখানে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে মাত্র ১০% লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে। গুগল হচ্ছে ইন্টারনেটের একটি ঠিকানা। আমি শুকরিয়া আদায় করলাম। তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ আমাদেরকে এখনো কম রেখেছেন। বাস্তবেও কাফেররা এ নিয়ে অত্যন্ত পেরেশান যে, এদেশের লোক ইসলাম থেকে দূরে সরছে না কেন? এর জন্য তারা অনেক চেষ্টা করেছে। এন,জি,ও প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু শতভাগ সফল হতে পারছে না। কলেজ ভার্সিটির ছাত্রীদের স্বাধীন করে দিয়েছে। মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি করছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম মেয়েরা এই ফেতনা থেকে কিছুটা বেঁচে আছে। তবে কিছুসংখ্যক তো থাকবেই। তাদের আরেকটা চেষ্টা হলো, আধা উলঙ্গ ড্রেস। আল্লাহ ক্ষমা করুন। অনুভূতিশীল মানুষ তা দেখলেই তাওবা করবে। এতেও তাদের ইচ্ছা সিদ্ধি হয়নি। তারা ফিল্ম, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে উম্মতের ঈমান বরবাদ করার চেষ্টা করছে।

তবু তারা শতভাগ সফল হতে পারেনি। বর্তমান যুগে বেহায়াপনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু আমরা একথা ধারণা করতে পারি না যে, আমাদের এ ছোট শহরের কোনো ঘরে মহিলারা সিগারেট পান করে। একথাও ধারণা করতে পারি না যে, যেকোনো মেয়ে শুধু আন্ডারওয়ার ও ব্রা পরে বাইরে বের হবে। আলহামদুলিল্লাহ এই দুর্যোগপূর্ণ সময়েও আল্লাহ আমাদের মেয়েদের সেই অনুভূতি দিয়েছেন, তাদের হেফাযতে রেখেছেন। তারা আল্লাহ ও

দীনের প্রতি এমন মহব্বত রাখছে। এতে কাফেররা খুবই ব্যথিত যে, এ জাতি নিজের জীবন থেকেও তাদের ধর্মকে বেশি ভালোবাসে। তাই পরকালে আমরা আল্লাহর সামনে বলতে পারব–

تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے

تیرے قران کو سینوں سے لگایا ہم نے

তোমার কাবাকে আমরা ললাটে লাগিয়েছি। তোমার কুরআনকে আমরা বুকে স্থাপন করেছি।

তিন মহিষের কাহিনি

কোনো এনজিও কোম্পানিতে দুই-তিনটা মেয়ে ছিল মাঝারি বয়সের। ছুটির দিন ছিল। ইসলামাবাদ থেকে মরি বেশি দূরে নয়। ঘন্টা-দেড় ঘন্টায় সেখানে পৌঁছা যায়। তারা বলতে লাগল, মরি চলো; বরফ দেখে আসব। তারা বরফ দেখে ফিরে আসছে। রাস্তায় দেখল, এক মহিলা মহিষ চরাচ্ছে। তারা গাড়ি দাঁড় করিয়ে মহিলাকে বলল, আন্টি! একটা কথা শুনবেন। মহিলা সামনে অগ্রসর হলো। তারা জিজ্ঞেস করল, আন্টি! আপনার জীবনযাত্রার অবস্থাটা একটু বলবেন? মহিলা বলল, এই তো সকালে ঘুম থেকে উঠে কুরআন তেলাওয়াত করি। তারপর নাস্তা তৈরি করি। ছেলেমেয়েদের নাস্তা খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিই। খাওয়াদাওয়ার পর স্বামী তার কাজে চলে যায়। আমি মহিষ নিয়ে মাঠে চলে আসি। সন্ধায় বাড়িতে গিয়ে আবার রান্নাবান্না করি। রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে যাই। এই তো আমাদের জীবন।

তারা বলল, আন্টি! এ ছাড়া কি জীবনের কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই? বলল, কই না তো। আমি তো একেই জীবনের লক্ষ্য মনে করি। মেয়েরা বলল, আন্টি! মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে কি আপনি কিছু জানেন? বলল, মহিলাদের কাজই তো ঘরের সমস্ত কাজ গুছিয়ে রাখা। মেয়েরা বলল, আচ্ছা বুঝেছি; আন্টি বাড়িতে ঘরের কাজ করেন আর মাঠে এসে মহিষ রেখে আপনিও মহিষ হয়ে যাচ্ছেন।

একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা রেগে যায়, কী বললে! আমি মহিষ হয়ে গেছি। তোমরা কারা? তোমরা কী কর? বলল, আমরা এনজিও অফিসে চাকরি করি, নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলি, পঁচিশ হাজার টাকা করে আমাদের বেতন। এ গাড়ি কোম্পানির, ড্রাইভার কোম্পানির। আমরা

যেখানে যেতে চাই সেখানে সে নিয়ে চায়। এবার মহিলা বলল, হো বুঝেছি; তোমরা যেখানে যাও, সে-ও সেখানে যায়। এর মানে হলো, তোমরা তিনটা মাদী মহিষ আর ড্রাইভার তোমাদের মাদা মহিষ!

ঈমানের আত্মসম্ভ্রম বাকি রয়েছে

কাফেররা পুরোদমে চেষ্টা চালাচ্ছে এ উম্মতের নারীদের মধ্যে বদদীনি ঢুকানোর জন্য। কিন্তু সফল হতে পারছে না। তবে গোত্রবিশেষে কিছু-কিছু মেয়ে বহিরাগতদের প্রভাবে মডেল হতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনো সেগুলো থেকে মুক্ত থেকে দীনকে আঁকড়ে রেখেছে। আর এটি ওলামায়ে কেরামের মেহনতের ফসল। এতে কাফেররা অধীর হয়ে আছে।

আমি সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরছিলাম। বিমানে যে-মেয়েরা বিমানবালার চাকরি করে, তাদের ব্যাপারে সাধারণ একটা কথা চালু আছে যে, ওরা আধুনিকা হয়, চরিত্রহীন হয়। এদের মধ্যে কোনো এক মেয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। বলল, আপনার স্বামীকে কোনো পীর সাহেবের মতো দেখা যাচ্ছে। আমি তার মাধ্যমে কিছু দু'আ করাতে চাই। আমি তার জন্য দু'আ করলাম। কথা বলতে-বলতে তাদের পরনে সেলোওয়ার কামিজ সম্পর্কে কথা বলল। সে বলল, বর্তমানে যে বিমানের প্রধান পরিচালক আছে, তার আগের পরিচালক অনেক চেষ্টা করেছে, আমরা বিমানবালাদের জন্য শার্ট-পেন্টের প্রথা চালু করবে। তারা ইংরেজ দর্জির মাধ্যমে সেটা বানানোর জন্য অর্ডারও দিয়েছিল। ফলে যখন আমরা সে বিষয়ে জানতে পারলাম, তখন আমরা পাকিস্তানি পোশাকের দাবিতে হরতালের ডাক দিলাম। আমাদের আন্দোলানে বাধ্য হয়ে তারা আমাদেরকে সেলোওয়ার-কামিজ পরার অনুমতি দেয়।

তার কথা শুনে আমার খুবই আনন্দ লাগল যে, এই পরিবেশে থেকেও তারা ইসলামি পোশাকের জন্য আন্দোলন করছে। সুতরাং ঈমানের জযবা তাদের মধ্যে এখনো বাকি রয়েছে। এটা আমাদের ওলামায়ে কেরামের মেহনতের ফসল।

যুবকের দাদির জন্য অদ্ভুত দু'আ

বন্ধুগণ! বলছিলাম, তৃতীয় ফেতনাটা হচ্ছে ইন্টারনেট। এটা এমন অপদার্থ বস্তু যে, ছোট-বড়, দীনদার-দুনিয়াদার কাউকে ছাড়ে না, সকলকে সমানভাবে গ্রাস করে। সতেরো বছরের এক যুবক এসে আমার নিকট

কাঁদতে লাগল। তাকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, বাবা! তোমার কী হয়েছে? কাঁদছ কেন? বলল, হুজুর! আমার দাদির জন্য একটু হেদায়াতের দু'আ করুন। বললাম, কেন? কী হয়েছে তোমার দাদির? বলল, হুজুর! আমার দাদা মারা গেছেন। দাদির বয়স ৭৮। এ বয়সে আমার দাদি সারা দিন ইন্টারনেটে বসে থেকে উলঙ্গ ছবি দেখছেন। তাই আমার দাদির হেদায়াতের জন্য একটু দু'আ করুন।

দেখুন সতেরো বছরের যুবক কাঁদে আর ৭৮ বছরের বুড়ি ইন্টারনেটে বসে উলঙ্গ ছবি দেখে!

বৈশ্বিক ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় কী?

কাফেররা মুসলমানের ঈমান হনন করার জন্য সেলফোন ও ইন্টারনেট চালু করেছে, যাতে মানুষ তাদের ইচ্ছামাফিক জীবন যাপন করে। বর্তমানে এটা বৈশ্বিক ফেতনা। এ ফেতনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাহলে বাঁচার উপায় কী? হাদীছ শরীফে এসেছে, কেয়ামতের সন্নিকটে বিশ্বব্যাপী ফেতনা চালু হবে। তা কাঁচা-পাকা সমস্ত স্থানে ও সকল মানুষের মধ্যে পৌঁছবে। ওই সময় যারা নিয়মিত সুরা কাহ্ফ পাঠ করবে তারা সেই ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে।

সূরা কাহ্ফের শিক্ষা

সূরা কাহ্ফ আমাদের কী শিক্ষা দেয়? সূরা কাহ্ফ পাঠ করলে তাতে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা জানা যায়। কতিপয় যুবক ছিল। আল্লাহ বলেন–

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'কতিপয় যুবক তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনয়ন করল। আমি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিলাম।'[১]

তারা নিজের ঈমান রক্ষা করা ও অত্যাচারী শাসকের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে গেল। আল্লাহ তাদের একটি গুহায় আশ্রয় দিলেন। তারা শুয়ে গেল। সে গুহায় প্রবেশ করে তাদের ঈমান রক্ষা করে। তারা যখন জাগ্রত হলো, তখন ওই বাদশাহও চলে গেল। তার অত্যাচারও নির্মূল হয়ে গেল। সুতরাং সূরা কাহ্ফ আমাদের শিক্ষা দেয়,

---

১. সূরা কাহফ : আয়াত ১৩

যেভাবে ওই যুবকরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়ে তাদের ঈমান রক্ষা করেছিল, সেভাবে আমরা বর্তমানে গুহায় আশ্রয় নিয়ে আমাদের ঈমান রক্ষা করতে হবে।

মক্কা-মদিনার গুহা

এ পৃথিবীতে দুটি বিশাল গুহা রয়েছে। মক্কা ও মদীনা। সেগুলো এত বিরাট গুহা যে, হাদীছ শরীফে এসেছে, বড় দাজ্জাল পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। হাদীছ শরীফে এসেছে, সে দীনদার পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গদের খুব অস্থির করে ফেলবে, তাদের হত্যা করবে। অতঃপর তারা মক্কা-মদিনায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। সুতরাং পৃথিবীতে দুটি বিশাল গুহা রয়েছে। মক্কা ও মদিনা। এছাড়া আরো তিনটি গুহা রয়েছে। কারণ, মক্কা-মদিনা তো অনেক দূরে। মানুষ সেখানে অতি সহজে যেতে পারবে না। সুতরাং তাদের জন্য সারা পৃথিবীতে আরো তিনটি গুহা রয়েছে।

মাদরাসার গুহা

একটি গুহার নাম মাদরাসা। আপনারা দেখে থাকবেন, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এখানে ভিন্ন একটি পরিবেশে চলে আসে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকে না। ওস্তাদের সামনে বসে থাকে। আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নামায-রোযার চিন্তায় থাকে। বাইরের সকল ফেতনা থেকে বেঁচে থাকে। এটা গুহায় অবস্থানের মতো। এতে তাদের ঈমান নিরাপদ থাকে। আপনারা-ই তো বলেন, হুজুর! বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে থাকলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে না। মন চায় মসজিদে চলে আসি। সুতরাং এটা গুহার জিন্দেগি। সুতরাং মাদরাসার ছাত্ররা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা চাই। আল্লাহ তোমাদের ঈমান রক্ষার জন্য মাদরাসা নামে তোমাদেরকে একটি গুহা দান করেছেন। তাই ওস্তাদদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলো। জীবন চলার পথে তাদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করো। তাদের থেকে প্রশিক্ষণ নাও। তাদের কথা পালন করো। নিজের ঈমানকে ফেতনা থেকে বাঁচাও।

তাবলীগ জামাতের গুহা

আরেকটি গুহা হলো তাবলীগ জামাত। সেটা কীভাবে? যে-ব্যক্তি একবার তিন দিনের সময় লাগায়, আল্লাহ তাকে এমন হৃদয় দান করেন যে,

এর পর সে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যায়। সে কারো কথা শোনে না। বন্ধুবান্ধব কত ধরনের কথা বলে; কিন্তু সে কারো কথায় কান দেয় না। আমাকে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে। তিন দিনে আমাকে এ শিক্ষা দিয়েছে। শুক্রবার রাতে আমাকে মসজিদে থাকতে হবে।

এটি একটি গুহা। যে-ব্যক্তি এ গুহায় প্রবেশ করেছে, তার ঈমান হেফাযতে থাকবে। এ উম্মতের কোটি-কোটি যুবক আজ এ গুহার মাধ্যমে নিজের ঈমান রক্ষা করছে। হেদায়াতের ওপর জমে আছে। বাইরে রয়েছে ফেতনা। বাইরে রয়েছে গোনাহ। তারা আজও শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ছে। আল্লাহকে ডাকছে। তাকবীরে উলার চিন্তায় থাকছে। নিজের দেহকে নবীজির সুন্নাত দ্বারা সাজানোর চেষ্টা করছে। সুতরাং এটি একটি গুহা।

খানকার গুহা

তৃতীয় গুহা হচ্ছে আল্লাহওয়ালাদের খানকা। যেখানেই আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আল্লাহর মায়ার বান্দাদের নিয়ে 'আল্লাহু আল্লাহু' ধ্বনি উচ্চারণ করছেন, তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন এবং যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন, তারা সকলেই একটি গুহায় রয়েছেন। তাদের ঈমান ও এর দ্বারা হেফাযত থাকবে। তারা ও সামাজিক কুপ্রথা ও বহিরাগত ফেতনা থেকে বেঁচে থাকবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে। সুতরাং এ তিন গুহা, মাদরাসা, খানকা ও তাবলীগ জামাত এগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে আল্লাহ তাদের ঈমান হেফাযতে রাখবেন।

মাদরাসার ছাত্রদের সৌভাগ্য

মাদরাসার ছাত্ররা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তোমাদেরকে মাদারাসার সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন। তোমরা অস্থির হওয়ার কারণ নেই যে, আমরা বহির্বিশ্বের কোনো সংবাদ পাই না। ভাই! এটা ক্ষতির বিষয় নয়। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণের বিষয়, খুশির বিষয়, এটা তোমাদের গুণ যে, বহির্বিশ্বে নোংরা পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা-ই নেই। এতে আমরা অনেক ফেতনা থেকে বেঁচে আছি।

কেউ যদি ঘরে বসে থাকে আর বাইরে ঘূর্ণিঝড় হয়, তাহলে সে ঘরে বসে নিরাপদ থাকে, এতে সে খুশি হয়। কেননা, যারা বাইরে থাকে তাদের মারাত্মক কোনো ক্ষতি না হলেও তাদের মুখে ধুলাবালি তো লেগে যায়। তাদের গা ধুলায় ধূসরিত হয়। ঠিক সেই অবস্থা হচ্ছে বর্তমান যুগে গুহায়

অবস্থারত লোকদের। বাইরে গোনাহের ধুলাবালি তাদের গায়ে লাগে না। যারা সেই গুহা থেকে বের হবে, তারা বাইরের গোনাহের ধুলাবালি গায়ে মেখে ঘরে ফিরে আসবে। সুতরাং অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। খুশি হওয়া চাই। আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করেছেন। আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে আসহাবে কাহ্ফের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই মাদরাসা বা খানকা কিংবা তাবলীগ জামাতে থাকলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করবেন না যে, আমরা তো বাইরে যেতে পারি না, পৃথিবীর অনেক সুখের বিষয় থেকে আমরা বঞ্চিত রয়েছি। বরং এটা আমাদের খুশির বিষয়, সৌভাগ্যের কথা। আমরা ঘরে অবস্থান করে বাইরের ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা পাচ্ছি। আমার চেহারা ধুলায় ধূসরিত হচ্ছে না। বাইরে গেলে ধুলাবালি লাগবে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদের রক্ষা করেছেন। দেখুন, কত যুবক কত কিশোর আজ মাদরারাসায় থেকে আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন যাপন করছে।

আমরা গত বছর আমাদের মহিলা মাদরাসায় একটি নিয়ম চালু করেছিলাম, যে-মেয়েরা নয়টি নামায আদায় করবে আমরা তাদের পুরস্কৃত করব। নয়টি নামায হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ এবং চারটি নফল– এশরাক, চাশত, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদ। মহিলা শিক্ষিকাদের বলছি, আপনারা তাদের এ আমল রেকর্ড রাখবেন। আমাদের ধারণা ছিল, হয়তো দু-চারজন ছাত্রী পাওয়া যাবে, যারা পরিপূর্ণভাবে এ আমল করেছে। কিন্তু যখন রেকর্ড যাচাই করা হলো, তখন দেখলাম, ৩২ জন ছাত্রী এমন পাওয়া গেছে, যাদের সারা বছরেও এ সকল নামাযের কোনো একটি নামায কাজা হয়নি।

সুতরাং দেখুন, গুহা ঈমান রক্ষা করে। কত মাদরাসার ছাত্রদের খবর পাওয়া যায় যে, সারা বছর তাদের তাকবীরে উলা ছোটে না, তাহাজ্জুদ বাদ পড়ে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা। মাদরাসার ছাত্ররা মন খারাপ করা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদেরকে দীনের জন্য চয়ন করেছেন। আমরা আমাদের ঈমান রক্ষা করে জীবন যাপন করছি। সুতরাং বর্তমানে এটা আমাদের ঈমান রক্ষার মাধ্যম। অতএব, বর্তমান যুগে ঈমান রক্ষা হলে ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমেই হচ্ছে। সুন্নত জারি থাকলে তাদের মাধ্যমেই হচ্ছে। এটা আল্লাহর রহমত। আজ আপনারা ঈমান শিক্ষার জন্য এখানে বসেছেন। এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া। তিনি আমাদের ঈমান সুরক্ষিত রেখেছেন।

ইল্‌ম না থাকা এটিও একটি গুণ

আপনারা কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি তাকাবেন না। তাদের ভেতরে যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, সেটা সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করো। কেননা, মানুষ ডাক্তারের কাছে তাদের ভেতরের অবস্থা বর্ণনা করে বাহ্যিক চিকিৎসার জন্য আর পীর সাহেবের নিকট বর্ণনা করে আত্মার চিকিৎসার জন্য। বর্তমান বৈশ্বিক ফেতনার কারণে কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রদের ভেতরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তারা কিছুই জিজ্ঞেস করতে চায় না। বর্তমান কম্পিউটার তাদের ঈমান বরবাদ করে দিয়েছে। আর তোমরা ঈমান সুরক্ষিত রেখেছ। এটি তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া। এজন্যই দেখুন, উদাসীনতা বা দীনের জ্ঞান না থাকা কেমন গর্হিত বস্তু। আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

'গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'[১]

কিন্তু একে মহিলাদের জন্য গুণ বলা হয়েছে,

مُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

'সরল-সহজ পবিত্র মহিলা।'[২]

غافلات অর্থ কী? অর্থাৎ– পন্থা সম্পর্কে যাদের কোনো জ্ঞান থাকে না। গায়রে মাহরামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কোনো ধারণা থাকে না। যারা ওই সমস্ত আচরণ থেকে বেঁচে থাকে, তাদেরকে غافلات বা উদাসীন বলে। ভালো মেয়েরা সতী থাকে। সুতরাং বর্তমান যুগে বলা যাবে, যারা বাইরের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে, ঈমান রক্ষা করে। এ বৈশ্বিক ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আজ গুহায় জীবনযাপন জরুরি হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ হযরত মাহদিকে প্রেরণ করবেন। অতঃপর ইসলামি আইন প্রয়োগ হবে। এমন একটি সময় আসবে, যখন এ পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান কার্যকর হবে।

দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা খেলাফতের দায়িত্ব

বর্তমান যুগেও অনেক ওলামায়ে কেরাম দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট সাধনা করছেন। তাঁরা অনেক সাহসী। তাঁরা উচ্চ স্তরের লোক। আমাদের দু'আ

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫
২. সূরা নূর : আয়াত ২৩

তাদের সঙ্গে আছে। কেননা, বাদশাহ মুমিন হওয়া চাই। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে কুরআন-হাদীছমতো পরিচালনা করা চাই। ইবাদতগুযার ও আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া চাই। তাওবার ওপর অটল থাকা চাই। একজন হচ্ছেন খলিফা, যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তার স্তর অনেক ঊর্ধ্বে। মাশাআল্লাহ! বর্তমান যুগে অনেক বীর রয়েছেন, যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাদের সংখ্যা অল্প। দুনিয়ার ফেতনা প্রাধান্য পাচ্ছে। তবু আমাদের দীনের কাজ করতে হবে। যদি কেউ জামাতের কাজ করে, তাহলে সেটা আমাদের হৃদয়ে প্রশান্তির বিষয় মনে করতে হবে যে, আলহামদুলিল্লাহ! তারা নবীজির আনীত ধর্মের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। দেখুন, যদি ঘরে আগুন লাগে, তাহলে যে-ব্যক্তি আগুন নির্বাপণ করে, সে খুব প্রিয় হয়। সুতরাং বর্তমান যমানায় ইসলামের ওপর পাপাচারের আগুন লেগেছে। সেই আগুন নির্বাপণের জন্য যদি তাবলীগ জামাত সামান্যও কাজ করে, তাহলে তা আমাদের খুশির বিষয় হওয়া চাই। মাদরাসার আদলে সেই আগুন নির্বাপণের কাজ হলে তাদের প্রতি খুশি হওয়া চাই। খানকার সূরতে সেই আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা চালু হলে তাতেও খুশি হওয়া চাই। আল্লাহর রহমত তখন আসে, যখন আল্লাহওয়ালাদের দ্বারা দু'আ করানো হয়।

দুই প্রকারের সৈনিক

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) তাঁর রচিত মাকতুবাতে উল্লেখ করেন, সৈনিক দুই প্রকার (১) গাজী, যারা অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে দীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে জিহাদ করেন, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। (২) দু'আর জামাত, যারা ঘরে বসে তাদের মুজাহিদ ভাইদের জন্য রাতের বেলায় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। তাদের দু'আর বরকতে আল্লাহ দীনের মুজাহিদগণকে বিজয় দান করেন। তিনি বলেন, প্রথম গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় গ্রুপের মর্যাদা ঊর্ধ্বে। কারণ, প্রথম গ্রুপ কষ্ট করেন, জান-মাল বিসর্জন দেন; কিন্তু এর দ্বারা বিজয় নিশ্চিত নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় গ্রুপের দু'আর বরকতে আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথি হয় আর সেই সাহায্যের মাধ্যমেই বিজয় নিশ্চিত হয়। আল্লাহর সাহায্য না এলে মানুষ তার নিজের বলে কিছুই করতে পারবে না।

সকল শাখার উদ্দেশ্য এক

কাজেই বন্ধুগণ! যারা যে-স্তরে ইসলামের খেদমত করছে, সবার উদ্দেশ্য এক। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা। তারা কেউ ইসলাম থেকে বাইরে নয়। মাঝে-মাঝে ছাত্ররা সমালোচনা করে, ওরা ভিন্ন, তারা আলাদা ইত্যাদি। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ বহিরাগত ফেতনার নিরসনের জন্য এক ধরনের নেয়ামত দিয়েছেন আর অভ্যন্তরীণ ফেতনা নিরসনের জন্য এক ধরনের নেয়ামত দান করেছেন। উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আগুন নির্বাপণের জন্য যে যে-স্তরে কাজ করবে, তার কাজের দ্বারা নবীজি শান্তি পাবেন। সুতরাং দীনের কাজের ক্ষেত্রে সবাই ভাই-ভাই। আমরা একে অপরে মিলেমিশে থাকব। পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি করব। অতএব মাদরাসার ছাত্রদের জন্য উচিত, প্রত্যেক স্তরে লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। কেউ তাবলীগের কাজ করবে, কেউ ইল্‌ম ও আমলের কাজ করবে, কেউ যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে। সবাই একে অপরের সঙ্গে মহব্বত রাখবে। তাহলে বর্তমানে বৈশ্বিক ফেতনা থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাযত করবেন।

ছাত্রদের প্রতি উপদেশ

প্রিয় ছাত্ররা! বর্তমান যুগের সেলফোন সাপ-বিচ্ছু থেকেও মারাত্মক। সাপ দংশন করলে তোমার প্রাণ যাবে; কিন্তু এই সেলফোন দংশন করলে তোমার ঈমান হারাবে। কারো একান্ত প্রয়োজন হলে সে এটা এ ভেবে হাতে ধারণ করবে যে, আমি বিচ্ছুকে স্পর্শ করছি। কাজ শেষ; রেখে দাও। মোবাইল ফোনে কথা বলা, ম্যাসেজ দেওয়া আর একে মাতাপিতা ও ওস্তাদ থেকে গোপন রেখে খুশি হওয়া এটা ভালো কাজ নয়। নিজের ঈমান রক্ষার জন্য এই বিপদ থেকে নিজের জীবনকে রক্ষা করো। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি এ দুর্যোগ মুহূর্তেও আমাদের ঈমানকে হেফাযতে রেখেছেন, আমাদেরকে দীনের ওপর অটল রেখেছেন। দীনের যে-স্তরে ইচ্ছা সেই স্তরে আল্লাহ আমাদেরকে দীনের খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমরা দীন শিক্ষার জন্য এসেছি। এটি আমাদের কৃতিত্ব নয়। এটি আমাদের ওপর আল্লাহর অশেষ দয়া।

কবি বলেন–

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی
منت ازو شناس کہ در خدمت گزاشتن

হে বন্ধু! বাদশাহর সেবা করছ বলে তার ওপর খোঁটা দিয়ো না। এটি তোমার কৃতিত্ব নয়। বাদশাহর সেবার জন্য অনেক লোক আছে। বরং এটি তোমার ওপর বাদশাহর দয়া যে, তিনি তোমাকে তাঁর সেবার জন্য কবুল করেছেন।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, হে আল্লাহ! তোমার কত অনুগ্রহ! তোমার কত অনুকম্পা! ভাই! আমাদের দেহের প্রতিটি লোম কথা বলবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার পরিপূর্ণ শুকরিয়া আদায় করতে পারব না। তুমি যে এই কঠিন দুর্যোগের সময় আমাদের ঈমান হেফাযতে রেখেছ। তোমার ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে দান করেছ। তোমার কুরআন আমাদের বুকে ঠাঁই দিয়েছ, যা শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ছাত্ররা নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দীনের ওপর অটল রাখুন। দীনের কাজে নিয়োজিত করুন। কেয়ামতের দিন প্রথম সারিতে নবীগণ, তারপর সাহাবা, তাবেয়ীন, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, মাশায়েখ, সূফীগণ দাঁড়াবেন। তখন এই ইল্‌মের খাতিরে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের পেছনে দাঁড় করাবেন। যেহেতু দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম হলো, যুবকরা পেছনে থেকে সকলকে সামলে নেয়। তাই কেয়ামতের দিন যুবকরা পেছনে থাকবে। ভাই! তখন যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, কী নিয়ে এসেছ? তখন তো আমরা কিছুই দেখাতে পারব না। সুতরাং আমরা বলব, হে আল্লাহ! আপনার দরবারে পেশ করার মতো কোনো আমল আমাদের নেই। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, আপনার দীনের প্রতি মহব্বত রেখে দীনদারদের সঙ্গে মিশে থাকতাম। এটা-ই আমাদের আমল।

تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے
تیرے قران کو سینوں سے لگایا ہم نے

তোমার কাবাকে ললাটে স্থাপন করেছি। তোমার কুরআনকে বুকে লাগিয়ে রেখেছি। হে আল্লাহ! যদি আমাদের সেই সম্পর্ক গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে আমাদের নিকট শুধু একটি বস্তুই আছে।

কোনো কবি বলেন–

عمل کی اپنے اساس کیا ہے
بجز ندامت کے پاس کیا ہے
رہے سلامت تمہاری نسبت
میرا تو اک آسرا یہی ہے

'আমলের কী ভরসা! লজ্জিত হওয়া ছাড়া নিষ্কৃতি নেই। তোমার সম্পর্কের কারণে নিরাপদ থাকব। আমার তো শুধু সেই আশা।'

ভাই! যদি আমাদের সেই সম্পর্ক আল্লাহর দরবারে কবুল না হয়, তাহলে ভেবে দেখুন, আমাদের কী অবস্থা হবে। দেখুন, চাটাইয়ের ওপর বসতে-বসতে আমাদের হাঁটু ও গিরা শক্ত হয়ে গেছে যেমনটা গরু-মহিষের কাঁধে হয়। এর পর যদি আমল করে আল্লাহর আদেশ মেনে আমরা জান্নাতে যেতে না পারি, তাহলে গরু-মহিষ ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল। আমাদের ঈমান হেফাযত করুন। আমাদেরকে আপনার বানিয়ে নিন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আপনার মহব্বতের দৃষ্টি দিন, যে-দৃষ্টির মাধ্যমে আপনি ডাকাতের সরদারকে অলি বানান। আপনার মহব্বতের দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদেরকে শরাবখানা থেকে বের করে আপনার ভালোবাসার পেয়ালা পান করার তাওফীক দিন। যে-দৃষ্টির মাধ্যমে আপনি বিশর হাফি (রহ.)কে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর ওপর আপনার যে-দৃষ্টি পড়েছিল, যার দ্বারা আপনি তাকে দুনিয়ার সৈনিক থেকে বের করে রূহানি সৈনিক বানিয়েছিলেন। হে আল্লাহ! সেই মহব্বত আমাদের বুকে ঢেলে দাও। একটিবার আমাদের প্রতি তোমার সেই দৃষ্টিতে তাকাও। হে আল্লাহ! আপনি দেখছেন, এই ছাত্ররা দীন শিক্ষার জন্য নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। হে আল্লাহ! আমাদের তুমি কবুল করো। আপনার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করো। আমাদের ঈমানকে হেফাযত করো। সারা জীবন দীনের ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করো। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

– ২১তম খণ্ড সমাপ্ত –

খুতুবাতে যুলফিকার
২২তম খণ্ড

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

'আমি অধম একবার কোনো এক দেশে গমন করছিলাম। সেখানকার দেওয়ালে আশ্চর্য একটি বাক্য লিপিবদ্ধ দেখেছিলাম। আমি অনেক সময় পর্যন্ত সেই বাক্যটি পাঠ করেছি। ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল। তবে বাক্যটি খুবই আশ্চর্যপূর্ণ–

If you feel god is away. guess who moved.

'যদি তোমরা উপলব্ধি করে থাক যে, আল্লাহ দূরে আছেন, তাহলে এটা অনুমান করো যে কে তোমাকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছে।'

বাস্তবে তো আল্লাহ নিজের কথা থেকে পেছনে সরতে পারেন না। তাহলে পেছনে সরে যায় কে? বান্দা তো নিজে-নিজেই তার স্থানচ্যুৎ হয়ে যায়। আমরা যদি মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত আমল করি, তাহলে আল্লাহ সেই পদোন্নতি অনুযায়ী আমাদের পুরস্কার দান করবেন। এটা হলো পৃথিবীতে কামিয়াব ও বিজয়ী হওয়ার সহজ পন্থা।'

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

তোমার শক্তি পবিত্র

মানুষ যদি তার আশপাশের বস্তু নিয়ে গবেষণা করে, তাহলে এই বিস্তৃত সৃষ্টির মধ্যে মাহবুবের (আল্লাহর) চেহারা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক বস্তুতে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন প্রস্ফুটিত হয়। এটি কুদরতি দৃশ্য আল্লাহর গুণাবলির আয়না। আকাশের বিস্তৃতি দেখুন যে, তা থেকে আল্লাহর মহত্ত ও কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। মানুষের বিবেক এতটুকু সীমিত যে, যদি সে গবেষণা করতে থাকে আসমানের সীমানা কোথায় তাহলে, তা আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হবে। সৃষ্টির বিস্তৃতি নিয়ে গবেষণা করলে যখনই থামবে, তখনই প্রশ্ন জাগবে, এরপর কী আছে? মানবমস্তিষ্ক যা সৃষ্টিজীবকে আয়ত্ত করতে পারবে না, সে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কী গবেষণা করবে?

আমরা যদি সাগরের ঢেউ নিয়ে গবেষণা করি যে, তরঙ্গ একটা আরেকটার ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, তা দেখে আল্লাহর দয়ার অসীম সাগরের কথা স্মরণ হয়।

সূর্যের প্রতি তাকিয়ে দেখুন, যা সারাক্ষণ তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত করছে। তা দেখে আল্লাহর নূরের জ্যোতি সারাক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন থাকার কথা স্মরণ হয়।

ফুলের প্রতি তাকালে আল্লাহর সৌন্দর্যের কথা স্মরণ হয়।

সিংহ নিয়ে গবেষণা করলে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ক্ষমতার কথা স্মরণ হয়। অথচ সিংহ একটা প্রাণী; কিন্তু তার মধ্যে এত ভয় বিদ্যমান। তার নিকট গেলে মানুষের শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির এমন ভয়, এমন মহত্ত, তাহলে তোমার ভয় ও মহত্ত কেমন হতে পারে। প্রাণীদের অবস্থার প্রতি তাকালে আল্লাহর আনুগত্যের কথা স্মরণ হয়। যে-প্রাণীদের আল্লাহ যে অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, তারা সারা জীবন সেই অবস্থায়ই থাকছে।

আল্লাহ সবচেয়ে বড়

সর্বোপরি কথা হলো আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আমরা যতটুকু ধারণা করি, এর চেয়ে আরো বড়। আমরা গবেষণা করতে-করতে যেখানে গিয়ে আমাদের ধারণা শেষ হয়, তার চেয়ে আরো অনেক বড়। তাকেই বলা হয় 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়'। আযানের শুরুতে চারবার বলা হয় 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়'। এর রহস্য কী? এর রহস্য হলো, মাখলুক মৌলিক চারটি পদার্থ দিয়ে তৈরী। যথা– আগুন, পানি, মাটি, বাতাস। কিছু প্রাণী আগুন দ্বারা তৈরী। যেমন– জিন। এভাবে পানি, মাটি, বাতাস সব পদার্থ দ্বারা একেকটি বস্তু তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং মুয়ায্যিন চারবার 'আল্লাহু আকবার' বলে এ কথার ঘোষণা দেয় যে, এসো ওই পালনকর্তার দিকে, যিনি আগুন ও তার দ্বারা তৈরী বস্তু থেকে শক্তিশালী, যিনি পানি ও তার দ্বারা তৈরী সৃষ্টি থেকে শক্তিবান। যিনি মাটি ও তার দ্বারা তৈরী মাখলুক থেকে শক্তিশালী, যিনি বাতাস ও তার দ্বারা তৈরী বস্তু থেকে শক্তিশালী।

আগুনের শক্তি

আগুন এমন শক্তিশালী বস্তু, যা উত্তেজিত হলে তাকে নিবারণ করা কঠিন হয়ে যায়। আমি একবার রাশিয়া সফর করেছিলাম। সেখানে এক আগুনের কুণ্ড দেখলাম। আল্লাহ মালুম সেটা কত ফার্লং উচুঁ হবে। আমার সাথিকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আগুন কীসের? সে বলল, এখানে তেলের খনি খনন করা হচ্ছিল। ফলে কোনো ত্রুটির কারণে হঠাৎ এই আগুন লেগে যায়। আর এখানে এত স্পিডে তেল বের হচ্ছে যে, আগুনের উচ্চতা অনুমান করা যাচ্ছে না। সারা বিশ্বের বড়-বড় অনেক কোম্পানি এই আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে; কিন্তু তা নেভাতে সক্ষম হচ্ছে না।

পানির শক্তি

আপনারা কোনোদিন পানির শক্তি দেখেছেন? সমুদ্র সফর করার পর যদি সেখানে তুফান এসে যায়, তাহলে অনুমান করা যায় পানির শক্তি কত। পানি বড়-বড় জাহাজকে উল্টে দেয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা টাইটানিক নামক জাহাজ তৈরি করে দাবি করেছিল, এটা কোনো দিন ধ্বংস হবে না। অর্থাৎ– পানিতে নিমজ্জিত হবে না। আল্লাহ্‌র কারিশমা দেখুন। সেই জাহাজ মাত্র একটা তুফানের বাড়ি খেয়ে দুই টুকরো হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেল! প্লাবন আসে; গোটা শহর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। সামান্য একটি তুফান এসেছিল। তাকে সুনামি নাম দেওয়া হলো। সেটা সারা শহর ধ্বংস করে দিল। বিল্ডিংগুলো চুরমার করে দিল। মানুষের কোনো নাম-গন্ধও রইল না। এ হলো পানির শক্তি।

বাতাসারে শক্তি

বাতাসের শক্তি কেমন? আদ জাতির নিজের শক্তির ওপর খুব গর্ব ছিল। তাদের দেহ অনেক বড় ও লম্বা ছিল। তারা বলত

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?'[১]

আল্লাহ তাদের জন্য বাতাসের শাস্তি পাঠিয়ে দিলেন।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

'আমি তাদের ওপর প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম।'[২]

সেই বাতাস মুমিনদের জন্য খুব আরামদায়ক ছিল। তারা বলতে লাগল, আহ! কী মধুর বাতাস। আর কাফেরদের জন্য এমন ছিল যে, বাতাস তাদেরকে জমিনে শুইয়ে দিল। পরের দিন জমিনে তাদের লাশ এভাবে পড়ে রইল যে, আল্লাহ বলেন–

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

'খেজুর কাণ্ডের মতো জমিনে শুয়ে আছে।'[৩]

---

১. হা-মীম আস সাজদা : আয়াত ১৫
২. হা-মীম আস সাজদা : আয়াত ১৬
৩. সূরা আল-হাক্কাহ : আয়াত ১৭

মাটির শক্তি

মাটির মধ্যেও মহা শক্তি রয়েছে। কাশ্মিরে কী হলো? রমজান মাস ছিল। ফজরের নামায পড়ে মানুষ শুয়ে আছে। জমিনে সামান্য একটু ঝাঁকুনি এল। অর্থাৎ– ভূমিকম্প হলো। ফলে সারা এলাকা জমিনে ধসে গেল। আল্লাহু আকবার! এই সৃষ্টির মধ্যে এত শক্তি। অথচ মুয়ায্যিন প্রত্যেকবার বলে, হে লোকসকল! তোমাদেরকে ওই মালিকের দিকে ডাকা হচ্ছে, যার শক্তি আগুন, পানি, মাটি, বাতাস সব কিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, যিনি সেগুলোর সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহর ইচ্ছা সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ

একটি কথা স্মরণ রাখবেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছা সর্বাবস্থায় পূর্ণ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

হযরত আদম (আ.) জান্নাতে বসবাস করছেন। মনে-মনে ভাবছেন, চিরকাল জান্নাতে থাকব আর আল্লাহ চাচ্ছেন, তাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। শয়তান এসে পরামর্শ দিল, এই গাছটার ফল খেয়ে নাও; স্থায়ীভাবে জান্নাতে বাস করবে। হযরত আদম (আ.) ফল খেয়ে নিলেন। পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হলো। এবার জান্নাতে তো বাথরুম নেই। যাও পৃথিবীতে গিয়ে কাজ সারো। পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। কার ইচ্ছা পূর্ণ হলো? আল্লাহর।

হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর পয়গাম্বর। তুফান এসে গেল। কিশতিতে আরোহণ করছেন। নিজের সন্তান সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন–

يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا

'হে আমার সন্তান! আমাদের সঙ্গে কিশতিতে আরোহণ করো।'[১]

ছেলে শুনি না শুনি না ভাব ধরল। কোনো কথা বলছে না। বর্তমানেও এরকম হয়ে থাকে। পিতা দীনের কিশতিতে আরোহণ করছে আর সন্তান পাপাচারের তুফানে নিমজ্জিত হচ্ছে। পিতা বলে, হে সন্তান! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো। পুণ্যবান হও। হযরত নূহ (আ.) সন্তানকে আহ্বান করছেন আর সে অস্বীকার করছে–

سَآوِيْ إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৪২

'আমি পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে মুক্তি দেবে।'[১]

পরিশেষে কী হলো?

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

'তাদের উভয়ের মাঝে পানির বিরাট একটা ঢেউ প্রতিবন্ধক হয়ে গেল। পিতার সামনে সন্তান ডুবে মরল।'[২]

এখানে কার ইচ্ছা পূর্ণ হলো? আল্লাহর।

একবার নবীজি মনে-মনে সংকল্প করলেন, আমি মধু খাব না। কেননা এর মধ্যে বিশেষ ধরনের এক প্রকার গন্ধ আসে। এই সংকল্প করার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসাপূর্ণ সম্বোধন এল–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

'(বর্জন) করছেন কেন? যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান।'[৩]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবীজি পুনরায় মধু ব্যবহার করা শুরু করেন। সুতরাং কার ইচ্ছা পূর্ণ হলো? আল্লাহর। ভাই! আমাদের হৃদয়ে একথা স্থাপন করা চাই যে, আল্লাহ মহান। সর্বাবস্থায় তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

মুশরিক ও অহংকারীদের পরিণাম

আল্লাহর সামনে কারো অহংকার চলবে না। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, দুই ব্যক্তি রয়েছে, যাদের ভাগ্যে জান্নাতের সুগন্ধি মিলবে না। জান্নাতে তারা পা রাখতে পারবে না।

এক হলো মুশরিক, যাদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৪৩
২. সূরা হূদ : আয়াত ৪৩
৩. সূরা তাহরীম : আয়াত ১

'নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যেকোনো গোনাহ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন।'[১]

দ্বিতীয় হলো অহংকারী ব্যক্তি। হাদীছে এসেছে, নবীজি ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

'যার হৃদয়ে অণুপরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' অহংকারী বলা হয়, যে নিজেকে বড় মনে করে। আর মুশরিক বলা হয়, যে সৃষ্টির কোনো বস্তুকে বড় মনে করে তাকে সেজদা করে। সুতরাং এদের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সুতরাং আমরা যখন 'আল্লাহু আকবার' বলি, তখন এর উদ্দেশ্য কী? আমিও বড় নই, অন্য কোনো বস্তুও বড় নয়। বড় কে? আল্লাহ, যিনি দৈনিক পাঁচবার আমাদের ডাকেন। তোমরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাক। এতে তোমরা তোমাদের সবক ভুলে যাবে। তাই তোমাদের স্মরণ করে দেওয়া হচ্ছে। দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা শ্রবণ করলে শয়তান পলায়ন করে। একটি হলো আল্লাহু আকবার। হাদীছ শরীফে এসেছে, মুয়ায্যিন যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন শয়তান পলায়ন করে।

দ্বিতীয় বাক্য হলো–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

এ বাক্য পাঠ করলে শয়তান পেছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস ছাড়তে-ছাড়তে পলায়ন করে।

আল্লাহর মাহাত্ম্যের সামনে জিবরাঈল (আ.)-এর অবস্থান

হযরত জিবরাঈল (আ.) এমন বড় হাস্তি, যার ডানা সম্প্রসারণ করলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছেয়ে যায়। জমিনের ওপর দাঁড়ালে তার মাথা আসমান স্পর্শ করে। তাঁর দেহে এ পরিমাণ শক্তি যে, পৃথিবীর এক অংশকে ডানায় ধারণ করে আকাশে নিয়ে সেটাকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছেন। তার গতি এমন যে, বৃষ্টির একটি ফোঁটা জমিন থেকে এক বিঘত উপরে থাকলে সেটা জমিনে পড়ার আগে তিনি আসমান থেকে জমিনে আসতে সক্ষম। নবীজি বলেন, তার মধ্যে আল্লাহর মাহাত্ম্যের এমন ভয় ছিল যে, মাঝে-মাঝে আল্লাহর ভয়ে তার দেহ ক্ষুদ্র চড়ুই পাখির সমতুল্য হয়ে যেত। আল্লাহর সামনে তিনি কাঁপতে শুরু করতেন।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১১৬

সুতরাং ভাই! আমাদের অন্তরেও আল্লাহর মাহাত্ম্যের ভয় স্থাপন করা চাই। তাহলে গোনাহের কাজ বর্জন করা আমাদের জন্য সহজ হবে।

একটি আশ্চর্য বিষয়

সিররি সাকতি (রহ.) বলেন, একবার আমি বয়ান করছিলাম। তখন এক যুবক আমার নিকট এসে বলল, হুজুর! আপনি একটি বাক্য বলেছেন। বললাম, জি বলেছি। কী বাক্য বলেছিলাম? তা হলো

عَجَبًا لِضَعِيْفٍ يَعْصِىْ قَوِيًّا

'আশ্চর্য ওই দুর্বলের ওপর, যে সবলদের অবাধ্যতা করে।'

ভাই! মানুষের চেয়ে দুর্বল কেউ নেই এবং আল্লাহর চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই। কেমন বিস্ময়কর কথা! একজন দুর্বল একজন শক্তিশালীর কথা অমান্য করে। সুতরাং যখন হৃদয়ে আল্লাহর মাহাত্ম্যের ছাপ বসবে, তখন গোনাহের কাজ বর্জন করা সহজ হয়ে যাবে।

অধিক পরিমাণে যিকির করার উদ্দেশ্য

এজন্যই আল্লাহ অধিক পরিমাণে যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন–

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।'[১]

উদ্দেশ্য হলো, মানুষ সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর মাহাত্ম্য নিজের অন্তরে বসাবে। আল্লাহ অনেক বড়। তাহলে দুনিয়ার প্রভাব তাকে পরাজয় করতে পারবে না। এই রাস্তা থেকে তাকে সরাতে পারবে না। তাই মুমিন বিভিন্ন বাহানায় আল্লাহর যিকির করতে থাকে। মাকে দেখো; তিনি যেখানেই থাকেন, সন্তানের আলোচনা করেন। মহব্বতের স্বরে বলেন, আমার ছেলে দুধকে দুধ বলছে। স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা দেখো; স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে; তাই পাঁচ মিনিট সময় পেলে অন্য মহিলার নিকট তার স্বামীর সকল গুণ বর্ণনা করে দেয়।

এভাবেই বান্দা যখন আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা তৈরি করতে পারে, তখন যেখানেই থাকুক আল্লাহর যিকির শুরু করে দেয়। যেখানে যাই সেখানেই

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১

আপনার গুণগান শুরু করে দিই। আল্লাহর যিকির, আল্লাহর মাহাত্ম্য, আল্লাহর অনুকম্পার আলোচনা মুমিনের লক্ষণ।

আল্লাহর রেজিস্ট্রার্ড বান্দা হয়ে যাও

আজ যদি আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপন করতে পার, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাবে। এটি আমাদের ঈমান। এটি বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট রেজিস্ট্রেশন। তুমি আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করেছ। আল্লাহর রেজিস্ট্রার্ড বান্দা হয়েছ। যেমন মনে করুন, একটি স্কুলে ছাত্রদেরকে মিষ্টির পোটলা দেওয়া হচ্ছে। ছাত্ররা লাইন ধরে একটি জানালার পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর জানালার ভেতর থেকে একজন লোক তাদের মিষ্টি দিচ্ছে। একজন-একজন করে সবাই মিষ্টি গ্রহণ করছে। তখন একটি গ্রাম্য ছেলে দেখল, এ জানালার পাশে গেলে মিষ্টির পোটলা পাওয়া যায়। সেও এসে লাইনে দাঁড়াল। ক্রমান্বয়ে তার পালা এল। মিষ্টি বিতরণকারী তার হাতে পোটলা দেবে এমন সময় চিনে ফেলল, এ তো আমাদের স্কুলের ছাত্র নয়! জিজ্ঞেস করল, এই ছেলে! তোমার আইডি কার্ড কোথায়? সে বলল আইডি কার্ড আবার কোন জন্তুর নাম? সেটা কী? বিতরণকারী বলল, এখানে আমাদের স্কুলের রেজিস্ট্রেশনকৃত ছাত্রদের মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। রেজিষ্ট্রেশনের প্রমাণ হিসেবে তাদেরকে আইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে। তোমার যেহেতু আইডি কার্ড নেই, সুতরাং তুমি মিষ্টি পাবে না। বের হও এখান থেকে।

ঠিক তেমনিভাবে ভাই! যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর দরবারে রেজিস্ট্রেশন করেছে। সেই রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী পরকালে পুরস্কার পাবে। আর যদি ওই গ্রাম্য ছেলের মতো রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তাকে বলা হবে Prove your Identiny তোমার আইডি কার্ড দেখাও। তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? দুনিয়াতে কোথায় ছিলে? আইডি কার্ড সংগ্রহ করলে না কেন?

প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর ওপর দৃষ্টি রাখা চাই

মায়ের সাথে যেমন শিশুর গভীর সম্পর্ক থাকে, সর্বাবস্থায় মায়ের নিকট আসে, তেমনিভাবে মুমিন বান্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখে। একবুযুর্গ কারো বাড়িতে মেহমান হলেন। মালিক তার ছোট ছেলেকে বুযুর্গের সামনে নিয়ে এল। তাঁর কাছে কিছু মিষ্টিদ্রব্য ছিল। তিনি সেটা ওই শিশুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। শিশুটি সেটা গ্রহণ করছে না। অথচ শিশুদের মধ্যে

মিষ্টির প্রতি গভীর আগ্রহ থাকে। এটা তাদের জাতিগত চাহিদা। শিশুরা মিষ্টি খায়। তাই শিশুরা মিষ্টির জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। কিন্তু ওই বুযুর্গ যখন তার প্রতি মিষ্টি বাড়িয়ে দিলেন, তখন সে তার পিতার প্রতি তাকাল এবং মিষ্টি গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। দ্বিতীয়বার তিনি মিষ্টি বাড়িয়ে দিলে এবারও সে তার পিতার প্রতি তাকাল। তখন তার পিতা বলল, নাও আব্বু! ইনি আমাদের হুজুর; তোমাকে আদর করে মিষ্টি দিচ্ছেন। তুমি এটা গ্রহণ করো। তখন শিশুটি মিষ্টি গ্রহণ করল।

এতে বুযুর্গের দু-চোখ বয়ে পানি এসে গেল। এবার শিশুর পিতা ওজর প্রকাশ করতে লাগল, হুজুর! এ তো অবুঝ শিশু। তার আচরণে আপনি কিছু মনে করবেন না। সে বোঝেনি; তাই আপনার মিষ্টি গ্রহণ করেনি। আপনি কাঁদবেন না। তার আচরণের জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি বললেন, না-না, ভাই! আমার চোখে এজন্য পানি আসেনি। আমার চোখে পানি আসার কারণ হলো, শিশুটি দুবারই তার পিতার প্রতি তাকিয়েছে। অতঃপর পিতা অনুমতি দেওয়ার পরে সে তা গ্রহণ করেছে। আমার অক্ষেপ লাগছে, আমরা যদি প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের আল্লাহর প্রতি তাকাতাম আর তিনি অনুমতি দিলে আমরা কাজ করতাম; তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হতো। আমরাও তো শহরে ঘোরাফেরা করি। লাল, নীল, সবুজ কত ধরনের মিষ্টি চোখে পড়ে। সেগুলো খেতে মনে চাহিদা হয়। সুতরাং যেভাবে ওই সমস্ত মিষ্টির প্রতি আমাদের লালসা হয়, তেমনিভাবে যদি আমাদের মালিকের প্রেমের প্রতি আমাদের আসক্তি হতো, প্রত্যেক কাজে যদি আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি তাকাতাম!

সুতরাং ভাই! সর্বাবস্থায় আমাদের মালিকের প্রতি তাকানো চাই।

আল্লাহ অবস্থা পরিবর্তনকারী

একটি কথা মনে রাখবেন। আল্লাহ যেভাবে এই সৃষ্টিকুল সৃজন করেছেন, তেমনিভাবে সেগুলোকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ অবস্থা পরিবর্তনকারী। দিন পরিবর্তন হয়। আল্লাহ বলেন–

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'মানুষদের মধ্যে আমি এই দিনগুলো পরিবর্তন করি।'[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪০

কারো ওপর সারা জীবন খুশি থাকে না। কারো জন্য সারা জীবন দুঃখ থাকে না। কেউ সারা জীবন সুস্থ থাকে না। কেউ সারা জীবন অসুস্থ থাকে না। আল্লাহ তাঁর বান্দার অবস্থা পরিবর্তন করেন। দেখা যায়, কারো ওপর কোনো বিপদ এলে সে অস্থির হয়ে যায়। ভাই! বিপদ এলে একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ বলেন–

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ ۝

'হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে যা লিখেছেন তা ব্যতীত তোমাদের ওপর কোনো পেরেশানি আপতিত হয় না।'[১]

সুতরাং বিপদ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তাই বিপদ এলে আল্লাহর প্রতিই রুজু হওয়া চাই। আমরা কী করি? বিপদ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আমরা সেটা দূর করার জন্য মাখলুকের নিকট দৌড়ে যাই। এখানে এসে আমাদের অবস্থা উল্টে যায়। বিপদগ্রস্ত অবস্থায় যারা আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়, আল্লাহ তার অবস্থা সংশোধন করে দেন।

অসহায় অবস্থায় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি

পবিত্র কুরআনে নবীগণের আলোচনা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যেও বিপদাপদ আপতিত হতো। তখন তারা আল্লাহর প্রতি ধাবিত হতেন, আল্লাহর নিকট অশ্রয় গ্রহণ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের অবস্থা পরিশুদ্ধ করে দিতেন। আমরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করব।

আল্লাহর প্রতি হযরত নূহ (আ.)-এর দৃষ্টি

হযরত নূহ (আ.) প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারা যেন আল্লাহর প্রতি রুজু হয়। শেষ পর্যন্ত বললেন–

رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا

'হে আমার রব! আমার সম্প্রদায়কে আমি দিনরাত দাওয়াত দিয়েছি।'[২]

কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কথা মেনে নেয়নি। মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতও হয়নি। অল্প কিছু লোক ঈমান গ্রহণ করেছে। এমনকি হযরত নূহ

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ৫১

২. সূরা নূহ : আয়াত ৫

(আ.) বিরক্ত হয়ে গেলেন। তারা বিভিন্ন প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। এমনকি তিনি যখন কিশতি তৈরি করেন, তখন তারা বলল, হে নূহ! তোমার নৌকা কোথায় চলবে? পাহাড়ে, নাকি সাগরে? এটা কেন বানাচ্ছ? নূহ (আ.) বললেন, তুফান আসবে। সেই তুফান থেকে রক্ষা পেতে বানাচ্ছি। তখন তারা বলল, ঠিক আছে; আমরাও দু'আ করছি, যাতে প্লাবন আসে। কারণ, বালুর ওপর তো তোমার কিশতি চলবে না। তখন হযরত নূহ (আ.) বলেছিলেন–

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

'আজ যেভাবে তোমরা আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করছ, একটা সময় এমন আসবে, যখন আমরা তোমাদের নিয়ে ঠাট্টা করব।'[১]

তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। পাথর নিক্ষেপ করত। এমন ও হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ.) এসে তাকে পাথরের স্তূপ থেকে উদ্ধার করেছেন। কেমন ধৈর্যশীল লোক ছিলেন! আজ আমরা কারো নিকট দু-চার দিন গেলেই ক্লান্ত হয়ে যাই। এক-দুই বছরের কথা নয়, প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত। আল্লাহ্ আকবার!

অন্তরে একটি ব্যথা ও চিন্তা ছিল, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। পরিশেষে তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

'নিশ্চয় নূহ (আ.) আমাকে ডেকেছে। আমি তাঁর ডাকের উত্তম জবাব দিয়েছি।'[২]

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

'আমি তাকে ও তার পরিজনকে মহাসংকট থেকে মুক্তি দিয়েছি।'[৩]

সুতরাং ভাই! সেই সংকট সেই বিপদ থেকে মুক্তিদাতা কে? তিনি একমাত্র আল্লাহ।

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৩৮
২. সূরা সাফফাত : আয়াত ৭৫
৩. সূরা সাফফাত : আয়াত ৭৬

বনী ইসরাইল ও আল্লাহর অনুকম্পা

হযরত নূহ (আ.)-এর পর আল্লাহ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)কে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করলেন। তাঁরা গিয়ে তাকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন। সে ক্ষমতার মোহে তাঁদের ও তাঁদের সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চালাল। পবিত্র কুরআন বলে–

يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

'তারা তাদের ছেলেদের হত্যা করছে আর মেয়েদের জীবিত রাখছে।'[১]

একটু ভেবে দেখুন, সে কত বড় জালেম বাদশাহ ছিল। বর্তমান যুগে যত বড় শক্তিশালী বাদশাহ হোক না কেন কোনো একটি শিশুকে হত্যা করলে পরের দিন তাকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। কিন্তু সে শত-শত নয়–হাজার-হাজার শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস করতে পারছে না। আমি অধম মিশরের কায়রো জাদুঘরে ফেরাউনের কঙ্কাল দেখেছি। আনুমানিক ছয় ফুট লম্বা হবে। ইতিহাস বলে, ফেরাউন বিশ বছর বয়সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ পয়ষট্রি বছর রাজ্য শাসন করে। যৌবনকালেই সে মান্যবর হয়ে ক্ষমতা পেয়েছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে খোদায়ি দাবি এসে যায়। পরিশেষে আল্লাহ তাদেরকে অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ বলেন–

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

'আমি তাদের ডাকে সাড়া দিলাম। তাদের চিন্তা থেকে আমি তাদের নিষ্কৃতি দিলাম। ঈমানদারদের আমি এভাবেই মুক্তি দান করি।'[২]

সুতরাং ভাই! আমরা যদি আল্লাহকে ডাকতে পারি, তাহলে আমাদের সকল চিন্তা, ভাবনা, বিপদ, অস্থিরতা থেকে তিনিই আমাদের মুক্তি দান করবেন। আজ সামান্য কিছু হলেই আমরা কবিরাজের নিকট দৌড়াই। এভাবে ঈমান নষ্ট করার সার্থকতা কী? যেতে হলে শরীয়তের অনুসারী কোনো লোকের কাছে যাও। তাহলে তিনি কমপক্ষে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে তোমার চিকিৎসা করবেন। সুতরাং ভাই! আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া চাই। পেরেশানি যিনি দিয়েছেন, তিনিই নিষ্কৃতি দেবেন।

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৬

২. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৮

মুমিনদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো, যদি আমরা আল্লাহর বিধানের ওপর অটল থাকি, তাহলে তিনি আমাদেরকে সকল বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন।

আল্লাহর প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টি

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে একা। জাতি নমরূদকে খোদা মানে আর মূর্তিপূজা করে। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদের ওপর আমল করছেন। একবার সম্প্রদায়ের সবাই তাদের ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানে যাবে। ইবরাহীম (আ.)কে আহ্বান করল। তিনি বললেন,

إِنِّي سَقِيمٌ

'আমার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। আমি যেতে পারব না।'[১]

বাস্তবেও তাদের গর্হিত আচরণ দেখে তিনি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। সবাই চলে গেল। ইবরাহীম (আ.) সুযোগ পেয়ে একটা কুড়াল হাতে নিলেন।

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ

'তারপর সবগুলো মূর্তিকে চুরমার করে বড় মূর্তির কাঁধে কুড়ালটা রেখে দিলেন।'[২]

সম্প্রদায় ফিরে এসে তাদের মূর্তির এই অবস্থা দেখে বলতে লাগল, একাজটা কে করেছে? তাদের কেউ বলল–

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

'ইবরাহীম নামে এক যুবকের ব্যাপারে আমরা শুনেছি, সে এগুলোর সমালোচনা করে।'[৩]

মনে হয় সে-ই এ কাজ করেছে। তারা ইবরাহীম (আ.)কে ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তোমাদের বড় মূর্তিকে জিজ্ঞেস করো। জবাব শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। সে কী বলছে!

---

১. সূরা সাফফাত : আয়াত ৮৯
২. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৫৮
৩. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৬০

পরিণামে তারা বলল–

حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ

'তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে তোমাদের খোদাকে সাহায্য করো।'[১]

তাদের খোদা কারা? পাথরের তৈরী মূর্তি। পাতলা, মোটা, ছোট, বড় কত খোদা। তখন ইবরাহীম (আ.)-এর পক্ষে কথা বলার মতো কেউ ছিল না।

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, ইবরাহীম (আ.)কে জ্বালানোর জন্য নমরুদ অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল। মহিলারা মানত করল, আমার সন্তান হলে ইবরাহীমকে জ্বালানোর জন্য এত মন লাকড়ির ব্যবস্থা করে দেব। এভাবে লাকড়ির পাহাড় তৈরি হয়ে গেল। তাতে আগুন লাগানো হলো। আগুনের এত তাপ যে, কাছেও যাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে চরকার ব্যবস্থা করে ইবরাহীম (আ.)কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। ইবরাহীম (আ.) নিজের চোখে আগুন দেখছেন। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কোনো ভয় করছেন না। উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবি (রহ.) লিখেছেন–

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ

'সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, ওকে জ্বালিয়ে দাও।'

যখন তাদের সমস্ত দলিল শেষ হয়ে গেল, তখন তারা অত্যাচারের পন্থায় তাঁকে জ্বালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমাদের ক্ষমতার ওপর তো সে কোনো কথা বলতে পারবে না। তাই তারা বলল, জ্বালিয়ে দাও। হাদীছ শরীফে এসেছে, এ কথাটি বলেছিল ইরাকের গ্রাম্য এক কুরদি লোক। ইবনে ওমর (রাযি.) ও মুজাহিদ (রাযি.) বলেন, তার নাম ছিল 'হির্‌ব'। আল্লাহ তাকে জমিনে ধসিয়ে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত সে ধসতে থাকবে। আর চিৎকার করতে থাকবে। এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের বাদশাহ নমরূদ বলেছিল, তোমাদের খোদাকে সাহায্য করো। কারণ, ইবরাহীম তাদের ব্যাপারে অপছন্দনীয় কথা বলেছে, সেগুলোর দোষ বের করেছে যে, তাদের জিজ্ঞেস করো, এদের এই অবস্থা কীভাবে হলো। হাদীছে এসেছে, নমরূদ আশি হাত লম্বা ও চল্লিশ হাত চওড়া একটা গর্ত খনন করাল। সেই গর্তে এক মাস পর্যন্ত লাকড়ি জমা করে তাতে আগুন লাগাল। ইবনে ইসহাক

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৮

(রহ.) বলেন, আগুন এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে, এর ওপর দিয়ে কোনো পাখি অতিক্রম করলে সেটা জ্বলে ছারখার হয়ে নিচে পড়ে যেত। তারপর ইবরাহীম (আ.)কে গ্রেফতার করে হাত-পা বেঁধে কামানের ওপর স্থাপন করল। আরো বলা হয়েছে, ওই সময় ইবলিস মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাদেরকে চরকা বানানোর পরামর্শ দিল। তার এই অবস্থা দেখে আসমান-জমিনের সব কিছু কাঁদতে লাগল। একমাত্র মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছু কেঁদেছে। আগুনের ভয়াবহতা দেখে কোনো বস্তু সেটা বরদাশত করতে পারেনি। কেননা, একজন মানুষ জ্বালানোর জন্য কয়েক ফুট আগুনই যথেষ্ট। অথচ সেটা এমন আগুন ছিল যে, তার নিকট দিয়ে পাখি অতিক্রম করতে পারত না। এরপর হাত-পা বেঁধে তাঁকে চরকায় বসানো হলো। চরকা ঘুরিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করল। তখন আসমান-জমিনের সকল বস্তু কাঁদতে লাগল, হে আল্লাহ! এ পৃথিবীতে একমাত্র ইবরাহীম (আ.) আপনার ইবাদত করছিলেন। আপনার ইবাদত করার অপরাধে আজ তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হে আল্লাহ! আমাদের অনুমতি দাও; আমরা তাকে সাহায্য করব। কোনো মানুষ বিপদে পড়লে হৃদয়বান ব্যক্তিরা যেমনটা বলে থাকে। Cani help you? What cani do for you? আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কি? আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি? তাদের আবেদনের পর আল্লাহ বললেন, আমার ইবরাহীম যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তোমরা তাকে সাহায্য করো; আমি তোমাদের অনুমতি দিলাম। আর যদি সে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকে, তাহলে আমি তার সব কিছু দেখছি। আমি তার তত্ত্বাবধান করছি। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহর প্রতি অন্তর সম্পৃক্ত করলে তিনি সব কিছু দেখেন। তার তত্ত্বাবধান করেন। যখন তারা ইবরাহীম (আ.)কে আগুনে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছায় চরকা থেকে নিক্ষেপ করল, ইবরাহীম (আ.) এখনো বাতাসের মধ্যে আছেন, এমন সময় পানির দায়িত্বশীল ফেরেশতা এসে বললেন, ইবরাহীম! আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনি অনুমতি দিলে আমি এই মুহূর্তে বৃষ্টি বর্ষণ করে আগুন নির্বাপণ করে দেব। ইবরাহীম (আ.) বললেন, আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই। আল্লাহু আকবার!

ঈমানের অবস্থা দেখুন! বাতাসের ফেরেশতা আগমন করলেন। ইবরাহীম! আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রবল বাতাস প্রেরণ করে আগুন নিভিয়ে দেব। ইবরাহীম (আ.) বললেন, আপনাদের কাছে আমার কোনো

প্রয়োজন নেই। দেখুন, বাহ্যিক উপকরণ থেকে কেমন বিমুখ হয়েছেন! ঈমানের দৃঢ়তা কতখানি! শূন্যেই আছেন। আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আকাশে আপনি একা আর জমিনে আপনার নাম উচ্চারণ করার মতো আমি একা। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট। আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণকারী। আল্লাহু আকবার!

কেমন ঈমান! কেমন ভরসা! চরকা থেকে নিক্ষেপ করা হয়ে গেছে। শূন্যে আছেন। নিচে আগুন। এ-সময়ও আগুনের প্রতি কোনো তোয়াক্কা নেই। আমার আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। হযরত উবাই ইবনে কা'ব নবীজি থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)কে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তুমি সমস্ত জাহানের পালনকর্তা। সকল প্রশংসা তোমার জন্য। সমস্ত বাদশাহি তোমার জন্য। তোমার কোনো শরীক নেই। এরপর তারা তাঁকে কামানে বসিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করল। তখন জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন। পানির দায়িত্বশীল ফেরেশতার সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। বাতাসের ফেরেশতার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন। জিবরাঈল (আ.), যাঁর ডিউটিই হলো নবীদের সাহায্য করা। তিনি আরজ করলেন, হে ইবরাহীম! আপনাকে আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি? ইবরাহীম (আ.) বললেন, যদি তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে এসে থাক, তাহলে তোমাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইবরাহীম! তাহলে তোমার প্রভুর দরবারে সাহায্যের আবেদন করো। তখন ইবরাহীম (আ.) বিস্ময়কর জবাব দিলেন। আবেদনের চেয়ে একথা-ই যথেষ্ট যে, আমি যে-অবস্থায়ই আছি, আমার মালিক আমাকে দেখছেন। তখন আল্লাহ বললেন, কথা বলার ক্ষেত্রে ইবরাহীম অত্যন্ত সত্যবাদী। আল্লাহ আগুনকে সোজা হুকুম দিলেন–

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

'হে আগুন! আমার খলিল ইবরাহীমের জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাও।'[১]

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, আগুনের নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা হয়ে গেল। না গরম, না ঠান্ডা। বর্তমান যুগের এয়ারকন্ডিশনের মতো মনে করুন।

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৯

গরমেরও অনুভব করা যায় না। অতি ঠান্ডাও উপলব্ধি করা যায় না। আগুন ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য আরামদায়ক হয়ে গেল। হযরত আবুল আলিয়া বলেন, যদি আল্লাহ برد এর সঙ্গে سلاما না বলতেন, তাহলে আগুন অতি শীতল হয়ে যেত। ফলে ইবরাহীমকে সেই শীতলতার জন্য পুনরায় আল্লাহর নিকট আবার প্রার্থনা করতে হতো। আর যদি على ابراهم না বলতেন, তাহলে আগুন কেয়ামত পর্যন্ত শীতল হয়ে যেত।

কোনো-কোনো মুফাসসির বলেন, আল্লাহ জান্নাত থেকে একটি রেশমি চাদর প্রেরণ করে আগুনের ভেতর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং হযরত জিবরাঈল, মিকাইল, শীতলের দায়িত্বশীল ও আরামের দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, যদি برد এর পর سلاما না বলতেন, তাহলে সেই ঠান্ডার কারণে ইবরাহীম (আ.) মরে যেতেন। মুফাসসিরীনে কেরাম আরো বলেন, সেদিন পৃথিবীর সকল আগুনই নিভে গিয়েছিল। কারণ, সকল আগুনই মনে করেছিল, এ নির্দেশ মনে হয় আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই আগুনের সমস্ত লাকড়িকে হুকুম দিয়েছিলেন, তোমরা সকলেই নিজ-নিজ গাছে গিয়ে নিজের অবস্থান গ্রহণ করো। হযরত কাতাদাহ (রহ.) বলেন, সেদিন একমাত্র চিল ব্যতীত কোনো প্রাণী বাকি ছিল না, যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা করেনি। চিল আগুন নেভানোর পরিবর্তে আগুন বৃদ্ধির জন্য ফুঁ দিয়েছিল। এজন্যই নবীজি চিলকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার নাম فويسقة রেখেছেন। হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, সেদিন পৃথিবীর সমস্ত আগুন নিভে গিয়েছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। পৃথিবীর বাহ্যিক উপকরণ না থাকলেও আল্লাহ আসবাবপত্রকে নির্দেশ দেন, তোমরা আমার বান্দার অনুকূল হয়ে যাও। সুতরাং ভাই! এখানে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা সর্বদা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখব। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা রাখব। কেননা, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সর্বাবস্থায় সত্য প্রমাণিত হবে।

হযরত মূসা (আ.) ও আল্লাহর হেফাযত

আল্লাহ যখন হযরত মূসা (আ.)কে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, তখন আল্লাহ বলেছিলেন–

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

'তোমরা দুজন ভয় পেও না; আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। সে যা বলবে, আমি শুনব এবং সে যা করবে, তা আমি দেখব।'[১]

অর্থাৎ– যখন সবকিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা তোমাদের সঙ্গে আছেন; তাহলে তোমাদের ভয় কীসের। এমনিভাবে প্রত্যেক মুমিনের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, যারা আল্লাহর নির্দেশ মানবে, আল্লাহর বিধানমতো চলবে, যে কেউ তাদের সঙ্গে টক্কর নেবে, আল্লাহ তাদের দেখবেন এবং যা বলবে, তা শুনবেন। আর আল্লাহ যখন সঙ্গে থাকবেন, তখন আমাদের অস্থিরতা কীসের? আল্লাহ তার ঈমানদার বান্দাদের এজন্যই সান্ত্বনা দেন, যাতে তারা শান্ত হয়ে যায়। বাহ্যিক চোখে যা দেখা যায় এর ওপর ফয়সালা করবেন না। বরং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি ভরসা রাখুন। এটিই ঈমানের চাহিদা।

শেষ নবী ও আল্লাহর হেফাযত

নবীজি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করলেন, তখন একমাত্র কোরাইশ ব্যতীত সকল গোত্রের লোক একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল, আমরা প্রত্যেক গোত্রের লোক মিলিত হয়ে তার বাড়ি ঘেরাও করে রাখব, সকালে নামাযের জন্য বের হলে সবাই একসঙ্গে হামলা করে আমরা তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব। তাহলে কোরাইশরা আমাদের সকল গোত্র থেকে এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হবে। তাদের এই প্লান ছিল।

আর আল্লাহ বলেন–

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

'এবং স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আপনাকে ঘেরাও করে রাখবে অথবা আপনাকে শহীদ করে দেবে অথবা আপনাকে দেশান্তর করবে। তারা ষড়যন্ত্র করল। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে কৌশল করলেন। আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম কৌশলী।'[২]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৬

২. সূরা আনফাল : আয়াত ৩০

পরিশেষে নবীজি নিজঘর থেকে সহীহ-সালামতে বেরিয়ে এলেন। তারা টেরও পেল না। এরপর সাওর গুহায় আশ্রয় নিলেন। সকালে যখন তারা জানতে পারল, নবীজি চলে গেছেন, তখন নবীজির সন্ধানদাতার জন্য তারা দুইশ উট পুরস্কার ঘোষণা করল। সেই ঘোষণা শুনে মক্কার এমন কোনো গোত্র কিংবা ঘর বাকি রইল না, যার যুবকরা নবীজির খুঁজে বের হয়নি। তারা সাওর পর্বতেও পৌঁছে গেল। কিন্তু আল্লাহ নবীজিকে হেফাযত করেছেন। নবীজিকে কীভাবে হেফাযত করা হলো, সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যে-রাতে নবীজি গুহায় আশ্রয় নিলেন, সেদিন আল্লাহ একটি চারা গাছকে হুকুম দিলেন। আল্লাহর হুকুমে গুহার প্রবেশপথে চারা গাছ গজিয়ে উঠল। মাকড়শাকে হুকুম দিলে সে গুহার প্রবেশদ্বারে এসে বাসা বেঁধে নিল। প্রত্যেক গোত্র থেকে ৬৩ জন যুবক নিজ-নিজ লাঠি ও তারবারি হাতে নিয়ে বের হলো। সন্ধান করতে-করতে তারা সাওর পর্বতে পৌঁছে গেল। নবীজির গুহা থেকে তারা চল্লিশ হাত দূরে ছিল। এদের একজন তার ঘোড়া থেকে নেমে গুহার নিকট গেল। সেখানে গিয়ে সে গুহার প্রবেশপথে মাকড়শার জাল ও জংলি কবুতর দেখে ফিরে এল। সাথিরা জিজ্ঞেস করল, তুমি গুহার ভেতরে প্রবেশ করনি কেন? সে বলল, গুহার প্রবেশদ্বারে দুটি কবুতর বাসা বেঁধে বসে আছে। যদি এ গুহায় কোনো মানুষ থাকত, তাহলে এখানে কবুতরের নীড় ও মাকড়শার জাল থাকত না। সুতরাং এর ভেতরে দেখার প্রয়োজন নেই। নবীজি গুহা থেকে তাদের আলাপন শুনছেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, আল্লাহ তাদের গতি এ দিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ভাই! এ পৃথিবীতে মাকড়শার জাল সবচেয়ে দুর্বল। আল্লাহ নিজেই বলেছেন–

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ

'নিশ্চয় সবচেয়ে দুর্বল ঘর হচ্ছে মাকড়শার ঘর।'[১]

এর দ্বারা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, হে মানবসকল! আমি যদি রক্ষা করতে চাই, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেওয়াল দ্বারা হেফাযত করি, তবে সেটা ডিঙিয়ে যেতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিও ব্যর্থ। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে একটি আশ্চর্য কথা লিখছেন– 'হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) নবীজির সঙ্গে গুহায় ছিলেন। তাঁর তৃষ্ণা অনুভব হচ্ছে।

---

১. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৪১

নবীজি বললেন, গুহার প্রবেশদ্বারে যাও। তিনি গুহার দ্বারে গিয়ে মধুর চেয়ে মিষ্টি, দুধের চেয়ে সাদা, মেশকের চেয়ে সুঘ্রাণযুক্ত পানি পান করে এসেছেন। নবীজি বললেন, আল্লাহ জান্নাতে ঝরনার দায়িত্বশীল ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তোমার পিপাসা নিবারণের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসের ঝরনা থেকে একটি নালা এ গুহা পর্যন্ত জারি করে দিয়েছেন।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ এভাবেই সাহায্য করেন। আল্লাহর সাহায্য অদ্ভুত বিষয়। যদি আমরা আল্লাহর নির্দেশের ওপর অটল থাকি, তাহলে আমরা যে-অবস্থায়ই থাকি, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। অতএব, আজকে এ সবক নাও যে, আমাদের দৃষ্টি কার ওপর থাকবে? আল্লাহর সত্তার ওপর। এদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আল্লাহর ওপর ভরসাকারী হয়ে যাও। সকল অসাধ্য বিষয়ে এটা আমাদের উপকারে আসবে। বিপদাপদ ও চিন্তাভাবনা থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন।

সত্য প্রভুর সত্য ওয়াদা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মুমিন বান্দাদের সঙ্গে কতিপয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আশা করি, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ

'আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।'[১]

আমাদের শত্রু কারা তা আমরা জানি না। আমাদের দৃষ্টিতে বন্ধু মনে হয়; কিন্তু বন্ধুবেশে আমাদের দুশমনি করে। এটা মানুষের নিয়তের ব্যাপার। সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। বর্তমান যুগের অবস্থা তো এমন যে, কাফেররা আমাদের বন্ধু সেজে শত্রুতা করছে। বেশি কাছে এসে বেশি ক্ষতি করে। বাহ্যিকভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী বুঝিয়ে তলে দিয়ে গোড়া কেটে দেয়। সুতরাং আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা বুঝতে পার না তোমাদের বন্ধু ও শত্রু কারা। সামনে আল্লাহ বলেন–

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

'আল্লাহ কখনো কাফেরদেরকে মুমিন পর্যন্ত পৌঁছতে দেন না।'[২]

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৪৫

২. সূরা নিসা : আয়াত ১৪১

যেমন– কোনো ব্যক্তি অন্য কারো সন্তানকে মারতে চাইল। তখন সেই সন্তানের পিতা বলল, মিয়া! তুমি আমার ছেলেকে মারতে চাও! আমি থাকতে আমার ছেলের ওপর একটি বেত্রাঘাতও করতে দেব না। তুমি আমার লাশের ওপর দিয়ে যেতে পার; তবু আমার ছেলেকে প্রহার করতে পারবে না। আয়াতের মর্ম হুবহু এরকম। অর্থাৎ– হে ঈমানদারগণ! কেউ তোমাদের অনিষ্ট করতে হলে সে আগে আমার মুখোমুখী হতে হবে। তারপর তোমাদের নিকট পৌঁছবে। মুরগি তার বাচ্চাদের নিয়ে কচুবনে আহার করছে। তখন বিড়াল এসে তার বাচ্চাদের আক্রমণ করতে চাইল। এমন সময় মুরগি তার ডানা প্রসারিত করে বিড়ালের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। উদ্দেশ্য কী? বিড়ালকে মারবে? না; উদ্দেশ্য হলো, যদি তুমি আমার বাচ্চাদের কিছু করতে চাও, তাহলে প্রথমে আমাকে মারো; তারপর আমার বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ করো। আমি থাকতে আমার বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ করতে দেব না।

সুতরাং ভাই! মায়ের ভালোবাসা যদি এরকম হয়, তাহলে ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা অনুমান করতে পারেন। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, যদি কাফেররা তোমাদের কাছে আসতে চায়, তাহলে আমি তাদের পথে বাধা হয়ে যাই। ফলে তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয় না। তারপর সামনে আল্লাহ আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন–

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'নিশ্চয় পার্থিব জীবনে রাসূল ও তার সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'[১]

এবং পরকালেও। এ হলো আয়াতের শাব্দিক অর্থ। সহজে বোঝার জন্য আমাদের ভাষায় বলছি যে, রাসূল ও মুমিনদের সাহায্য করা আমার ওপর ফরজ। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখবেন। আল্লাহর ওপর কোনো কিছু ফরজ নয়। তবে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে আয়াতের ভাবার্থ অনুযায়ী আমি আপনাদের ফরজ শব্দ দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি। অর্থাৎ– আল্লাহ রাসূল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন। এটি পৃথিবীর কোনো নেতার ওয়াদা নয় যে, আজ বলবে, কাল তার ব্যতিক্রম করবে। এটি মহাপরাক্রশালী আল্লাহর বাণী। এটি রাজাধীরাজের কথা যে, আমি আমার রাসূল ও মুমিনগণকে সাহায্য করব।

---

১. সূরা মুমিন : আয়াত ৫১

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য

ইয়ারমুকের যুদ্ধের এমন একটা সময় হয়েছিল যখন খ্রিস্টানদের ভিড়ের মধ্যে মুসলমানদের দেখা-ই যেত না। অর্থাৎ– মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সম্পূর্ণ সাদা ঘোড়ার মধ্যে কালো রেখা থাকলে যেমন দেখায়, মুসলমানদের সংখ্যা এমন ছিল। ধরুন, মুসলমানদের সংখ্যা ছিল পাঁচ-সাত হাজার আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। যুদ্ধ শুরু হলো। এমতাবস্থায় মুসলিম সেনাপতি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর দরবারে চিঠি লিখলেন, আমাদের সংখ্যা খুবই কম; অনুগ্রহপূর্বক কিছু সৈন্য প্রেরণ করুন। হযরত ওমর (রাযি.) চিঠির জবাব লিখলেন এবং নবীজির সান্নিধ্যের হক আদায় করলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন–

قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْضَرُ جُنْدًا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِرُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هٰذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي

তোমাদের চিঠি আমার নিকট পৌঁছেছে, যাতে তোমরা আমার নিকট সাহায্য চেয়েছ। আমি তোমাদেরকে ওই সত্তার সন্ধান দিচ্ছি, যিনি সবচেয়ে উত্তম সৈনিক লালনকারী। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর নিকট সাহায্য চাও। বদরের যুদ্ধে নবীজি তোমাদের থেকে সংখ্যায় কম ছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে সাহায্য করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। চিঠি তোমাদের নিকট পৌঁছলে তোমরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরে আর এ-ব্যাপারটা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর চিঠি তাদের হাতে পৌঁছলে, তারা পরের দিন সকলে একত্রিত হয়ে কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ের সাথে কিনারায় পৌঁছান, হযরত ওমর (রাযি.) জানতেন, এটা স্বল্প ও আধিক্যের কোনো ব্যাপার নয়। এখানে আল্লাহর সাহায্যই মূল। যাদের জিহাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য সাথি হবে, তার পাল্লা ভারী হবে। সুতরাং তিনি আমাদের শিক্ষা দিলেন, আজও যদি আমরা মজবুত ইমানের সঙ্গে অটল থাকতে পারি, তাহলে আল্লাহর সাহায্য আমাদের সাথি হবে। আর আল্লাহর সাহায্য এসে গেলে কল্যাণের শেষ নেই। শত বছরের বাস্তব দৃশ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। মহাশক্তিকে আল্লাহ তুচ্ছ বানিয়ে দেবেন। সুতরাং ভাই! এই ঈমান খুব মূল্যবান বস্তু।

বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য

বদর যুদ্ধে আল্লাহ সাহাবাদের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

'নিশ্চয় বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করা হয়েছে। অথচ তোমরা স্বল্প ছিলে।'[১]

দুটা তলোয়ার, সত্তরটা ঘোড়া এবং কতিপয় লোকের হাতে গাছের ডাল ছিল। এক হাজার সৈনিকের মোকাবেলার ৩১৩ জন মুজাহিদ দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের দেখে ভাবলেন, আমরা তো নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি। পবিত্র কুরআন বলে–

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۫ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝
يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

'যেভাবে তোমাকে তোমার পালনকর্তা ন্যায় ও সৎকাজের জন্য বের করেছিলেন; অথচ ঈমানদারদের একটি দল তাতে সম্মত ছিল না। তারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয় নিয়ে তা প্রকাশিত হওয়ার পর। তারা যেন দেখতে-দেখতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।'[২]

সাহাবায়ে কেরাম স্বচক্ষে মৃত্যু দেখছেন। এবার ভেবে দেখুন, ওই সময় মানুষের অবস্থা কী হতে পারে। কিন্তু ওই সময়ও আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছেন। তিনি স্বল্প ও আধিক্য দেখেন না। তিনি বাহ্যিক উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তারা ওই সমস্ত লোক, যাদের মধ্যে ছিল যুদ্ধের পোশাকপরিহিত, হাতে তলোয়ার, বর্শা ও তির। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রাখছেন। বদরের রাতে নবীজি তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছেন। হযরত আবুবকর (রাযি.) তাঁবুর বাইরে প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছেন। নবীজি দু'আ করলেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ اَللّٰهُمَّ
إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৩
২. সূরা আনফাল : আয়াত ৫, ৬

'হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতির দোহাই দিচ্ছি। তিনি ভরসা রাখছেন, আল্লাহ আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই বলছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদার দোহাই দিচ্ছি।' তারপর আরজ করলেন–

اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ

'হে আল্লাহ! আপনি যদি চান, আজকের পর আর আপনার ইবাদতকারী কেউ না থাকুক...।'

হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা-ই তো প্রতিফলিত হয়। তারপর বললেন–

فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) সামনে এগিয়ে রাসূলের হাত ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য এ দু'আ-ই যথেষ্ট। আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট বারবার প্রার্থনা করার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। কেমন আশ্চর্য দু'আ করলেন। অর্থাৎ– হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল, এবার আল্লাহর সাহায্য আসবেই। বাস্তবেও তা-ই হলো। সকাল হলো। আল্লাহ বলেন–

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

'সেই দল পরাজিত হলো আর পশ্চাদ পানে পলায়ন করল। ওই সময় আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করে বিজয় দান করেছেন।'[১]

শাহনামায়ে ইসলাম

আল্লামা হানীফ জলন্দরি (রহ.) শাহনামায়ে ইসলাম রচনা করেছেন। যুবকদের এটি পাঠ করা জরুরি। সাহাবায়ে কেরাম যখন নবীজির সঙ্গে বদর প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন সেখানকার পাহাড়ের অবস্থা কী হয়েছিল? আল্লামা হানীফ জলন্ধরি কবিতার ভাষায় লিখেছেন–

- এ তৃষ্ণার্ত জামাত যখন এখানে এসে প্রতিষেধক হয়ে অবস্থান নিল, তখন বালুকাময় প্রান্তর তার আঁচল বিছিয়ে সম্প্রসারিত করে প্রার্থনা করল।
- হে মরুভূমিকে অগ্নিবান অবয়ব দানকারী, সূর্যের চেহারাকে কিরণের আলো দানকারী।

---

১. সূরা কামার : আয়াত ৪৫

• সৃষ্টির সূচনা থেকে আমি পাহাড়ে অবস্থান করছি। বৃষ্টির গর্জন আমি দূর থেকে শ্রবণ করি।

• সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আমার প্রাণ পানি সন্ধান করছে। আমার বুকে আগুনের বাদল বর্ষিত হয়।

• আমি বুঝেছি, আমার ভাগ্যে রোদের তাপ নির্ধারিত। আমার ভাগ্যে লেখা হয়েছে জ্বলন।

• ধীরে-ধীরে আমার প্রকৃতি আমি এমন করে গড়ে নিয়েছি যে, সকল নির্বোধের নিকট থেকে জোরপূর্বক আপনার ট্যাক্স আদায় করছি।

• আমি কি জানতাম হে আমার মালিক যে, একদিন আপনার কাওসার পরিবেশনকারী এখানে আগমন করবেন!

• যদি পূর্ব থেকে এ সংবাদ জানতাম, তাহলে আমার হৃদয়ের সকল ব্যথা নিজে-নিজেই নিঃশেষ হয়ে যেত।

• আমার কি খবর ছিল, আপনার নামাযী বান্দারা এখানে এসে অবস্থান করবেন? শহীদগণ বিশ্রাম করবেন আর গাজীগণ দাঁড়াবেন?

• আমার কি অনুভূতি ছিল, এই সৌভাগ্য আমার হবে। আমার আঁচলকে সৌভাগ্যের বিছানা বানানো হবে।

• যদি জানতাম, তাহলে শিশিরের ফোঁটা জমা করে রাখতাম। সবগুলোকে একটা কোণে লুকিয়ে একটি হাউজে ভরে সেই পানি আজও সম্মানিত মেহমানকে পান করাতাম। আজ আমার তৃষ্ণা আমি সম্মানিত মেহমানের চেহারা দর্শনে মেটাচ্ছি।

• আমার মাথার ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছিল নূহ (আ.)-এর প্লাবন। আফসোস! ওই সময় আমার বোকামি হয়ে গেছে।

• এ-সময় যদি আমার পানি সম্পর্কে একটু অনুভূতি থাকত, তাহলে আমার চোখে আজ ঝরনা প্রবাহিত হতো।

• এই সত্তরটা উট আর দুটা ঘোড়া আজ আমার ঝরনা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করত। মুজাহিদগণও সেখানে উজু-গোসল করতেন।

• তোমার মাহবুবের প্রিয় কদম আজ এ মাটিতে পড়েছে। হে আল্লাহ! আপনি সূর্যকে নির্দেশ দিন, সে যেন আজ অগ্নি না ঝরায়।

• আজ যদি আমার আঁচল থেকে উষ্ণ তাপ প্রকাশ পায়, তাহলে রাহমাতুল্লিল আলামীনের কাছে আমার লজ্জা হবে।

• হে মহামহিম! মেহমানের খাতিরে অনুগ্রহ করো। তাদের উজুর জন্য একটু পানি দান করো।

• কয়েক মুহূর্তের জন্য বৃষ্টির মেঘকে প্রেরণ করো, বসন্ত পাঠিয়ে দাও। হে আমার মালিক! হে আমার মালিক!

• কাওছারের পরিবেশনকারীর সামনে আমার কিছু সম্মান থাকবে। আমার ইজ্জত, আমার সম্ভ্রম আজ অটুট থাকবে।

• বন্ধুগণ! এ পাহাড় যেন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনার হাবীবের সামনে আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার কাছে তো শুকনা খরখুটা ও বালু ছাড়া কিছুই নেই।

পরের দিন আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে নিজের ওয়াদা পূর্ণ করলেন। আল্লাহ যদি কাউকে সেখানে যাওয়ার তাওফীক দান করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, একটা পাহাড় যার ওপর ফেরেশতারা নাযিল হয়েছিলেন, আরেকটা পাহাড়, যার পার্শ্বে নবীজি অবস্থান করেছিলেন। অন্যদিকে রয়েছে উন্মুক্ত মাঠ, যেখানে কাফের গোষ্ঠী অবস্থান করেছিল। তাদের শক্তির ওপর তাদের খুব গর্ব ছিল। পরিশেষে আল্লাহ এমন সাহায্য করলেন যে, মুসলমানরা বিজয়ী হলো। সেই বিজয় একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই সাধিত হয়েছে। বর্তমানেও যদি আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা রাখি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ওই রকম সাহায্য করতে এখনো সামর্থ্যবান আছেন, যেভাবে তিনি তাঁর নবীগণ ও সাহাবায়ে কেরামকে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আহযাব যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য

মক্কায় কাফের গোষ্ঠী সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে পরামর্শ করল, আমরা সকল সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে মদিনা আক্রমণ করে মুসলমানদের শেষ করে দেব। তবেই মুসলমানদের তৎপরতা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং সমস্ত কাফের গোষ্ঠী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মদিনায় আগমন করল। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিল। এটা এ রকম মনে করুন যে, সারা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। লোকজন তাদের একতা দেখে এসে মুসলমানদের বলতে লাগল–

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

'তোমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো।'[১]

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ওই জামাত ছিলেন

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا

'তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল।'[২]

বর্তমান যুগের অবস্থাকে ওই সময়ের সঙ্গে একটু অনুমান করুন। তখন মক্কায় কাফেররা সারা দুনিয়ার সমর্থন নিয়ে মদিনায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। আর ওই ইহুদিরা-ই মুসলমানদের ভয় দেখাল, সারা দুনিয়ার মানুষ একত্রিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আসছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো। এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা করো। কিন্তু তা শুনে মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর সাহায্য আমাদের সঙ্গে আছে। তারা বললেন–

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি আমাদের উত্তম দায়িত্ববান।'[৩]

বর্তমানেও সমস্ত কাফের গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে দুনিয়া থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি বিরাট শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহর সত্তার ওপর বিশ্বাস রাখি আর দীনের ওপর অটল থাকি, তাহলে তারা আমাদের একটি চুলও নড়াতে পারবে না। অবস্থা যে-রকমই হোক আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা চাই।

আমাদের জন্য এক আল্লাহই যথেষ্ট

আমাদের চেষ্টা রাখতে হবে, আমরা গোনাহের কাজ পরিহার করে তাওবার মাধ্যমে আমাদের পালকর্তাকে খুশি করব। যখন আমরা তাঁকে রাজি করতে পারব, তখন জেনে রেখো, আমাদের সাহায্য করা আল্লাহর ওয়াদা। তাহলে ঈমানদারদেরকে দুনিয়ার থেকে কেউ বিলীন করতে পারবে না।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩
৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩

আল্লাহ বলেন–

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ

'হে মুমিনগণ! আল্লাহর সাহায্যের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করো এবং এমন অনুগ্রহের সঙ্গে, যাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করতে পারেনি।'[১]

وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

'আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করো। আল্লাহ মহান দয়াবান।'[২]

এরপর আল্লাহ আরেকটি বিষয় বোঝাতে যাচ্ছেন–

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'এই শয়তান, যে তার বন্ধুদের মাধ্যমে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না এবং আমাকে ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হও।'[৩]

সুতরাং ভাই! আমরা কাকে ভয় করব? একমাত্র আল্লাহকে।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত

এক হাদীছে নবীজিও এই শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, একবার আমি নবীজির পেছনে সাওয়ারির ওপর উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি ইরশাদ করলেন–

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

হে ছেলে! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো; তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। অর্থাৎ– তুমি আল্লাহর প্রতি ধ্যান রাখো; তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর কথা মান্য করো, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কোনো কিছু প্রর্থনা করবে, তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো। সাহায্য চাইলে আল্লাহর নিকট সাহায্য

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৪
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৪
৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৫

চাও। স্মরণ রাখো, সারা বিশ্ব তোমার সাহায্যের জন্য একত্রিত হলে তারা ওই সাহায্যই পৌঁছাতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর সারা দুনিয়া তোমার ক্ষতি সাধনের জন্য একত্রিত হলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তবে তিনি তোমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন। ভাগ্য লেখার পর কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং রেজিষ্টার খাতার কালি শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ– আল্লাহ যা লিখেছেন, তা হবেই। সুতরাং সারা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোনো উপকারও করতে পারবে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না। কিছু হলে আল্লাহর ইচ্ছায়ই হবে।

সুতরাং ভাই! আমরা সাহায্য চাইলে কার কাছে চাইব? আল্লাহর কাছে।

আল্লাহর কাছে চাওয়ার পদ্ধতি

যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলল, আমাদের ওপর এ বিপদ তোমার আগমনের পূর্বেও ছিল, তুমি আসার পরে ও আসছে–

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

'তারা বলল, আমরা নির্যাতত হয়েছি তোমার আসর পূর্বেও এবং তোমার আসার পরেও।'[১]

তখন হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন–

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا

'মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ করো।'[২]

এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধরো। সুতরাং যখন তারা ধৈর্য ধারণ করল এবং আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইল, তখন আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করলেন। আমাদেরকেও সেই নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন বলে–

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

'সাহায্য চাও ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে।'[৩]

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৯
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৮
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৩

সুবহানাল্লাহ! সাহায্য চাওয়ার পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম কথা বলা হয়েছে, নিজের মধ্যে ধৈর্য ও সংযম প্রতিষ্ঠিত করো। দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। সুবহানাল্লাহ! আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কল্যাণের জন্য ২৩ বছর কেঁদেছেন। কোনো মা, কোনো বাপ তার সন্তানের জন্য ২৩ বছর কাঁদবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আমাদের নেতা উম্মতের জন্য তেইশ বছর কেঁদেছেন। এরপরও আমাদেরকে নিরাশ্রয় করে ছেড়ে যাননি। আমি চলে যাওয়ার পর তোমাদের ওপর কোনো প্রকার সংকট আবির্ভূত হলে তোমরা নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাইবে। কোনো অফিসে কাজ করাতে চাইলে Application আবেদন করতে হয়। হজে যেতে হলেও আবেদন করো, ভিসা পেতে হলেও আবেদন করো। এমনিভাবে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হলেও আগে Application করো। সেই Application এর নাম হচ্ছে নামায। আমাদের পূর্বসূরীদের আদর্শ ছিল, কোনো সংকট দেখা দিলেই উজু করে দু-রাকাত নামায আদায় করতেন। তারপর আল্লাহর দরবারে সাহায্যের প্রার্থনা করতেন। ভাই! এভাবে দু-রাকাত নামায আদায় করে সাহায্য প্রার্থনা করা একটি পদ্ধতি। আফসোস! যদি এই অবস্থাটা আমাদের জীবনের একটি অংশ বানিয়ে নিতে পারতাম। তাহাজ্জুদের দু-চার রাকাত নামায ব্যতীত যদি আমাদের কোনো রাত অতিবাহিত না হতো। আমরা রাতে উঠে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব। তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

ফজরের সুন্নতের ওপর তিনটি পুরস্কার

বাস্তবেও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়াতে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি ফজরের সুন্নত নামায নিজঘরে আদায় করে মসজিদে যাবে, আল্লাহ তাকে তিনটি পুরস্কার দান করবেন। একদিকে সেই সুন্নত নামায স্বয়ং। দ্বিতীয় নিজঘরে আদায় করে যাওয়া আরেকটি সুন্নত। সেই নামাযের তিনটি পুরস্কার–

১. তার পারিবারিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেন। বর্তমানে দেখুন, প্রায় ৯০% লোক বলে, আমাদের পরিবারে মহা বিপদ! সন্তান অবাধ্য হচ্ছে। স্ত্রীর কারণে অশান্তি লেগেই আছে। ঘরের প্রয়োজন সংকুলান করা যাচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল নেই। সুতরাং প্রথম পুরস্কার হলো আল্লাহ পারিবারিক সমস্যা নিরসন করে দেন।

২. যে-ব্যক্তি ফজরের সুন্নত ঘরে আদায় করে মসজিদে যাবে, আল্লাহ তার রিযিক প্রশস্ত করে দেবেন। অর্থাৎ– চাকরি ও ব্যবসার বিষয় শেষ। কারখানার মুখ্যতা শেষ। মার্কেটের ভাবনা সমাপ্ত। ঋণের চিন্তা বিলুপ্ত।

৩. সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাকে ঈমানের সঙ্গে সহীহ-সালামতে যাওয়ার তাওফীক দান করবেন। এবার ভেবে দেখুন, আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলে গেছেন। আমল করা তো ভাই আমাদের দায়িত্ব। আমরা আমল করলে ওই সমস্ত নেয়ামত আমাদের ভাগে আসবে।

সারা দিন আল্লাহর সাহায্য অর্জন করার আমল

মুসলিম শরীফে হাদীছে কুদসী বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে কুদসী মানে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন। হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

হে আদম সন্তান! দিনের শুরুতে তোমরা চার রাকাত নামায অর্থাৎ– ফজরের চার রাকাত নামায আদায় করে নাও, তাহলে এর বরকতে সারা দিন আমি তোমার সমস্ত কাজে সাহায্য করব। এবার বলুন, ফজরের নামাযে কতজন উপস্থিত হয়? আজ জুমার নামাযে যে-পরিমাণ লোক মসজিদে উপস্থিত হয়েছে, যদি ফজরের নামাযে এ-পরিমাণ লোক উপস্থিত হয়, তাহলে আমি অধমের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। সুতরাং ভাই! আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফজরের চার রাকাত নামায আদায় করো; আমি সারা দিন তোমার কাজে সাহায্য করব।

ফরজের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া

এ নামায আল্লাহর অনন্য নেয়ামত। এ নামায মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। বরং তা মানুষকে আল্লাহর প্রিয় বানিয়ে দেয়। হযরত ইবনে সুন্নী হযরত উম্মে মায়মুনা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন–

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْعَبْدُ بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِ

'আমার বান্দা আমার এতটুকু নিকটবর্তী হতে পারে না, যে-পরিমাণ সে ফরজের বিনিময়ে আমার নিকটবর্তী হয়। একে বলে ফরজের মাধ্যমে

নিকটবর্তী হওয়া। অর্থাৎ– ফরজের ওপর আমল করলে মানুষ আল্লাহর নিকটবর্তী হয় এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়।

নফলের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া

যারা নফল আদায় করে, তা যেমন Cherry upon the ceke মতো, অর্থাৎ– কেকের ওপর যেমন সুস্বাদু ক্রীম লাগানো থাকে, যা খেতে ভালো এবং সবার নিকট প্রিয়। তেমনিভাবে নফল ইবাদত আল্লাহর নিকট প্রিয়। সাধারণ নিয়মও হলো, যে-ব্যক্তি অতিরিক্ত কাজ করবে, তার প্রতি মালিক খুশি হয়। ঘরের চাকর মালিকের বাড়িতে কাজে আসার সময় পথে খাঁটি মধুবিক্রেতা পেয়ে মালিকের জন্য এক বোতল মধু নিয়ে এল। বলল, জনাব! বাড়ি থেকে আসার পথে খাঁটি মধু পেয়ে আপনার জন্য এক বোতল নিয়ে এসেছি। এতে পাঁচ মিনিট সময় বিলম্ব হওয়ার জন্য তাকে দায়ী করবে না; বরং তাকে মধুর মূল্যও দেবে এবং আলাদা ভালোও বাসবে যে, সে অতিরিক্ত সময়ে আমার কল্যাণের চিন্তা করে। সুতরাং এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করা খুশির কারণ হয়। অতএব ভাই! এ নফল ইবাদতও অতিরিক্ত টাইমের কাজ। কাজেই নফল আদায়কারীর প্রতি আল্লাহ বেশি খুশি হন। সুতরাং উক্ত হাদীছে সামনে বলা হয়েছে–

وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ

সে নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়। ফলে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি।

আমাদের হৃদয়েও এই প্রত্যাশা থাকা দরকার যে, আমরা আল্লাহর প্রিয় হতে চাই। সেই প্রিয়ও কীভাবে হব? আল্লাহ বলেন–

فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

'অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে।'

وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا

'আমি তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে স্পর্শ করে।'

وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ

'আমি তার জবান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে কথা বলে।'

وَقَلْبَهُ الَّذِيْ يَعْقِلُ بِهٖ

'আমি তার অন্তর হয়ে যাই, যার দ্বারা সে গবেষণা করে।'

এমনিভাবে বোখারি শরীফে একটি হাদীছ এই আলোচ্য বিষয়ের ওপর শাব্দিক কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি তার চোখ হয়ে যাই। আমি তার জবান হয়ে যাই। আমি তার হাত হয়ে যাই। আমি তার পা হয়ে যাই। হে আল্লাহ! আপনি বলছেন, আপনি সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ, সমস্ত বিচারকের বিচারক, সমস্ত জাহানের পালনকর্তা। বান্দার ব্যাপারে আপনি বলছেন, আমি তার অঙ্গ হয়ে যাই।

শুধু তা-ই নয়, বরং এটি তিনি বাস্তবে প্রামাণিতও করে দেখিয়েছেন যখন কাফেরদের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালু নিক্ষেপ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

'আপনি যখন নিক্ষেপ করছিলেন, তখন মূলত আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।'[১]

হে আল্লাহ! আপনি এত মহান সত্তা আর বান্দার ওপর এত পরিমাণ অনুগ্রহ করেন! যদি তারা আপনার আদেশের আনুগত্য করে, তাতে অটল থাকে, তাহলে আপনি তাকে ওই সমস্ত গুণে ধন্য করেন। তাই কবি বলেন–

گفت او گفتہ اللہ بود * گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

'বান্দার মুখ দ্বারা কথা বের হচ্ছে; অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহরই কথা।'

অতঃপর মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ কী মর্যাদা দান করবেন। উক্ত হাদীছেই পরে এসেছে–

وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ

যদি সে আমার নিকট প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে দান করি।

إِنْ دَعَانِيْ أَجَبْتُهُ

আমাকে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দেই।

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ১৭

আমার নিকট প্রার্থনা করলে আমি তা কবুল করি। ভাই পদোন্নতি তো সামনে। আল্লাহর সাহায্যও প্রস্তুত রয়েছে। দু'আ কবুল করার জন্যও তিনি প্রস্তুত, যা চাইবে তো দান করার জন্য তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। এরপরও যদি পেছনে পড়ে থাকি, তাহলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। আমরা যেন সবাই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাকারী হতে পারি।

এরপরও পেছনে থাকছ কে?

আমি অধম একবার কোনো এক দেশে গমন করছিলাম। সেখানকার দেওয়ালে আশ্চর্য একটি বাক্য লিপিবদ্ধ দেখেছিলাম। আমি অনেক সময় পর্যন্ত সেই বাক্যটি পাঠ করেছি। ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল। তবে বাক্যটি খুবই আশ্চর্যপূর্ণ–

If you feel god is away. guess who moved.

'যদি তোমরা উপলব্ধি করে থাক যে, আল্লাহ দূরে আছেন, তাহলে এটা অনুমান করো যে কে তোমাকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছে।'

বাস্তবে তো আল্লাহ নিজের কথা থেকে পেছনে সরতে পারেন না। তাহলে পেছনে সরে যায় কে? বান্দা তো নিজে-নিজেই তার স্থানচুৎ হয়ে যায়। আমরা যদি মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত আমল করি, তাহলে আল্লাহ সেই পদোন্নতি অনুযায়ী আমাদের পুরস্কার দান করবেন। এটা হলো পৃথিবীতে কামিয়াব ও বিজয়ী হওয়ার সহজ পন্থা।

হে মালিকের পথভোলা ব্যক্তি; একটু শোনো

মানুষ যদি আল্লাহর দরজার রাস্তা ভুলে যায় এবং তার গন্তব্য অন্যদিকে মোড় দেয়, তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ

'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য নিজেকে অবসর করো, আমি তোমার সিনাকে অমুখাপেক্ষিতা দ্বারা ভরে দেব এবং তোমার দরিদ্রতাকে সরিয়ে দেব।'

وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

আর যদি তুমি সেটা না কর, তাহলে কাজের দ্বারা তোমার সিনা ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র্যের অপসারণ করব না।

একটা কাজ শেষ হবে না, আরেকটা তোমার অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টা শেষ হবে না, তৃতীয়টা লেগে যাবে। যেভাবে বর্তমানে আমরা অস্থিরতায় নিমজ্জিত রয়েছি। পরে বলেছেন, তোমাদের অভাবকে আমি বাঁধা দেব না। এত পরিমাণ উপার্জন করবে; কিন্তু তোমার ঘরের প্রয়োজনই শেষ হবে না। এজন্যই আজ দেখা যায়, ঘরের সবাই চাকরি করছে; কিন্তু পরিবারের খরচ ঠিকমতো আদায় করতে পারছে না। সুতরাং আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজেকে অবসর করো; আল্লাহ তোমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন।

সফলতার মাত্র একটি রাস্তা

আমাদের নিকট কামিয়াবির মাত্র একটি রাস্তা রয়েছে। মাখলুক থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেব, আল্লাহর ওপর ভরসা করব এবং বলব–

حَسْبُنَا اللّٰهُ

'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

এই শব্দটি নিয়ে গবেষণা করবেন। এটি অনেক বড় কথা যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এজন্যই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

'এবং আল্লাহর ওপরই ভরসা করো। আল্লাহর তত্ত্বাবধানই যথেষ্ট।'[১]

অন্য আয়াতে বলেন–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

'যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।'[২]

অন্য আয়াতে বলেছেন–

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

'আল্লাহর ওপরই ভরসা করো যদি তোমরা মুমিন হও।'[৩]

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৮১
২. সূরা তালাক : আয়াত ৩
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৩

আরেক আয়াতে বলেছেন–

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

'সমস্ত কাজ তার দিকে প্রত্যবর্তিত হয়। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই ওপর ভরসা করো।'[১]

ভাই! আমাদের বারবার বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করো, আল্লাহর দিকে ধ্যান করো, আল্লাহর ওপর দৃষ্টি স্থির করো।

আল্লাহর বন্ধু হওয়ার ফায়দা

যে-ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু হতে পারবে, আল্লাহ তার সমস্ত কাজ সমাধা করে দেবেন। এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে–

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে আমার বন্ধুদের সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমার পক্ষ থেকে তার প্রতি যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।

একটু চিন্তা করুন, আল্লাহর বন্ধু হওয়ার ফায়দা কত। আল্লাহ বলেন, আমার বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণকারীর প্রতি আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা। বাস্তবেও আল্লাহ তাঁর ঘোষণা সত্যায়িত করে দেখিয়েছেন। বদর যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, আমরা কাফেরদের হত্যা করেছি। কিন্তু আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিলেন, না, তোমরা তাদের হত্যা করনি। আল্লাহ বলেন–

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

'তোমরা তাদের হত্যা করনি বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছেন।'[২]

হে আমাদের মালিক! আপনার মাহাত্ম্যের ওপর আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক। আপনার কথা আপনি সত্যায়িত করে দেখিয়েছেন। সুতরাং ভাই! আমরা যদি আল্লাহর ওপর আমাদের দৃষ্টি স্থির করতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদের সকল কাজ সমাধা করে দেবেন। সকল বিপদে আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের হেফাযত করবেন। তাই আমরা অধিক পরিমাণে

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

পাঠ করা চাই।

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ১৩৩

২. সূরা আনফাল : আয়াত ১৭

একটি প্রশংসনীয় বাক্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

'আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?'[১]

এ আয়াত পাঠ করলে তো অন্তরে কিছু প্রভাব হওয়া চাই; না? মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ কি সকল বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আমরা এ আয়াত পাঠ করলে কী বলব? আমরা বলব, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

দশটি শব্দ পাঠকারীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

এবার একটি হাদীছ শুনুন। বর্তমানে অনেক পেরেশানিগ্রস্ত মানুষ এসে বলে, হুজুর! পেরেশানি দূর হওয়ার জন্য আমাদের কিছু আমল বলে দিন, যা পাঠ করলে আমরা অশান্তি থেকে নিষ্কৃতি পাব। সুতরাং সেই আমলও শুনে নাও। দুররে মানছুরে হযরত বারীদাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দশটি শব্দ আছে, যা পাঠ করলে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। এর মধ্যে পাঁচটি কথা দুনিয়া সম্পর্কিত এবং পাঁচটি কথা আখেরাত সম্পর্কিত। এবার সেই দশটি বাক্য শুনে নাও। দৈনিক একটি বাক্য মুখস্থ করলে দশ দিনে হাদীছটি মুখস্থ হয়ে যাবে। এরপর উক্ত হাদীছটি তোমার দু'আর অংশ বানিয়ে নেবে। এই বাক্যগুলো পাঠ করলে আল্লাহ তোমার কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

১.

حَسْبِيَ اللّٰهُ لِدِيْنِيْ

'আমার দীনের জন্য আমার আল্লাহ যথেষ্ট।'

অর্থাৎ– আমার ধার্মিকতায় কোনো প্রকার ফেতনা-ফাসাদ আসবে না। স্মরণ রাখবেন, দীনের ব্যাপারে ফেতনা দুভাবে আসে। এক. সন্দেহের কারণে দুই. কুপ্রবৃত্তির কারণে। আল্লাহ আমাদেরকে এই দু-প্রকারের ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন, আমাদের দীন সংরক্ষিত থাকবে।

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৩৬

২.

حَسْبِيَ اللهُ لِمَا اَهَمَّنِيْ

'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট ওই সমস্ত বিষয়ের জন্য, যা আমাকে চিন্তিত করে।'

বান্দা অস্থিরতা অনুভব করে। পারিবারিক সমস্যা, ব্যবসার সমস্যা, যে বস্তুই আমাকে পেরেশানি করে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।

৩.

حَسْبِيَ اللهُ لِمَنْ بَغٰى عَلَيَّ

'আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট তাদের ক্ষেত্রে, যারা আমার ওপর বিদ্রোহ করে।'

অর্থাৎ– যারা আমার অবাধ্য হয়ে আমার ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাদের দমনের ক্ষেত্রে আমার জন্য আমার আল্লাহ যথেষ্ট।

৪.

حَسْبِيَ اللهُ لِمَنْ حَسَدَنِيْ

'আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে আমার ওপর বিদ্বেষ রাখে।'

অফিসিয়াল জীবনে অনেক বিদ্বেষ হয়। পদচ্যুৎ করা হয়। এ বাক্য পাঠ করলে আল্লাহ সকল বিদ্বেষ থেকে আমাদের হেফাযত করবেন।

৫.

حَسْبِيَ اللهُ لِمَنْ كَادَنِيْ بِسُوْءٍ

'আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট ওই সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যারা আমার বিরুদ্ধে অশুভ ষড়যন্ত্র করে।'

ভাই! অশুভ ষড়যন্ত্রকারী যে কেউ হতে পারে। কোনো ব্যক্তিবিশেষও হতে পারে, কোনো পার্টিও হতে পারে। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো দেশও ষড়যন্ত্র করতে পারে। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে আমার জন্য আমার আল্লাহ যথেষ্ট।

এ পাঁচটি বাক্য হলো দুনিয়া সম্পর্কিত।

আখেরাত সম্পর্কিত পাঁচটি বাক্য হলো–

১.

حَسْبِيَ اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

'আমার মৃত্যুর সময় আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।'

২.

حَسْبِيَ اللهُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ

'কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।'

৩.

حَسْبِيَ اللهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ

'মিযানে আমলনামা পরিমাপের সময় আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।'

৪.

حَسْبِيَ اللهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

'পোলসেরাতের সংকটে আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।'

৫.

حَسْبِيَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

'আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। তাঁর ওপর আমি ভরসা করি, তাঁর দিকে আমি ধাবিত হই।'

ভাই! যদি নামাযের পর আমরা এই দশটি বাক্য পাঠ করতে পারি, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

আমার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট

হযরত আলী (রাযি.) খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন যে, হে আল্লাহ! আমার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট যে, আপনি আমার পালনকর্তা আর আমার জন্য এই গৌরবই যথেষ্ট যে, আমি আপনার বান্দা।

প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো

আমাদের জন্য উচিত যে, সবদিক থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হবো। তারপর দেখুন, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা কীভাবে পুরা করেন।

শৈশবের সবক

আমাদের পূর্বপুরুষগণ ছোট-ছোট শিশুদেরকে এই বাক্যের প্রশিক্ষণ দিতেন। আগেকার যুগে মা তার ছোট শিশুকে এই বাক্যটি বলে ঘুম পাড়াত–

حسبی ربی جل اللہ * مافی قلبی غیر اللہ

نور محمد صلی اللہ * لا الہ الا اللہ

এই حَسْبِيَ رَبِّيَ (আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট) এটি আমাদের শিশুকালের সবক ছিল। আল্লাহ যেন আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে যথেষ্ট হয়ে যান এবং আমাদেরকে তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তভুর্ক্ত করেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া

'এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় জেনে রাখুন। যদি যোগ্যতার আলোচনা হতো, তাহলে আমাদের মতো অযোগ্যদের অবস্থা ভয়াবহ হতো। আমরা নিষ্পেষিত হয়ে যেতাম। এখানে আলোচনা হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতার। সুতরাং আমাদের মতো অপরাধী ও বৃদ্ধদের নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আমরা আল্লাহর দরবারে চাইতে থাকব। কে জানে আল্লাহর রহমত কোন সময় কার প্রতি ধাবিত হয়ে যাবে আর সে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা চাইতে থাকি। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি। আল্লাহ আমাদের ভালোবেসে নেবেন।'

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

قبول শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ

'লিসানুল আরব' অভিধানে বলা হয়েছে–

اَلْقَبُوْلُ مِنْ قَبْلِ الشَّيْءِ

কবুল বলা হয় মানুষ কোনো বস্তুকে পছন্দ করা। আল্লাহ বলেন–

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا

'তারা ওই সমস্ত লোক, যাদের থেকে আমি তাদের উত্তম কাজ গ্রহণ করি।'[১]

এখানে التقبل বাবে تفعل থেকে এসেছে।

কোনো বস্তু পছন্দ হওয়ার সাধারণ কারণ

মানুষের কোনো বস্তু পছন্দ হলে তা সে অর্জন করতে চায়। কোনো বস্তু পছন্দ হওয়ার সাধারণ কারণ হলো, বস্তুটা গুণবান হলে সেটা তার কাছে ভালো লাগে। চাই তার আকৃতি সুন্দর হোক, চাই আদর্শ সুন্দর হোক।

---

১. সূরা আহকাফ : আয়াত ১৬

উদাহরণস্বরূপ দেখুন–

- সুন্দর দৃশ্য যেখানেই থাকুক মানুষ সেটা ভালোবাসে।
- সুন্দর ঘর কিংবা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করলে তার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়।
- উত্তম পোশাকও তার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে।
- উত্তম ব্যক্তিত্ববান মানুষ সব সময় জনগণের প্রিয় হয়।

গুণে ত্রুটি হলেও পছন্দ হয়

যদি গুণ ও আদর্শ উভয়ই সুন্দর থাকে, তাহলে তো খুবই ভালো। এটি সবাই পছন্দ করে। তবে এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নয়। কোনো-কোনো সময় গুণে ত্রুটি হলেও সে পছন্দনীয় হয়। যেমন কোনো-কোনো খেলোয়াড় তার খেলার মাধ্যমে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যায়। ফলে মানুষ তার জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। মানুষ তার পোশাক পরিধান করে ঘোরাফেরা করে। অথচ তার আকৃতি খুবই বিশ্রী।

পবিত্র কুরআন দ্বারাও এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। হযরত মূসা (আ.)কে আল্লাহ নবুওতের দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং হযরত হারুন (আ.)কেও নবুওত দান করেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর শৈশবে একটি দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর মুখে একটু জড়তা এসে যায়। কথা বলা কষ্টকর হয়ে যায়। ঘটনাটির সারসংক্ষেপ হলো, তিনি জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে দিয়েছিলেন এতে তাঁর মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এজন্যই তাঁর মুখে জড়তা এসে যায়। তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন–

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَ يَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝

'হে আল্লাহ! তুমি আমার বক্ষ খুলে দাও, আমার জন্য আমার বিষয়টি সহজ করে দাও। আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বোঝতে পারে।'[১]

সুতরাং কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হলো, হযরত মূসা (আ.)-এর মুখে জড়তা ছিল। কথা বলতে কষ্ট হতো। তাঁর হৃদয়ে উদ্রেক হলো, আমার ভাই হারুন খুব স্পষ্টভাষী। কুরআনই সেকথা প্রমাণ করে–

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ২৫-২৮

هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا

'ভাষার দিক দিয়ে সে আমার থেকে স্পষ্টভাষী।'[১]

কিন্তু আল্লাহ নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্য কাকে চয়ন করলেন? হযরত মূসা (আ.)কে। এটা যে পছন্দ করে, তার ওপরই নির্ভরশীল। তিনি কেন তাঁকে চয়ন করলেন? কুরআনে বলা হয়েছে–

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

'আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বললেন।'[২]

কাশ্মিরের সফরে মাঝে-মাঝে এমন দৃশ্য সামনে আসত, যা দেখে সাধারণতই মানুষের মন চাইবে যে, দাঁড়িয়ে একটু দেখে যাই। অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য দেখা যেত। যেমন নিলাম উপত্যকা, কাগান উপত্যকা, নারান উপত্যকা, লেপা উপত্যকা ইত্যাদি। যেন আল্লাহর কুদরতি হাতে গড়া খুবই অদ্ভুত দৃশ্য। তবে এ সমস্ত সুন্দর দৃশ্যবান পাহাড় তাদের স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করছে। কিন্তু আল্লাহ মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য কোন পাহাড়কে নির্বাচিত করেছিলেন? তুর পাহাড়কে, যার ওপর দেখার মতো কোনো গাছ নেই। আল্লাহ তাঁর হাবীবের জন্য উহুদ পাহাড়কে পছন্দ করেছেন। তার ওপরও কোনো গাছপালা নেই। সেই পাহাড় সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেন–

اُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

'উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরা ও তাকে ভালোবাসি।'

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-পাহাড়কে ভালোবাসেন, তার নাম উহুদ। আল্লাহ তাঁর ঘরের নিকটস্থ যে-পাহাড়কে ভালোবাসেন, তার মধ্যে কোনো প্রকার তৃণলতাও নেই। কুরআন বলে–

بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ

'তৃণবিহীন অনূর্বর উপত্যাকা।'[৩]

এক মায়ের গর্ভে এক মেয়ে হলো, যে অত্যন্ত কালো, দেখতে আমাবস্যার রাতের মতো, যার দরুন মা তার নাম রেখেছিল 'লায়লা' অর্থাৎ–

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৩৪
২. সূরা নিসা : আয়াত ১৬৪
৩. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭

রাত। কিন্তু তাকে মজনু সাহেবের পছন্দ হয়ে গেল। তার জন্য সে মরিয়া হয়ে গেল। পরিশেষে তার জন্যই প্রাণ বিসর্জন দিল। বাদশাহ মনে-মনে ভাবলেন, মজনু যার জন্য এত দেওয়ানা, না জানি সে কত রূপসি। তিনি লায়লাকে তার রাজদরবারে তলব করলেন। তাকে দেখে বাদশাহ যা বলেছিলেন, তা মাওলানা রুমি (রহ.) তাঁর কবিতার ভাষায় লিখেছেন–

از دگر خوباں تو افزوں نیستی

'তুমি তো অন্যান্য সুন্দরীদের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নও!

তখন লায়লা জবাব দিল,

گفت خاموش چوں تو مجنوں نستی

'আপনি নীরব থাকুন। আপনি তো আমার মজনু নন। আপনার নিকট তো আমার মজনুর চোখ নেই।'

সুলতান মাহমুদ গজনবি (রহ.)-এর নিকট অনেক মন্ত্রী থাকতেন। অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক থাকতেন। কিন্তু সেই রাজদরবারের মধ্যে তিনি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, সে ছিল একজন সাধারণ শিক্ষিত নিম্ন বংশের গরিব পরিবারের লোক। তার নাম ছিল আয়ায। গ্রাম্য মানুষ; কিন্তু সে সুলতানের নজরে আসন পেয়ে যায়।

আমি আমার জীবনে অনেক দেখেছি যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের অপরূপা সুন্দরী, ধনীর দুলালী মেয়ে স্বামীর ঘরে সুখে দিন কাটাতে পারছে না। পরিশেষে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। কিন্তু গরিব পরিবারের একটা অশিক্ষিতা মেয়ে শিক্ষিত স্বামীর ঘরে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। স্বামী তার জন্য দেওয়ানা থাকছে।

সুতরাং ভাই! সাধারণ নিয়ম হলো, গুণ ও সৌন্দর্যকে ভালোবাসা হয়। কিন্তু সেটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নয়। এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে।

আমাদের আমল কি গ্রহণযোগ্যতার উপযোগী?

একটি কথা আমাদের স্মরণে রাখা চাই যে, আমরা যে সমস্ত আমল করি, সেগুলো কি গ্রহণযোগ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে? ইবনে আতা ইস্কান্দরি (রহ.) মিশরের ইস্কান্দরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ ছিলেন। মিশর আরবি বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া আযহার সারা বিশ্বে যার খ্যাতি বিস্তৃত। তিনি তাতে শিক্ষা দিচ্ছেন। সেই ওস্তাদগণের মাধ্যমেই সেটি

সুখ্যাতি অর্জন করে। তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন।

رُبَمَا فُتِحَ لَكَ بَابُ الطَّاعَةِ وَمَا فُتِحَ لَكَ بَابُ الْقَبُوْلِ

অনেক সময় এমন হয় যে, তোমার জন্য আমলের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু গ্রহণের দ্বার খোলা হয়নি। সুতরাং মানুষ আমল করে; কিন্তু তা কবুল হয় না। এর উদাহরণ শুনুন।

ইবলিস অভিশপ্ত হওয়ার পূর্বে হাজার-হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করেছে। বলা হয়, পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান বাকি থাকেনি, যেখানে ইবলিছ সেজদা করেনি। কিন্তু ফলাফল কী হলো? আল্লাহ বলেন–

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ

'আমার দরবার থেকে বের হয়ে যাও। কারণ, তুমি অভিশপ্ত।'[১]

পরিণতিতে হাজার বছরের ইবাদতকে লাথি মারা হলো।

বনী ইসরাঈলে বালআম বাউরা অত্যন্ত ইবাদতগুযার ছিল। তিনশ বছর পর্যন্ত ইবাদত করেছে। এমনকি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিল। যার দু'আ কবুল করা হয়, ওই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। যে দু'আ করত, তা-ই কবুল হয়ে যেত। কিন্তু পরিশেষে এমন ভুল করল যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ফেলল।

আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

'আমি ইচ্ছা করলে তার সম্মান বাড়িয়ে দিতাম সেসব নিদর্শনের বদৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল!'[২]

এরপর আল্লাহ যা বলেন, তা পাঠ করলে হৃদয় শিউরে ওঠে–

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'সুতরাং তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল।'[৩]

---

১. সূরা সাদ : আয়াত ৭৭
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৬
৩. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৬

এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণ হয়ে যায়, আল্লাহর ওই বান্দা তিনশ বছর ইবাদত করেছিল। আমাদের জীবনই তো তিনশ বছর হয় না। অথচ তিনশ বছর ইবাদতের পরও তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো। আল্লাহ বলেছেন, তার অবস্থা কুকুরের মতো। এজন্যই আমাদের বুযুর্গগণ বলেন–

لَا عِبْرَةَ بِالطَّاعَةِ إِذَا لَمْ يَصْحَبْهَا قَبُوْلٌ

'ইবাদতের কোনো ধর্তব্য নেই যদি গ্রহণযোগ্যতা তার সাথি না হয়।'

আরো বলেছেন–

لَيْسَ كُلُّ طَاعَةٍ سَبِيْلًا مَثُوْبَةَ اللهِ وَرِضْوَانِهٖ

'সকল অনুসরণ ও পুণ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।'

তাই আমাদেরকে চিন্তাশীল হওয়া দরকার, যাতে আমাদের ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। অন্তরে ভয় রাখা দরকার, যাতে আমার ইবাদত প্রত্যাখ্যাত না হয়। আল্লাহর দরবারে এই আবদার পেশ করবেন যে, হে আল্লাহ! আপনি যদি দোষ ধরেন, তাহলে আমাদের সব কিছু দোষ হয়ে যাবে। সুতরাং ত্রুটি সন্ধান না করে আমাদের ইবাদত কবুল করুন। আমাদের আমল ত্রুটিপূর্ণ। আমরাও ত্রুটিযুক্ত। অতএব নিজ অনুগ্রহে আমাদের আমল কবুল করুন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)-এর ব্যাখ্যা

আমাদের বুযুর্গগণ অত্যন্ত অশ্চর্যপূর্ণ কথা বলেছেন–

لَوْلَا جَمِيْلُ سَتْرِهٖ لَمْ يَكُنْ عَمَلًا اَهْلًا لِلْقَبُوْلِ

'যদি আল্লাহর সাত্তার গুণের প্রভাব না হতো, তাহলে বান্দার কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হতো না।'

ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) এই বাক্যটির আশ্চর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত মাকতুবাতে কথাটি উল্লেখ করেছেন। মানুষ যতই উত্তম পন্থায় ইবাদত করুক, এর ওপর যতই মেহনত করুক, যতই চেষ্টা করুক, তার ইবাদত আল্লাহর শানের পর্দার নিচে পড়ে থাকে। আল্লাহ এর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং আমরা সারা জীবন চেষ্টা-সাধনা করে ইবাদত করলেও আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে না।

ইবাদত করার হক

দোজাহানের সরদার রাহমতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত কেমন বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে হতো। আল্লাহ তাঁর জীবনের শপথ খেয়েছেন। নবীজির সম্মান কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্সত্তেও নবীজি বলেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

'হে আল্লাহ! আপনার ইবাদতের পরিপূর্ণ হক আদায় করে আমি আপনার ইবাদত করতে পারিনি এবং আপনার মারেফত হাসিল করার যে হক রয়েছে, সেই অনুযায়ী আমি আপনার মারেফত হাসিল করতে পারিনি।'

হযরত ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর ব্যাপারে বলা হয়, তিনি একটানা চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঈশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। এর ভেতরে কোনো দিন তাহাজ্জুদের নামায ছোটেনি। তিনি কাবা শরীফ যিয়ারতের জন্য গমন করলেন। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে দু-রাকাত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ! আপনার ইবাদতের হক আদায় করে আমি ইবাদত করতে পারিনি।'

আর ভাই! আমরা কোন জমিনের মুলা-গাজর? আমাদের কী অবস্থা? এমন ইবাদত করা আমাদের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। অধিকন্তু আমি তো পারবই না। আমরা যত নিখুঁত আমলই করি, আল্লাহ এর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি মহান মালিক। আমাদের গবেষণা থেকেও ঊর্ধ্বে। আমাদের গবেষণা যেখানে গিয়ে শেষ হবে, এর চেয়ে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

শান অনুযায়ী ইবাদত না করলে প্রতিদান হবে কীভাবে?

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের ইবাদত যদি আল্লাহর শানমতো না হয়, তাহলে সেই ইবাদতের মাধ্যমে আমরা প্রতিদান পাব কীভাবে? ওলামায়ে কেরাম এর জবাব লিখেছেন, এর উদাহরণ এরকম মনে করুন যে, আপনি আপনার সন্তানকে প্রথম দিন স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। দুপুরবেলা ছেলে বাড়িতে এসে বলছে, আব্বু! আমি এক-দুই লিখেছি। আপনি বললেন, ঠিক আছে; তাহলে শ্লেটটা দেখাও। আপনি শ্লেটের মধ্যে

মাঝে-মাঝে এলামেলো চকের দাগ ছাড়া কিছুই দেখতে পাননি। তারপরও ছেলেকে উৎসাহ দিতে বলছেন, খুব সুন্দর হয়েছে। তখন পকেট থেকে টাকা বের করে তাকে আইসক্রীম কিনে দিলেন। আজকের আইসক্রিম পুরস্কার আপনার ছেলের কৃতিত্বের জন্য হয়নি বরং ছেলের প্রতি আপনার ভালোবাসার উপহার হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আমরা যে-ইবাদতের ওপর পুরস্কার পাচ্ছি, তা আমাদের কর্মের সফলতার জন্যে নয়, বরং

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর অসীম দয়াবান।'[১]-এর পুরস্কার। তিনি দেখেন, আমার বান্দা তো চেষ্টা করছে। সুতরাং আমলের মধ্যে নিষ্ঠা পাওয়া গেলেই আল্লাহ সেটি কবুল করে আমাদের পুরস্কার দান করেন।

মুক্তির ভিত্তি আল্লাহর রহমত

এরপরও এখানে তালেবে ইল্মদের বিবেকে একটি প্রশ্ন জাগে, পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আমলের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন–

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

'সেটি জান্নাত; আমি তোমাদেরকে তার ওয়ারিশ বানিয়েছি তোমাদের নেক আমলের বিনিময়ে।'[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

'জান্নাতে প্রবেশ করো। কেননা, তোমরা পুণ্যের কাজ করছিলে।'[৩]

হাদীছ শরীফে এসেছে–

لَنْ يَّدْخُلَ اَحَدُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهٖ

'কেউ তার আমলের বিনিময়ে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩
২. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৭২
৩. সূরা নাহ্ল : আয়াত ৩২

বোখারি শরীফের এক হাদীছ হযরত জাবের (রাযি.) বর্ণনা করেন–

لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللهِ

'তোমাদের মধ্যে কারো আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। এমনকি আমিও নই আল্লাহর রহমত ব্যতীত। বোখারি শরীফের অন্য রেওয়াতে এসেছে–

لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ

'তোমাদের মধ্যে কারো আমল তাকে মুক্তি দিতে পারবে না।'

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি নন হে আল্লাহর রাসূল?

قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ

নবীজি বললেন, আমিও না। তবে আল্লাহ আমাকে তাঁর ক্ষমা দ্বারা ঢেকে নেবেন এটি ভিন্ন কথা।

অন্য হাদীছ এসেছে, আল্লাহ জান্নাতকে সম্বোধন করে বলেন–

أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي

'তুমি আমার রহমত। আমার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা দয়া করব।'

ওলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। বান্দা তার আমল দ্বারা জান্নাতে যেতে পারবে কি-না? এর জবাবে হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) বলেন, নিশ্চয় বান্দার আমল না জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে, না জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে। এসব কিছু আল্লাহর রহমত ও দয়ার বদৌলতে সাধিত হবে।

আল্লামা ইবনে জাওযি (রহ.)-এর ব্যাখ্যা

আল্লামা ইবনে জাওযি বলেন–

إِنَّ تَوْفِيقَ الْعَمَلِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ لَوْ لَا رَحْمَةُ اللهِ السَّابِقَةُ مَا حَصَلَ الْإِيمَانُ وَلَا الطَّاعَةُ الَّتِي يَحْصِلُ بِهَا النَّجَاةُ

আল্লাহর প্রদত্ত রহমতেই আমলের সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লাহর রহমত না হলে বান্দা ঈমান গ্রহণ করতে পারত না। এমন ইবাদতও করতে সক্ষম

হতো না, যার দ্বারা সে মুক্তি পেয়েছে। সুতরাং যদি আমলের বিনিময়েও বান্দা জান্নাত পায়, তবু সেটা আল্লাহর রহমতের বিনিময়েই হবে। কারণ, সে আল্লাহর রহমতেই ওই রকম আমল করার সৌভাগ্য পেয়েছে।

তিনি আরেকটি কথা বলেছেন–

أَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَعَمَلُهُ مُسْتَحَقٌّ لِمَوْلَاهُ، فَمَهْمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَزَاءِ فَهُوَ مِنْ فَضْلِهِ

গোলামের উপকার তাঁর মালিকের উপকারই হয়ে থাকে। কেননা, সে তার অধীন। তার সকল কাজ তার মালিকের। যে-মালিক তার গোলামের কাজের ওপর তাকে পুরস্কার দেয়, সেটি মালিকের অনুগ্রহ। সেটি গোলামের কাজের প্রতিদান নয়। ভাই! আমরা আল্লাহর গোলাম। তিনি আমাদের মালিক। যদিও আমরা আমল করি; কিন্তু যেহেতু তিনি আমাদের মালিক সুতরাং এই আমল আল্লাহর জন্যই হবে। এরপর যদি আল্লাহ এসে আমলের বিনিময়ে আমাদের জান্নাত দান করেন, তাহলে সেটি আমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ। সেটি আমাদের অধিকার নয়।

তিনি আরেকটি দলিল দেন–

أَنَّ أَعْمَالَ الطَّاعَاتِ كَانَتْ فِيْ زَمَنٍ يَسِيْرٍ وَالثَّوَابُ لَا يَنْفَدُ فَالْإِنْعَامُ الَّذِيْ لَا يَنْفَدُ فِيْ جَزَاءِ مَا يَنْفَدُ بِالْفَضْلِ لَا بِمُقَابَلَةِ الْأَعْمَالِ

নির্ধারিত সময়ে আমাদের নির্ধারিত আমল তো সীমিত; কিন্তু এর বিনিময়ে যদি আল্লাহ আমাদের জান্নাত দান করেন, তাহলে সেটি হবে চিরস্থায়ী। সুতরাং সীমিত আমলের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া এটি আমলের প্রতিদান হতে পারে না। এটি আল্লাহর দয়া ছাড়া কিছু নয়।

একটি মারফু হাদীছ দ্বারা সত্যায়ন

উপরিউক্ত বিষয়বস্তুর ওপর একটি হাদীছ দ্বারাও দলিল দেওয়া যায়, যা হযরত হাকীম (রহ.) হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি মারফু হাদীছ। হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবীজিকে শিক্ষা দিয়েছেন–

أَنَّ عَابِدًا عَبَدَ اللهَ عَلَى رَأْسِ جبلٍ فِي الْبَحْرِ خَمْسَ مِأَةِ سَنَةٍ، ثُمَّ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَقْبِضَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَ: فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَإِذَا عَرَجْنَا، وَنَجِدُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَدْخِلُوْا عَبْدِيَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ ، فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ : يَا رَبِّ ، بِعَمَلِيْ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ لِلْمَلَائِكَةِ : قَايِسُوْا عَبْدِيْ بِنِعْمَتِيْ عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ ، فَيَجِدُوْنَ نِعْمَةَ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خَمْسِ مِأَةِ سَنَةٍ ، وَبَقِيَتْ نِعَمُ الْجَسَدِ لَهُ ، فَيَقُوْلُ : أَدْخِلُوْا عَبْدِيَ النَّارَ ، فَيُجَرُّ إِلَى النَّارِ ، فَيُنَادِيْ رَبَّهُ : بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِيَ الْجَنَّةَ ، بِرَحْمَتِكَ ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ جِبْرِيْلُ : إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللهِ يَا مُحَمَّدُ

এক ইবাদতগুযার বান্দা পাহাড়ের চূড়ায় পাঁচশ বছর পর্যন্ত ইবাদত করেছেন। এরপর তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে সেজদার মধ্যে মৃত্যু দিয়ো। তার এ দু'আ কবুল হয়েছে। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করা হয়েছে। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আমরা আকাশে যাওয়া-আসার সময় তার নিকট দিয়ে যাতায়াত করি। আমাদের মস্তিষ্কেও একথার উদ্রেক হলো যে, এ বান্দাকে কেয়ামতের দিন উঠানো হবে এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলবেন, ওই বান্দাকে আমার রহমতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। তখন ওই বান্দা বলবে, আমার আমলের বিনিময়ে। এভাবে যখন সে তিনবার বলবে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন, ওই বান্দার আমল এবং আমার যে সমস্ত নেয়ামত ওই বান্দার ওপর দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো একটু চেক করো। অতঃপর যাচাই করা হলে শুধু দৃষ্টিশক্তির বিনিময়েই তার পাঁচশ বছরের ইবাদত চলে যাবে। দেহের অন্যান্য অঙ্গের নেয়ামতের বিনিময় বাকি থেকে যাবে। ফলে আল্লাহ নির্দেশ দেবেন, তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। ফেরেশতারা তাকে জাহান্নামের দিকে টানতে শুরু করবে। তখন সে চিৎকার করবে, হে আল্লাহ! আপনার রমতের বিনিময়েই আমাকে জান্নাত দিয়ে দিন। আপনার রহমত দ্বারা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মদ! মোয়ামালা তো আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং ভাই! কোন মায়ের সন্তান আছে যে বলবে, আমি আল্লাহর নেয়ামতের হিসাব দিতে সক্ষম! অতএব ভাই! আমরা তো আল্লাহর নেয়ামতের হিসাব দিতে পারব না। আর যেহেতু আমরা হিসাব দেওয়ারই উপযোগী নই, তখন পরিমাপেরও উপযোগী নই। সুতরাং আমাদের জান্নাত অর্জন হলে সেটা আল্লাহর অনুগ্রহের ভিত্তিতেই হবে।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সামঞ্জস্য

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ। যদি আল্লাহ আমাদের আমলকে পাকড়াও করেন, তাহলে নিশ্চিত আমাদের ব্যাপার কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

'আল্লাহ যদি বান্দার আমলকে পাকড়াও করেন, তাহলে এ পৃথিবীর বুকে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকবে না।'[১]

এই বিষয়বস্তুটি একটি হাদীছেও বর্ণনা করা হয়েছে। নবীজি ইরশাদ করেন–

لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَاَرْضِهٖ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهٗ خَيْرًا لَّهُمْ

যদি আল্লাহ আসমান ও জমিনবাসীকে শাস্তি দেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারবেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তাদের ক্ষেত্রে অত্যাচারী হবেন না। আর যদি তাদের অনুগ্রহ করেন, তাহলে তাঁর রহমত তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। এবার উভয় বর্ণনায় সামঞ্জস্য কী? এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবীজির একটি হাদীছ উপস্থাপন করেন।

دُخُوْلُ الْجَنَّةِ بِفَضْلِهٖ وَدَرَجَاتُهٗ بِحَسْبِ الْاَعْمَالِ

'জান্নাতে প্রবেশ হবে আল্লাহর অনুগ্রহে। জান্নাতে বান্দার স্তর বা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে তার আমলের বিনিময়ে। কুরআন মাজীদেও আল্লাহ বলেন–

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

'(বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করার পর) তাদের আমলের ভিত্তিতে তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি হবে।'[২]

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার আলামত

যখন আমরা ভেবে থাকি, সব কিছুর নির্ভরতা হচ্ছে আমলের গ্রহণযোগ্যতার ওপর, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা কীভাবে জানতে পারব, আমাদের আমল কবুল হয়েছে বা হয়নি? ওলামায়ে কেরাম

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৪৫

২. সূরা আহকাফ : আয়াত ১৯

এর কিছু নিদর্শনা বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে অনুমান করা যাবে আমাদের আমল কবুল হয়েছে কি-না।

(১) আমল শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী হবে : সর্বপ্রথম আলামত হলো, মানুষ যা আমল করবে, তা শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, একদিন আমল করার খুব আগ্রহ জেগেছে। সূফী সাহেব বললেন, আজ ফজরের ফরজ নামায চার রাকাত পড়ে নাও। যদি এমন করে, তাহলে আল্লাহর দরবারে সে অভিশপ্ত হবে। কুরআন পড়ল, নামায আদায় করল, সেজদা দিল, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে লাথি খেল কেন? কারণ, তার কাজ শরীয়তের বিধান ও সুন্নত অনুযায়ী হয়নি। সুতরাং যেকোনো আমল বাহ্যিকভাবে সুন্নত মোতাবেক না হলে সে আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, নবীজি ইরশাদ করেছেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

'যে-ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন (বিদায়াত) কিছু আবিষ্কার করবে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।'

কাজেই আমল সর্বদা শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হতে হবে। আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, আমাদের তরিকার অনুসরণকারীদের অনুসরণ সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) অনুসরণের ব্যাপারে লিখেছেন, দুপুরবেলা সুন্নতের নিয়তে বিশ্রাম করলে এমন ছাওয়াব পাওয়া যায়, যা হাজার বছর নফল শবগুজারি করলেও পাওয়া যায় না। সুবহানাল্লাহ! ওই সমস্ত বুযুর্গের হৃদয়ে সুন্নতের কেমন প্রভাব ছিল! কী মূল্যায়ন ছিল। দেখুন, এক দিকে রাত জাগরণ আর অন্য দিকে ঘুম। কিন্তু সেই ঘুম যেহেতু নবীজির ঘুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই হাজার বছর নফল শবগুযারি থেকে উত্তম। আল্লামা ইয়াইয়া আলী (রহ.) বলেন, সুন্নত তরিকায় প্রস্রাব-পায়খানা করলে এমন ছাওয়াব পাওয়া যায়, যা সুন্নত তরিকাবিহীন নফল নামায পড়লেও পাওয়া যায় না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)-এর সুন্নতের ওপর কেমন পাবন্দি ছিল দেখুন। একবার তাঁর দাঁতে ব্যথা শুরু হলো। তখনকার সময় দাঁত ব্যথা করলে লবঙ্গ চিবালে ব্যথা কমে যেত। তিনি এক শিষ্যকে বললেন, ভাই! লবঙ্গ নিয়ে আস। সে লবঙ্গ নিয়ে আসার পর তিনি সেগুলো গণনা করে দেখলেন, তা বেজোড় হয়নি। তিনি বললেন, মিয়া সূফী হয়েছ আর তোমার এতটুকু অনুভূতি নেই যে, নবীজি ইরশাদ করেছেন।

اَللّٰهُ وِتْرٌ وَيُحِبُّ الْوِتْرَ

'আল্লাহ বেজোড় আর তিনি বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন।'

তুমি যখন এগুলো নিয়ে আস, তখন গণনা করে বেজোড় আনলে না কেন? দেখুন লবঙ্গ একটি সাধারণ বিষয়। এ ক্ষেত্রেও তার সুন্নতের অনুসরণের রূপরেখা দেখুন। একটি কিতাবে খুব আশ্চর্য বিষয় পাঠ করেছি। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) বলেন, আমার আয়ত্তে যত সুন্নত ছিল সবগুলো আমি পুরা করেছি। একটি সুন্নতের প্রতি আগ্রহ ছিল। সেটি কী? সেটি হলো, সায়্যেদুনা হোসাইন (রাযি.) ছোট ছিলেন। তাঁকে নবীজি কোলে নিলেন। তিনি নবীজির কোলে প্রস্রাব করে তাঁর কাঁপড় ভিজিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি বলেন, আল্লাহ তো আমাকে মেয়ে দিয়েছেন। তবে নাতি পেলাম না। যদি নাতি থাকত, তাহলে আমি তাকে কোলে নিতাম আর সে প্রস্রাব করে আমার কাপড় ভিজিয়ে দিত। এমনকি অসিয়ত করে গেলেন, আমার মৃত্যুর পরও যদি আল্লাহ আমার মেয়েকে কোনো সন্তান দান করেন, তাহলে তাকে আমার কবরের ওপর বসিয়ে দিয়ো, যাতে সে আমার কবরের ওপর প্রস্রাব করে। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বাহনে বসা। সাথিদের সঙ্গে দূরত্ব হয়ে গেছে। এমন সময় বাহন থেকে নেমে একটা গাছের নিচে কিছু সময় বসলেন। তারপর উঠে যাত্রা করলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, যেহেতু আপনার প্রাকৃতিক কোনো প্রয়োজন ছিল না; তাহলে এখানে বসে অহেতুক বিলম্ব করলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি দেখেছি, নবীজি এখানে বসে প্রকৃতির প্রয়োজন সেরেছেন। তাই এখানে আসার পর আমার মাহবুবের কথা স্মরণ হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মন চাচ্ছে, আমার মাহবুব এখানে বসছিলেন। এখন আমার কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্তেও আমি এখানে বসে আমার মাহবুবের বসার সুন্নত আদায় করলাম।

এ হলো সুন্নতের মহব্বত। হযরত হুযাইফা (রাযি.)-এর আমলের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন, যিনি পারস্যবাসীদের বলেছিলেন,

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِيْ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ

'আমি কি এ নির্বোধদের জন্য আমার মাহবুবের সুন্নত পরিহার করব?'

সুতরাং ভাই! আমল কবুল হওয়ার সর্বপ্রথম বাহ্যিক আলামত হলো, তা শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হতে হবে। খানাও হালাল খাবে, পুণ্যের কাজও করবে। এজন্যই নবীজি ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

আল্লাহ পবিত্র। আর পবিত্র ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না।

কাজেই যে বান্দা হালাল রিযিকের গুরুত্ব দেবে, আল্লাহ তার আমল কবুল করবেন। নবীজি হযরত সা'দ (রাযি.)কে উপদেশ দিলেন–

يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

হে সা'দ! তোমার খাবারকে পবিত্র করো; তুমি মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত হয়ে যাবে। বর্তমানে সূফীগণের পেট ময়লার ট্যাংকি হয়ে গেছে। যা কিছু পঁচে নষ্ট হয়ে যায় সেটা তাতে নিক্ষেপ করা হয়। সূফীগণের পেট অয়েল মিল হয়ে গেছে। সেখানে যা কিছু নিক্ষেপ করা হয়, সেটাকে পিষে দেয়। হালাল হারামের কোনো পরোয়া করে না। সুস্বাদু পাওয়ার আগ্রহ। আমার Pizza খাওয়ার খুব শখ। এরপর শহরে দৌড়ায়, মেগডোনাল্ডের দিয়ে দৌড়ায়, কেএফসির দিকে দৌড়ায়। এগুলো বহির্বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত। আল্লাহ মালুম হালাল পয়সা ব্যয় করে সংগ্রহ করা হয়েছে, নাকি হারাম পয়সা। আমরা তো সে ব্যাপারে কিছুই জানি না। তা আল্লাহই ভালো জানেন। কে এত যাচাই করে। খোদাপ্রেমের যিকির শিখতে হলে হালালের প্রতি গুরুত্ব দাও।

(২) আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি : আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার দ্বিতীয় আলামত

اِبْتِغَاءُ وَجْهِ اللهِ بِالْعَمَلِ

'আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।'

একে বলা হয় আমলের অদৃশ্য মানদণ্ড। অর্থাৎ– দেখতে হবে যে, সেই আমলটি আল্লাহর জন্য হয়েছে কিনা। তাবারানি শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজি ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

একমাত্র খালেছভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্য ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো আমল আল্লাহ কবুল করেন না।

সুতরাং আমরা যখনই আমল করব, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করব। এজন্যই ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর কিতাব বোখারি শরীফ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

এ হাদীছ দ্বারা সূচনা করেছেন। হযরত মুতাররাফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন–

صَلَاحُ الْقَلْبِ بِصَلَاحِ الْعَمَلِ وَصَلَاحُ الْعَمَلِ بِصَلَاحِ النِّيَّةِ

'অন্তরের পরিশুদ্ধি হয় আমলের মাধ্যমে এবং আমলের পরিশুদ্ধি হয় নিয়তের মাধ্যমে।'

(৩) আমল ও অবস্থার মধ্যে উন্নতি উপলব্ধি হবে : আমল কবুল হওয়ার তৃতীয় আলামত

زِيَادَةُ الْأَعْمَالِ وَالتَّرَقِّيْ فِي الْأَحْوَالِ

'আমলের বৃদ্ধি এবং অবস্থায় উন্নতি।'

বান্দার আমল যখন আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, তখন আল্লাহ তার হৃদয়ে আমলের আবেগ, জযবা ও স্বাদ দান করেন। এই মর্মে আহমাদ ইবনে আজীবা 'ঈকাযুল হিমাম' গ্রন্থে লিখেছেন–

مَنْ وَجَدَ ثَمَرَةَ عَمَلِهِ عَاجِلًا فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوْدِ الْقَبُوْلِ اٰجِلًا

'যেব্যক্তি তার আমলের ফলাফল নগদ-নগদ পেয়ে গেল, এটা প্রমাণ হলো, ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তার এই আমলকে কবুল করে নেবেন।'

সুতরাং আমল করার ক্ষেত্রে যার হৃদয়ে স্বাদ বৃদ্ধি পাবে, সেটা দলিল হলো তার পূর্বের আমল গ্রহণ হয়ে যাবে। বিভিন্ন আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিভিন্ন নির্দশন পরিলক্ষিত হয়। যেমন– নামায কবুল হওয়ার আলামত হলো নামাযি ব্যক্তি বাস্তবেই অনুভব করতে পারবে, আমি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছি। কখনো-কখনো বাস্তবেও এ অনুভূতি উপলব্ধি হয়।

হজ কবুল হওয়ার আলামত হলো, ওই বান্দা সেখানে গিয়ে হজের কার্যাবলি সম্পন্ন করার সময় দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি এমন অবস্থা হয় যে, এক তাওয়াফ করে কাবা শরীফের এবং দশ তাওয়াফ করে বাজারের, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা কোনো উপকার পাওয়া যাবে না। হাজীদের এ খবর থাকে না যে, কাবা শরীফে কোন জায়গায় দু'আ কবুল হয়। তবে এটা খেয়াল থাকে যে, কোন ঘড়ির মূল্য

কত। মার্কেটে গিয়ে ঘড়ি আর মোবাইলের দরদাম করতে-করতেই দিন শেষ হয়ে যায়।

কুরআন তেলাওয়াত কবুল হওয়ার আলামত হলো, তেলাওয়াতকারীর হৃদয়ে এই অনুভূতি হবে যে, আমি আমার রবের সঙ্গে কথা বলছি।

(৪) আমলে নিরবচ্ছিন্নতা আসবে : আমল কবুল হওয়ার চতুর্থ আলামত হলো

اَلْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْعَمَلِ

'আমল প্রতিনিয়ত হবে।'

অর্থাৎ– আল্লাহর দরবারে যে-আমল কবুল তা সর্বদা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে তাওফীক দান করবেন। তাতে সে অটল থাকবে।

আরো শুনুন। তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও এই আমল অব্যাহত থাকবে। আমাদের বুযুর্গগণ একথাটা সংক্ষেপে এভাবে বুঝিয়ে দেন যে, বন্ধু! তুমি এক নামায মসজিদে আদায় করার পর দ্বিতীয় নামাযের জন্য মসজিদে আগমন করা এটা তোমার পূর্বের নামায কবুল হওয়ার আলামত। আল্লাহ পূর্বের নামায কবুল করেছেন তাই দ্বিতীয় নামাযের জন্য মসজিদে আসার তাওফীক দিয়েছেন। যদি তিনি নারাজ হতেন, তাহলে তোমাকে ঘরের মধ্যেই বারণ করে রাখতেন। পিতা তার সন্তানকে ঘরে আসতে বাধা দেয়, ভাই ভাইকে নিষেধ করে। স্বামী তার স্ত্রীকে ঘরে আসতে বারণ করে। সুতরাং আল্লাহ নারাজ হলে তোমাকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। সুতরাং এটা দলিল হয়ে গেল, আল্লাহ তোমার সঙ্গে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। তিনি তোমাকে দিতে চান। তুমি তোমার ঝুলি বিছিয়ে দাও। এবার তোমার ব্যাপার। তুমি কতটুকু চাইবে তা তুমি নিজেই ভালো জান।

(৫) তাকওয়া বা সংযম : আমল কবুল হওয়ার পঞ্চম আলামত হচ্ছে তাকওয়া। যে-পরিমাণ মুত্তাকী হবে, সেই অনুযায়ী তার আমল গ্রহণযোগ্যতার সৌভাগ্য পাবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের আমল কবুল করে থাকেন।'[১]

এর অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭

যেমন– ওলামাদের সরদার খাজা আবদুল মালেক সিদ্দিকী (রহ.)-এর তাকওয়ার কথা শুনলে অস্থির হতে হয়। তিনি শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে হাতে ছাতা রাখতেন। একদিন কোনো আলেম জিজ্ঞেস করে ফেললেন, হুজুর! শীতকালে ও ছাতা রাখার রহস্য কী? তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি যেহেতু আলেম তাই তোমাকে বিষয়টা বলে তোমার বিবেক পরিষ্কার করা দরকার। শোনো শীত বা গরম কোনো সময়ই আমার ছাতার প্রয়োজন নেই। আমি ছাতা টানিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হলো আমার চলার পথে যেদিক থেকে গায়রে মাহরাম মহিলা আসে, সে দিকে আমি ছাতাটা ঝুঁকিয়ে দিই। এতে আমি গায়রে মাহরামের চেহারা তো দূরের কথা তার শাড়ির আঁচলও দেখি না। সুতরাং মানুষের হাতে ছাতা রাখার উদ্দেশ্য হলো রোদ-বৃষ্টি থেকে হেফাযতে থাকা আর আমার ছাতা রাখার উদ্দেশ্য হলো গায়রে মাহরাম দেখা থেকে বিরত থাকা। সুবহান্নাল্লাহ!

ভাই! এভাবে গায়রে মাহরাম থেকে বেঁচে থাকতে পারলে আল্লাহ তাকে কী দান করবেন? হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহ ওই বান্দাকে ঈমানের মাধুর্য দান করবেন। হযরত আবদুল মালেক সিদ্দিকী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি নিজে নামায পড়াতেন। ইকামাত শেষ হওয়ার পর ১৫-৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত বিলম্ব করে নিয়ত বাঁধতেন। একদিন কোনো আলেম জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! ইকামাত শেষ হওয়ার পরও দেখছি আপনি অপেক্ষা করে নিয়ত বাঁধেন। এর বিশেষ কোনো রহস্য আছে কি? তিনি বললেন, বাবা! তুমি আলেম মানুষ। তোমারও ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়। আর আমি ফকির মানুষ। জায়নামাযে দাঁড়ানোর পর কাবা শরীফের চিত্র আমার সামনে ভেসে না এলে আমি তাকবীরে তাহরীমা বলি না। তাই একটু দেরি হয়।

দেখুন, একদিকে গায়রে মাহরাম থেকে চোখের হেফাযত, অপর দিকে এমন নামায দান করলেন, যার মধ্যে কাবা শরীফের চিত্র দেখতে পান। সুতরাং যে-পরিমাণ তাকওয়া সেই পরিমাণ কবুল।

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর কিতাব সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হলো কোন কারণে? একমাত্র তাঁর পরহেযগারির কারণে।

আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের মেহনত আল্লাহর দরবারে অনেক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে দেওবন্দের সুখ্যাতি রয়েছে। তা কীভাবে সাধিত হলো? একমাত্র তাদের পরহেযগারির কারণে।

(৬) দু'আ : আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার ষষ্ঠ আলামত হলো, দু'আ, কান্না ও প্রার্থনার ফলে আমল কবুল হয়। পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ বিদ্যমান। দেখুন, হযরত ইমরান (আ.)-এর স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালেন–

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

'হে আল্লাহ! আমার গর্ভে যে-সন্তান রয়েছে, আমি তাকে তোমার জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তাকে আপনি আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।'[১]

এদিকে মা অনুনয়বিনয় করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছেন, অপর দিকে আল্লাহ বললেন–

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

'আল্লাহ তাকে উত্তমরূপে কবুল করেছেন এবং তাকে অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি দান করলেন।'[২]

যদি উপরে বর্ণিত সকল আলামতের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখা যাবে, একমাত্র দু'আ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই, যার দ্বারা আমাদের আমল পরিমাপ করতে পারব। সুতরাং ভাই! আল্লাহর দরবারে দু'আ করা চাই, যাতে তিনি আমাদের টুটাফাটা আমলগুলো কবুল করেন।

আমল গ্রহণ হওয়ার জন্য নবীগণের চিন্তা

আম্বিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে আতঙ্কিত হতেন।

اِبْتِهَالُ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللهِ بِأَنْ يَرْزُقَهُمُ الْقُبُوْلَ

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর বন্ধু। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ

'স্মরণ করো ওই সময়ের ঘটনা, যখন ইবরাহীম ও তার সন্তান ইসমাঈল আমার ঘরের দেওয়াল উত্তোলন করেছিল।'[৩]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৫
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৮
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৭

তখন তাঁরা কী বলেছিলেন–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পক্ষ থেকে এ কাজ কবুল করুন।'[১]

কবুলের জন্য ইবরাহীম (আ.) আরো কী বলেছেন শুনুন–

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝

'হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার আওলাদকে নামাযী বানাও এবং আমাদের দু'আ কবুল করো।'[২]

স্বয়ং নবীজি উম্মতকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা আমাদের আমল কবুল হওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখব। অনেক দু'আ রয়েছে, যেগুলোতে নবীজি আমাদের কবুলের জন্য প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন–

হাদীছ শরীফে এসেছে, নবীজি কোনো প্রাণী জবাই করার সময় দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে এই কুরবানিকে কবুল করে নিন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি দু'আ করতেন–

رَبِّ أَعِنِّي تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي

'হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো, আমার তওবা কবুল করো এবং আমার প্রার্থনার জবাব দাও। অর্থাৎ– গ্রহণ করো।

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ حَسَنَاتِي

'হে আল্লাহ! আমার নেক কাজগুলো কবুল করুন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইফতারের সময় এই দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৭
২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৪০

'হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি। কাজেই আপনি আমার এই ইবাদতটি কবুল করে নিন।'

হযরত উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, নবীজি এ দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী ইল্‌ম, পবিত্র রিযিক ও গ্রহণযোগ্য আমলের প্রার্থনা করি।'

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আমল কবুল না হওয়ার ভয়

এতক্ষণ আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি, এবার সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর মধ্যে সেগুলোর প্রাক্টিক্যাল নমুনা লক্ষ করুন। তারা ওই জামাত, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর হাবীবের সান্নিধ্যের জন্য চয়ন করেছিলেন। যারা তাদের ওস্তাদের দক্ষতার আয়না ছিলেন। বলা হয়, শিক্ষকের যোগ্যতা দেখতে হলে তাঁর ছাত্রের জীবনীর প্রতি লক্ষ করুন। সুতরাং নবীজির কামালাত দেখতে হলে সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর ওপর আলোকপাত করুন।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার। আর সাহাবায়ে কেরাম আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা সম্পর্কে নবীজিকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, নবীগণের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার। উভয় দিকের সংখ্যা সমান হওয়ার রহস্য সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ যতজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন, প্রত্যেকের কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্য আমাদের নবীর সাহাবাদের মধ্য থেকে কারো-না-কারো নিকট বিদ্যমান ছিল। সুবহানাল্লাহ!

এজন্যই নবীজি ইরশাদ করেন–

اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

'আমার সাহাবারা আকাশের তারকার মতো। তোমরা এদের যে-কারো অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পেয়ে যাবে।'

ওই সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা বলা হয়। অর্থাৎ– জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন। তাদের নাম ধরেধরে নবীজি বলেছেন, এরা জান্নাতে যাবে।

সুবহানাল্লাহ! তারা ওই সমস্ত লোক ছিলেন, যাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

'আল্লাহ তাদের প্রতি রাজী এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাজী।'[১]

এত সব সুসংবাদ থাকা সত্ত্বেও তারা ভয়ে অধীর থাকতেন, জানি না আমার মৃত্যুর সময় কী অবস্থা হবে। এবার আমল সম্পর্কে তাদের ভয়ের একটু চিত্র দেখুন। আশা করি, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। সেগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযি.)

খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে সর্বপ্রথম খলিফা হলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযি.)। তিনি এমন মর্যাদাবান সাহাবি ছিলেন, যাঁর সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেন–

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ

'উম্মতের মধ্য থেকে যদি আমি কাউকে আমার বন্ধু বানাতাম, তাহলে অবশ্যই আবুবকরকে বানাতাম।'[২]

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوْنَ أَهْلَ عِلِّيِّيْنَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا

'জান্নাতিরা জান্নাতে যাওয়ার পর নিচের লোকেরা উপরের লোকদের এভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশের তারকা দেখে থাক। আবুবকর ও ওমর তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে।'[৩]

ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে 'খানায়ে রাসূল' বলেছেন। এর মর্ম কী? অর্থাৎ– জান্নাতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-স্তরে থাকবেন, তারাও ওই স্তরে থাকবেন। কীভাবে? যেভাবে তোমরা ডাবল

---

১. সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ৮

২. মিশকাত- হাদীছ নং ৫৫৫

৩. মেশকাত- হাদীছ নং ৫৫৯

স্টোর ঘরগুলো দেখে থাক, ঠিক তেমনিভাবে নবীজি একই ঘরের ওপর তলায় থাকবেন আর আবুবকর ও ওমর (রাযি.) সেই ঘরের নিচের তলায় অবস্থান করবেন।

নবীজি ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ আমার দেহ বানানোর পর কিছু মাটি অবশিষ্ট থেকেছিল। সেগুলো দিয়ে আবুবকরকে বানিয়েছেন। অতঃপর কিছু মাটি অবশিষ্ট থাকলে সেগুলো দিয়ে ওমরকে বানিয়েছে। অর্থাৎ– একই মাটি দ্বারা বানিয়েছেন। এরপর দেখুন, আল্লাহ পুনরায় তিনটি দেহ একই মাটির মধ্যে একত্রিত করেছেন। নবীজি ইরশাদ করেন, আমি সকলের অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়েছি। কিন্তু আবুবকর! তোমার অনুগ্রহের প্রতিদান কেয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে প্রদান করবেন। নবীজির ওপর তিনি এমন অনুগ্রহ করেছিলেন।

তাবুকের যুদ্ধের সময় নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, খুবই সংকটময় সময় অনেক দূরের যাত্রা। সুতরাং আল্লাহর বাস্তায় যার-যার সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ জমা করুন। হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, ওই সময় আমার নিকট বেশ সম্পদ ছিল। আমি মনে-মনে ভাবলাম, এবার আবুবকরকে হারিয়ে দেব। আমি তাঁর থেকে বেশি দান করব। সুতরাং ঘরের সমস্ত সম্পদ দুটি ভাগ করে এক ভাগ পরিবারের জন্য রেখে আরেক ভাগ নবীজির দরবারে নিয়ে এলাম। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, ওমর! পরিবারের লোকজনের জন্য কী রেখে এসেছ? আমি বললাম, হুজুর! সমস্ত মাল দুই ভাগ করে এক ভাগ তাদের জন্য রেখে এসেছি। এতক্ষণে নিঃস্ব আবুবকর এসে উপস্থিত হয়ে সামান্য কিছু মাল নবীজির সামনে উপস্থিত করলেন। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর! তোমার পরিবারের লোকদের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ

'হে আল্লাহর রাসূল! পরিবারের লোকজনের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।'[১]

অর্থাৎ– ঘরে যা কিছু ছিল সব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এমনকি গায়ের পোশাকটা খুলে চটের পোশাক পরিধান করে এসেছেন। শুধু তা-ই নয়; ঘরে কাঁচা দেওয়ালে হাত বুলিয়ে দেখছেন কোথাও কোনো সুঁই

---

১. মিশকাত- হাদীছ নং ৫৫৫

আছে কিনা। থাকলে সেটাও নিয়ে এসেছেন। সব কিছু উপস্থিত করে দেওয়ার ফলে নবীজি আর্শ্চয বোধ করলেন যে, ঘরের সব কিছু নিয়ে এসেছেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন। সালাম জানিয়ে নবীজিকে বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! আল্লাহ আবুবকরের প্রতি সালাম জানাচ্ছেন। তখন নবীজি দেখলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরনে চট রয়েছে। শায়খুল হাদীছ (রহ.) বলেন, এই অবস্থা দেখে নবীজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জিবরাঈল! আজ এই চটের পোশাক পরিধান করার কারণ কী? তিনি উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আবুবকরের আজকের কাজ আল্লাহর নিকট এত পছন্দ হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশের সকল ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আজ তোমরা সবাই আবু বকরের পোশাকের মতো পোশাক পরো। তাই আমরা আকাশবাসী সবাই আবুবকরের পোশাকের অনুরূপ পোশাক পরিধান করেছি। তারপর বললেন, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন, যাও; আবুবকরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, সে এই অবস্থায় আমার ওপর রাজী আছে কি-না? একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর দু-চোখ বেয়ে পানি নেমে এল। তিনি বললেন, আমি আমার মালিকের প্রতি সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট আছি।

এবার শুনুন, এমন মর্যাদাবান সাহাবি যাঁর নিকট আরশ থেকে সালাম আসে, তার ব্যাপারে কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি যখন কোনো পাখি দেখতেন, তখন বলতেন–

طُوْبٰى لَكَ يَا طَيْرُ مَا اَنْعَمَكَ عَلٰى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ تَأْكُلُ مِنْ هٰذِهِ الثَّمَرَةِ ثُمَّ تَمُوْتُ ثُمَّ لَاتَكُوْنُ شَيْئًا لَيْتَنِىْ مَكَانَكَ يَا لَيْتَ اَبَا بَكْرٍ مِثْلَكَ

'হে পাখি! তোমার কল্যাণ হোক! তুমি এ বৃক্ষের ওপর কত সুখে বসে আছ। তুমি বৃক্ষের ফল খাবে, অবশেষে মরে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তোমাকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত করে দেবেন। আফসোস! যদি আমি তোমার জায়গায় হতাম। আফসোস! যদি আবুবকর তোমার স্থানে হতো, তাহলে তার কোনো হিসাব হতো না।

একবার তিনি বলেন–

لَيْتَنِىْ شَجَرَةٌ تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلُ

আফসোস! যদি আমি গাছ হতাম; অতঃপর আমাকে খেয়ে ফেলা হতো!

অন্য একসময় বলেছিলেন–

لَيْتَنِيْ خَضِرَةٌ تَأْكُلُنِي الدَّوَابُّ

আফসোস! যদি আমি ঘাস হতাম, তাহলে চতুষ্পদ প্রাণী আমাকে খেয়ে ফেলত। এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়ার ভয়। এগুলো হলে আমাকে আর হাজিরা দিতে হতো না। তিনি বলতেন, আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরের বিষয়।

হযরত ওমর (রাযি.)

হযরত ওমর (রাযি.) সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেন–

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

'ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! হে ওমর! তুমি যে-রাস্তায় হাঁট, শয়তান সেই রাস্তা ছেড়ে দেয়।'[১]

অন্য হাদীছে নবীজি ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ

'আগেকার উম্মতের মধ্যে কতিপয় লোকের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম আসত। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কারো নিকট এমন হতো, তাহলে সে ব্যক্তি তুমি ওমর হতে।'[২]

তিনি ওই ওমর ছিলেন

اَلَّذِيْ كَانَ رَأْيُهٗ مُوَافِقًا لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ

যার সিদ্ধান্ত ওহী ও কুরআনের অনুযায়ী হতো। যে-সাহাবির এমন মর্যাদা ছিল, তিনি বলতেন–

وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ لِيْ طِلَاءَ الْاَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهٖ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ

আফসোস! যদি আমার নিকট পৃথিবীর সমপরিমাণ সোনা থাকত আর আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আমি সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারতাম, তাহলে আমি দান করে দিতাম।

---

১. মেশকাত- হাদীছ নং ৫৫৭

২. মেশকাত- হাদীছ নং ৫৫৬

কোনো-কোনো সময় তিনি বলতেন–

وَيْلِيْ وَيْلٌ لِاُمِّيْ اِنْ لَمْ يَرْحَمْنِيْ رَبِّيْ

'আমার ধ্বংস, আমার মায়ের ধ্বংস যদি আল্লাহ কেয়ামতের দিন আমার ওপর দয়া না করেন!'

একবার প্রাণীর ভুষির ওপর দৃষ্টি পড়লে তিনি বললেন–

يَا لَيْتَنِيْ مِثْلَ هٰذِهِ التِّبْنَةِ

'আফসোস! যদি আমি এই ভুষির মতো হয়ে যেতাম!'

لَيْتَ اُمِّيْ لَمْ تَلِدْنِيْ

'আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন!'

لَيْتَنِيْ لَمْ اَكُ شَيْئًا

'আফসোস! যদি আমি কোনো বস্তুই না হতাম!'

لَيْتَنِيْ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

'আফসোস! যদি আমি একেবারে ভুলে যাওয়া বস্তু হতাম!'

একবার নামায পড়ছিলেন। যখন এ আয়াত পাঠ করলেন–

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ

'তাদের দাঁড় করাও; নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'[১]

তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি সেই কান্নার শব্দ একেবারে শেষ কাতারের লোকেরা পর্যন্ত শুনেছে। অতঃপর এই ভয়ের দরুন এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। আল্লাহকে এমন ভয় করতেন।

হযরত ওছমান (রাযি.)

ওছমান (রাযি.) সম্পর্কে নবীজি আয়েশা (রাযি.)কে বললেন–

يَا عَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

'হে আয়েশা! আমি কি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে লজ্জা বোধ করব না, যার ব্যাপারে ফেরেশতারা লজ্জা বোধ করে।'[২]

---

১. সূরা সাফফাত : আয়াত ২৪

২. মেশকাত- হাদীছ নং ৫৬১

একবার নবীজি বললেন–

اَللّٰهُمَّ عُثْمَانَ رَضِيْتُ عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ

'হে আল্লাহ! আমি ওছমানের প্রতি রাজী। সুতরাং আপনিও তার প্রতি রাজি হয়ে যান। যে ওছমান (রাযি.)-এর ব্যাপারে নবুওতের জবানে এমন স্তুতিপূর্ণ বাণী বের হয়েছে, সেই ওছামন বলেন–

لَوْ وَقَفْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَخُيِّرْتُ بَيْنَ اَنْ اَصِيْرَ رَمَادًا اَوْ اُخَيَّرَ اِلٰى اَيِّ دَارٍ فِيْهِ لَاخْتَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ رَمَادًا

যদি আমাকে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করে বলা হয়, তোমার হিসাব নিয়ে জান্নাতে অথবা দোযখে দেওয়া হবে। অথবা হিসাব না নিয়ে তোমাকে মাটি বানিয়ে দেওয়া হবে। এ দুটির মধ্যে আমাকে স্বাধীনতা দিলে আমি অবশ্যই মাটি হওয়াকে পছন্দ করব। এ হলো ওছমান (রাযি.)-এর কথা, যাঁর ব্যাপারে ফেরেশতারা লজ্জা বোধ করেন, যাঁর ব্যাপারে নবীজি এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে বলেছিলেন, এ হচ্ছে আমার হাত। এ হলো ওছমানের হাত। অতঃপর বাইয়াত নিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.)

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) দামেশকের বিচারপতি ছিলেন। একবার হযরত সালমান ফারসি (রাযি.) তাঁকে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বলেছিলেন, আবুদ্দারদা নিজের দেহের প্রতিও দৃষ্টি রেখো। তখন নবীজি তাঁর কথাকে সত্যায়ন করলেন–

يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ

'হে আবুদ্দারদা! নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার দেহের হক রয়েছে যেমনটা সালামান তোমাকে বলেছে। সেই আবুদ্দারদা (রাযি.) বলতেন–

لَوْ لَا ثَلَاثٌ مَا اَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ سَاعَةً ظَمَأُ الْهَوَاجِرِ وَالسُّجُوْدُ فِي اللَّيْلِ وَمُجَالَسَةُ اَقْوَامٍ يَنْتَقُوْنَ جَيِّدَ الْكَلَامِ كَمَا يُنْتَقٰى اَطَايِبَ الثَّمَرِ

যদি তিনটি বিষয় না হতো, তাহলে জীবনের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ থাকত না। ১. প্রচণ্ড গরমে দুপুরবেলা রোযা অবস্থায় থেকে পিপাসিত থাকা। ২. রাতে সেজদা করা। ৩. আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে গমন করা।

তোমরা যেমন ভালো-ভালো ফুল চয়ন কর, তেমনি তারা নিজের জীবনে ভালো-ভালো কথাকে চয়ন করতেন। তার ব্যাপারে নবীজি বলেন–

إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ يَشْفُوْنَ مِنَ الدَّاءِ

যাদের নিকট বসলে রুহানি শেফা পাওয়া যায়, আবুদ্দারদা ওই ওলামা ও ফোকাহার অন্তভুর্ক্ত। অথচ তিনি বলতেন–

لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَقَدْ تَقَبَّلَ لِيْ صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

'যদি আমি জানতে পারি, আল্লাহ আমার একটি নামায কবুল করেছেন, তাহলে সেই সংবাদ আমার দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, সব থেকে উত্তম মনে করব।'

তাদের ওপর আল্লাহর ভয়ের এমন প্রাধান্য ছিল।

হযরত আবুযর গেফারি (রাযি.)

হযরত আবুযর গেফারি (রাযি.) গেফার গোত্রের লোক ছিলেন। ওই গোত্রের লোক মক্কার মধ্যে লুঠতরাজ ও নাশকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যেকোনো ব্যবসায়ী মালামাল নিয়ে মক্কার পাশ দিয়ে গমন করলে তারা লুট করে সব কিছু নিয়ে যেত। সেই গোত্রের লোক আবুযর ইসলাম গ্রহণ করে নবীজির সান্নিধ্য পেয়ে কেমন মানুষ হলেন? একবার নবীজি বলেন, আবুযর! তোমার মতো সত্যাবাদী মানুষ আজ পৃথিবীতে কমই আছে। নবীজি আরো বলেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَهُ إِلَى تَوَاضُعِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِيْ ذَرٍّ

'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনয় দেখতে চাও, তাহলে আবুযরকে দেখে নাও।'

একজন নবীর বিনয় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সেই আবুযর বলেন–

وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنِيْ يَوْمَ خَلَقَنِيْ شَجَرَةً تُعْضَدُ وَيُؤْكَلُ ثَمَرُهَا

আল্লাহর শপথ! আমি আকাঙ্ক্ষা করি, আফসোস! আল্লাহ আমাকে যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন, ওই দিন যদি আমাকে কোনো গাছ বানাতেন আর আজ আমাকে কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলত! তারা এ সমস্ত কথা কেন বলতেন? কেননা, তারা আল্লাহর মাহাত্ম্যের কথা জানতেন।

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রাযি.)

আবু উবায়দা ইবনুল জাবরাহ সেনাপতি ছিলেন। সুবহানাল্লাহ! দেখুন, আল্লাহ কীভাবে মিলিয়ে দেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মেজাজ খুব নরম ছিল। তদুপরি আল্লাহ সেনাপতি বানালেন হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)কে, যিনি ছিলেন কড়া মেজাজের মানুষ। তারপর খলিফা হলেন হযরত ওমর (রাযি.), যিনি অত্যন্ত চড়া মেজাজের মানুষ। কিন্তু তাঁর শাসনামলে আল্লাহ সেনাপতি বানালেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রাযি.)কে, যিনি কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। নবীজি বললেন–

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

'প্রত্যেক উম্মতে একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে আর আমার উম্মতের বিশ্বস্ত লোক হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাবরাহ।'

একটি হাদীছ পাঠ করার সময় তাকে আমার চুমু দেওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল। আল্লাহু আকবার! আল্লাহর প্রিয় হাবীব কেমন ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন–

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا لَوْ شِئْتُ لَاَخَذْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهٖ اِلَّا اَبَا عُبَيْدَةَ

'তোমাদের মধ্যে একমাত্র আবু উবায়দা এমন ব্যক্তি, যার কতিপয় আমল দেখে আমার মন চায়, এ আমলটি আমার মধ্যেও যেন হয়।'

আল্লাহু আকবার!

আর সেই আবু উবায়দা (রাযি.) বলেন–

وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ كَبْشًا وَيَذْبَحُوْنِيْ اَهْلِيْ وَيَاْكُلُوْنَ لَحْمِيْ وَيَشْرَبُوْنَ مَرَقِيْ

'আফসোস! যদি আমি ভেড়া বা দুম্বা হতাম আর আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে জবাই করে খেয়ে নিত!'

ভাই! কেয়ামতের ব্যাপারটা কিন্তু সহজ নয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কেয়ামতের কল্পনা করে কেঁদে উঠতেন।

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) মুহাদ্দিছ ও হাফেযগণের সরদার ছিলেন। একবার আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে লাগলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন–

اَمَا اَنِّیْ لَا اَبْکِیْ عَلٰی دُنْیَاکُمْ هٰذِهٖ وَلٰکِنْ اَبْکِیْ لِبُعْدِ سَفَرِیْ وَقِلَّةِ زَادِیْ اَصْبَحْتُ فِیْ صَعُوْدٍ مُهْبِطَةٍ عَلٰی جَنَّةٍ اَوْ نَارٍ فَلَا اَدْرِیْ اِلٰی اَیَّتِهِمَا یُسْلَكُ بِیْ

'আমি তোমাদের এ পৃথিবীর জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি, আমার সফর অনেক লম্বা; কিন্তু পাথেয় কম। আমি একটি ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যা জান্নাত অথবা জাহান্নামে নিয়ে পৌঁছাবেই। আর আমি তো জানি না, এ দুটির মধ্যে কোনটির দিকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জান্নাতে যাব, নাকি জাহান্নামে যাব তা তো আমার জানা নেই!

হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রাযি.)

হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রাযি.)কে নবীজি 'রহস্য উদঘাটনকারী' বলেছেন। একবার বসে-বসে কাঁদছেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, জনাব! কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন–

مَا اَبْکِیْ اَسَفًا عَلَی الدُّنْیَا بَلِ الْمَوْتُ اَحَبُّ اِلَیَّ وَلٰکِنْ لَا اَدْرِیْ عَلٰی مَا اُقْدَمُ عَلَی الرِّضَا اَمْ عَلٰی سَخَطٍ

'আমি এ পৃথিবীর জন্য আক্ষেপ করছি না। বরং মৃত্যু আমার প্রিয় জিনিস। তবে আমার একথা জানা নেই যে, আমাকে যখন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হবেন, নাকি অসন্তুষ্ট হবেন।

হযরত হাসান (রাযি.)

নবীজির নাতি, যাঁর ব্যাপারে নবীজি বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ

'হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি; আপনিও তাকে ভালোবাসুন।'

নবীজি আরো বলেন–

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

'হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা।'

আর তিনি বলতেন–

اِنِّیْ اَقْدُمُ عَلٰی عَظِیْمٍ وَهَوْلٍ لَمْ اَقْدُمْ عَلٰی مِثْلِهٖ قَطُّ

'আমি এমন এক সংকটময় ভয়ানক বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যার মতো কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন কোনোদিন হইনি।'

হযরত আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম হযরত সালিম (রাযি.)

হযরত সালিম (রাযি.) আবু হুযায়ফার গোলাম ছিলেন। পরিশেষে তাকে আযাদ করে নিজের ছেলে বানিয়ে ঘরে রাখলেন। কিছুদিন পর পর্দার আয়াত নাযিল হয়ে গেল। আবু হুযায়ফার স্ত্রী নবীজিকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সালিমকে আমরা আমাদের সন্তান বানিয়েছি। সে আমাদের নিকট আপন ছেলের মতোই আসা-যাওয়া করে। এখন আমরা কী করতে পারি। নবীজি বললেন, একমাত্র তোমাদের জন্য অনুমতি দিচ্ছি– অন্য কারো ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। তোমরা সালিমকে তোমাদের দুধ পান করিয়ে দাও; তাহলে সে তোমাদের সন্তান হয়ে যাবে। সুতরাং তারা সেটা করেছেন। তাকে নিজের সন্তান বানিয়েছেন।

কিন্তু এটা একমাত্র তাদের জন্য খাস ছিল। অন্য কারো জন্য নয়। কেননা, দুধ পানের সময়কাল শেষ হওয়ার পর দুধ পান করলে তার দ্বারা বংশ প্রমাণিত হয় না।

যাক হযরত সালিম (রাযি.) আল্লাহর প্রেমিক যুবক। তিনি কেমন ভালোবাসেন আল্লাহকে? নবীজি তাঁর ব্যাপারে বলেন–

يُحِبُّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ

'সালিম অন্তর থেকেই আল্লাহকে সত্যিকারের মহব্বত করে।'

নবীজির মুখের বাণী এরকম। আর সেই সালিম বলেন–

وَدِدْتُ اَنِّي بِمَنْزِلَةِ اَصْحَابِ الْاَعْرَافِ

আমি কামনা করছি যে, কেয়ামতের দিন আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম কোনোটিতে না দিয়ে যদি আরাফে দেওয়া হতো। অর্থাৎ– হিসাব-কিতাব না নিয়ে যদি এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হতো?

যার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি এমন ভালোবাসা ছিল, নবীজির জবানে যাঁর সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তিনি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়াকে এমন ভয় করতেন। আফসোস! যদি আমাদের অন্তরে উদাসীনতার পর্দা না থাকত, তাহলে আমরাও অনুভব করতে পারতাম, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া কত ভয়ানক। এজন্যই আমাদের আকাবির এ আয়াতটি পাঠ করতেন আর কাঁদতেন।

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে।'[১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)

হযরত আয়েশা (রাযি.)কে নবীজি সুসংবাদ দিলেন, কেয়ামতের দিন তুমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে থাকবে। তাঁর ব্যাপারে আলেমগণ লিখেছেন–

اَفْقَهُ نِسَاءِ الْاُمَّةِ عَلَى الْاِطْلَاقِ

'সাধারণভাবে উম্মতের সকল মহিলা থেকে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।'

সাহাবায়ে কেরাম দীনের অর্ধেক বিষয় নবীজি থেকে শিক্ষা করেছেন এবং অর্ধেক অর্থাৎ– ঘরের বিষয়াবলি হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে শিক্ষা করেছেন। সেই আয়েশা (রাযি.) যাঁকে আল্লাহ নবীজির জন্য পছন্দ করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) আয়েশার আকৃতি নবীজির নিকট উপস্থিত করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে একে চয়ন করেছেন। সেই আয়েশা, যাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর নবী। তাঁকে চরিত্রহীনতার অপবাদ দেওয়া হলো। আল্লাহ ছোট একটি দুধের শিশুর মাধ্যমে তাঁর নির্দোষিতার সাক্ষ্য প্রদান করালেন। হযরত মারয়াম (আ.) নবীর মা। অপবাদের গ্লানি এল। আল্লাহ তাঁর দুধের শিশুর দ্বারা তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, অপবাদের ছাপ লাগানোর চেষ্টা করা হলো, আল্লাহ নিজে তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিলেন–

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

'আল্লাহ মহাপবিত্র! এটা অনেক বড় অপবাদ!'[২]

যাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, আজও কুরআনে তা তেলাওয়াত করা হয়, নামাযে পড়া হয়, সেই আয়েশা (রাযি.) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرَائِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ

'হে আয়েশা! ইনি জিবরাঈল তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন!'

---

১. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ৬
২. সূরা নূর : আয়াত ১৬

নবীজি عائش বলেছেন। আরবাসীরা অনেক সময় বিশেষ করে মহব্বতের সময় নামের শেষে কিছু বর্ণ বাদ দিয়ে উচ্চারণ করে। একে ব্যাকরণের ভাষায় মুনাদা মুরাখখাম বলা হয়।

يا عائش বলে সংবাদ জানাচ্ছেন। আয়েশা! জিবরাঈল তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন। সেই আয়েশা (রাযি.) যাঁর ব্যাপারে নবীজি বলেন–

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلٰى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ

'পৃথিবীতে সকল মহিলার মধ্যে আয়েশার ফযিলত এমন সমস্ত খাবারের মধ্যে সারীদের ফযিলত যেমন।'

সেই আয়েশা (রাযি.) বলেন–

فَوَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

'আল্লাহর শপথ, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, যদি আমি একেবারে ভুলে যাওয়া বস্তু হতাম! তিনি আরো বলেন,

يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ وَرَقَةً مِّنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

'আফসোস! যদি আমি কোনো গাছের পাতা হয়ে যেতাম!'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেন–

رَحِمَ اللّٰهُ ابْنَ رَوَاحَةَ اِنَّهٗ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِيْ تَتَبَاهٰى بِهَا الْمَلَآئِكَةُ

'আল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর অনুগ্রহ করুন। তিনি ওই সমস্ত মজলিসে বসতে পছন্দ করেন, যেগুলো সম্পর্কে ফেরেশতারা গর্ব করে।'

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ! কাঁদছে কেন? তিনি উত্তর দিলেন–

وَاللّٰهِ مَا بَكَيْتُ جَزَعًا مِّنَ الْمَوْتِ وَلٰكِنِّيْ بَكَيْتُ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا وَلَمْ اَدْرِ اَنَجُوْ مِنْهَا اَمْ لَا

'আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিনি। আমি আল্লাহর এই বাণীর চিন্তায় কাঁদছি,

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

'তোমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নামের ঘাটে উপস্থিত করা হবে।'[১]

সুতরাং আমি তো জানি না সেখান থেকে মুক্তি পাব কিনা।

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) সম্পর্কে নবীজি বলেন–

رَجُلٌ صَالِحٌ

'পুণ্যবান লোক।'

অন্য জায়গায় বলেছেন–

نِعْمَ الرَّجُلُ

'ভালো মানুষ।'

নবীজির পবিত্র জবানে এমন স্তুতিপূর্ণ বাণী তাঁর সম্পর্কে বের হলো। হযরত সাইদ ইবনে মুসায়্যাব তাবেয়ী। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) সম্পর্কে বলেন, যদি কারো সম্পর্কে আমি জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হতাম, তাহলে অবশ্যই আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতাম যে, তিনি জান্নাতি। তার গোলাম নাফে' বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)কে নবীজির সুন্নতের প্রতি এমন আসক্ত দেখতাম যে, তার অবস্থা দেখে আমি বলতাম, সত্যিই তিনি নবীজির জন্য পাগল হয়ে গেছেন। তিনি রাসূলের সুন্নতের এমন আশেক ছিলেন। একবার তিনি তেলাওয়াত করতে-করতে এ আয়াতে পৌঁছলেন

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'মানুষ কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।'[২]

এ আয়াতটি পাঠ করে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এমনকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ওই সময় আর কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেননি। তিনি বলতেন–

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭১

২. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ৬

لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى تَقَبَّلَ مِنِّيْ سَجْدَةً وَاحِدَةً اَوْ صَدَقَةَ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْمَوْتِ

'যদি আমি জানতে পারি, আল্লাহ আমার একটি সেজদা অথবা একটি টাকার সদকা আমার পক্ষ থেকে কবুল করেছেন, তাহলে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কোনো বস্তু আমার নিকট প্রিয় থাকবে না।'

আরো বলেন, আমি যদি জানতে পারি, আমার একটি সেজদা কবুল করা হয়েছে, তাহলে আর কোনো দিন সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতাম না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.)

কিছু-কিছু সাহাবি নবীজির হাদীছ শ্রবণ করতেন, মুখস্থ করতেন। আর কিছু সাহাবি হাদীছ শুনতেন, মুখস্থ করতেন এবং লিখতেন। তিনি দ্বিতীয় স্তরের সাহাবি ছিলেন। শুনতেন ও লিখতেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ সহীফায়ে সাদেক এখনো পৃথিবীতে বিদ্যমান। তিনি হাদীছের লেখক ছিলেন। তিনি বলেন–

وَاللهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ هٰذِهِ السَّارِيَةُ

আফসোস! যদি আমি এ খুঁটি হয়ে যেতাম, তাহলে আমার কোনো হিসাব দিতে হতো না, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) কে ফেরেশতারা ও সালাম করতেন। তিনি বলেন

يَالَيْتَنِيْ رِمَادًا تَذْرِيْنِيَ الرِّيْحُ

আফসোস! যদি আমাকে মাটি বানিয়ে দেওয়া হতো, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত।

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযি.)

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযি.) বলেন–

وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ كَبْشًا لِاَهْلِيْ فَذَبَحُوْنِيْ فَشَوَوْنِيْ كَ وَاَكَلُوا لَحْمِيْ

আফসোস! যদি আমি আমার পরিবারের জন্য দুম্বা হয়ে যেতাম আর তারা জবাই করে আমার গোশত ভুলা করে খেয়ে নিত!

হযরত মু'আজ বিন জাবাল (রাযি.)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) সম্পর্কে নবীজি বলেন–

اَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ

মু'আয ইবনে জাবাল হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।'

নবীজি নিজেই তাকে শিক্ষক বানিয়ে ইয়ামান প্রেরণ করেছিলেন। তাকে প্রস্তুত করে সাওয়ারিতে বসিয়ে নবীজি সাথে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে এগিয়ে দিয়ে এসেছেন। ওই সময় নবীজি তাকে একটি কথা বলেছিলেন, যা তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কষ্টে সহ্য করেছিল–

يَا مُعَاذُ اِنَّكَ عَسٰى اَنْ لَّا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا

'মু'আয! হয়তো এ বছর পর তুমি আর আমার দেখা পাবে না।'

وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ وَقَبْرِيْ

'আর হয়তো তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে।'

সেই আশেকে রাসূল এ বাক্যগুলো শুনে তাঁর হৃদয়ে কী অবস্থা হয়েছিল?

فَبَكٰى مُعَاذٌ جَعْشًا بِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবীজির বিচ্ছেদের বাণী শুনে তিনি আবেগে অঝোরধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। নবীজি তাঁকে বললেন–

يَا مُعَاذُ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ فِي اللهِ

'আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে ভালোবাসি হে মু'আয!'

এ সমস্ত বাক্য শুনে আমার ওস্তাদ ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই মু'আয কী বলে শুনুন–

اِنَّ اللهَ قَبَضَ قَبْضَتَيْنِ فَجَعَلَ وَاحِدَةً فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ فَلَا اَدْرِيْ فِيْ اَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ اَكُوْنُ

আল্লাহ দুই মুষ্টি মাটি নিয়ে এক মুষ্টি জাহান্নামে এবং এক মুষ্টি জান্নাতে নিক্ষেপ করে দিলেন। আমি তো জানি না, আমার রুহ কোন মুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আমি তো জানি না, আমি জাহান্নামে যাব, নাকি জান্নাতে যাব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সম্পর্কে হযরত ফকীহুল উম্মত (রাযি.) বলেন–

كَانَ مِنَ السَّابِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ

'তিনি অগ্রগণ্য প্রথম সারির মুসলমান ছিলেন।'

৬ষ্ঠ নম্বরে ইসলাম গ্রহণকারী, যাঁর হালকা-পাতলা গোছা দেখে সাহাবায়ে কেরাম হাসছেন। তখন নবীজি বললেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُمَا اَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ اُحُدٍ

'ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ দুটি হালকা-পাতলা গোছা মিযানের পাল্লায় উহুদ পাহাড় থেকে অধিক ভারী হবে।'

সেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন–

لَوْ وَقَفْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَخُيِّرْتُ بَيْنَ اَنْ اَصِيْرَ رَمَادًا اَوْ اُخَيَّرَ اِلٰى اَيِّ دَارٍ فِيْهِ لَاخْتَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ رَمَادًا

'যদি আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করিয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে, তুমি এখন এই দুটির একটি অথবা মাটি হয়ে যাওয়া থেকে কোনো একটি গ্রহণ করো, তাহলে অবশ্যই আমি মাটি হয়ে যাওয়াকে গ্রহণ করব।'

হযরত ফুজালা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযি.)

হযরত ফুজালা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযি.) বলেন–

لِاَنْ اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَقَبَّلَ مِنِّىْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا لِاَنَّهٗ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'যদি আমি জানতে পারি, আল্লাহ আমার আমল থেকে একটি অণুপরিমাণও গ্রহণ করেছেন, তাহলে সেটি প্রিয় হবে। কেননা, আল্লাহ পরহেযগারদের আমল কবুল করেন। এজন্যই আমাদের আকাবির আমলও করতেন আবার সাথে-সাথে ভয়ও করতেন।'

পছন্দ হওয়ার দু'আ

এবার রয়ে গেল আমাদের কথা। সুতরাং ভাই! চেষ্টা করুন, আমাদের মধ্যেও যেন আমল কবুল না হওয়ার ভয় ঢুকে যায়। তাই নামাযের পর আমরা দু'আ করব, হে আল্লাহ! আমাকে এমন বানিয়ে দাও, যাতে আমি আপনার পছন্দে এসে যাই। সুতরাং ভাই! এ দু'আ তো করতে পারব। কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, পুণ্যবান হলে না কেন? তাহলে তো আমরা একথা বলতে পারব যে, হে আল্লাহ! আমারা আপনার দরবারে চেয়েছি। সুতরাং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে চাও।

অপরাধী ও বৃদ্ধরা নিরাশ হবেন না

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় জেনে রাখুন। যদি যোগ্যতার আলোচনা হতো, তাহলে আমাদের মতো অযোগ্যদের অবস্থা ভয়াবহ হতো। আমরা নিষ্পেষিত হয়ে যেতাম। এখানে আলোচনা হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতার। সুতরাং আমাদের মতো অপরাধী ও বৃদ্ধদের নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আমরা আল্লাহর দরবারে চাইতে থাকব। কে জানে আল্লাহর রহমত কোন সময় কার প্রতি ধাবিত হয়ে যাবে আর সে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা চাইতে থাকি। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি। আল্লাহ আমাদের ভালোবেসে নেবেন।

তোমার একটা পলকের ব্যাপার

বলা হয়, এক স্বামী তার স্ত্রীর ওপর ক্ষেপে গেল। সে বলতে লাগল, কমবখত কোথাকার! তুই কীভাবে আমার পাল্লায় এলি! না আছে রূপ, না আছে গুণ। বংশমর্যাদাও ভালো নয়। এরপর স্বামী অনেক বলল। তার কথা শেষ হওয়ার পর স্ত্রী জবাব দিল।

نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی * جیہو جئی دی ہاں میں ہاں سرکار دی

'আমি কমবখত। আমার রূপ-গুণ কিছুই নেই। কিন্তু আমি তো তোমার জন্য অবধারিত।'

হে আল্লাহ! আমরাও কিছুই করতে পারি না। তবে তোমার কালেমা পাঠ করেছি। হে আল্লাহ! কাফেররা আমাদেরকে তাদের শত্রু বানিয়েছে। আমরা তাদের শত্রু। এমনকি ঈমানদারগণও পরস্পরে দুশমন মনে করে। হে আল্লাহ! আমাদের নিকট তো আপনার দরবার ছাড়া কোনো দরজা নেই। হে

আল্লাহ! আমরা যেমনই হই শেষ পর্যন্ত আপনারই বান্দা। আপনার দরবারে এসে গেছি, আপনার দিনের সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। আপনার ইল্‌মের সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। কুরআন-হাদীছের সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে লেগেছে। হে আল্লাহ! আমরা যেমনই হই পরিশেষে আপনারই। আপনি তাড়িয়ে দিলে আমাদের কেউ নেই। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আপনার রহমত নাযিল করুন। আমাদের প্রতি আপনার ভালোবাসার একটি নজর দিন। হে আল্লাহ! আমরা শপথ করে বলতে পারি, আপনি ব্যতীত আমাদের কেউ নেই। হে আল্লাহ! আমরা একথাও জানি যে, আপনার দরবার থেকে ফিরে গেলে এর চেয়ে হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের দুর্ভাগা বানিয়ো না। আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে না। হে আল্লাহ! যদি আপনি আমল দেখতে চান, তাহলে আমাদের চেয়ে অপদস্থ আর কেউ হবে না। আমাদের একটিই আবদেন, আপনি আমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখুন। হে আল্লাহ! অনেক দূর থেকে আপনার বান্দারা এখানে এসেছে। সবার আগমন কবুল করুন। প্রত্যেকের হৃদয়ের নেক বাসনা পূরণ করুন। হে আল্লাহ! মাত্র একটিবার এ মজলিসের প্রতি আপনার মহব্বতের নজর দিন। আপনার এ নজরের বিষয় আমাদের সারা জীবনের সওয়াল। হে আল্লাহ! নিজ দয়ায় আমাদের উপস্থিতি কবুল করুন। আমাদের অতীতের গোনাই মাফ করুন, ভবিষ্যতে পুণ্যময় জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আল্লাহর ভয়ে কাঁদা

'এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহর ভয়ে কাঁদার এত মূল্য কেন? উত্তর হলো, কোনো বস্তু দুর্লভ হলে তার মূল্য অধিক হয়। মালটা বিদেশি হলে আরো বেশি দামী হয়। কারণ, সেটা দেশে আসতে বেশি খরচ হয়। কেউ একটা সিডি ক্রয় করল অনেক দাম দিয়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, এত মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন কেন? সে উত্তর দিল, এটা বিদেশি জিনিস, এগুলোর মূল্য বেশিই হয়। এবার বুঝে নিন, গোনাহগারের চোখের পানি আসমানের উপরের জন্য বিদেশি বস্তুর মতো। তার মূল্যায়ন বেশিই হয়। ফেরেশতারা ইবাদত করেন; কিন্তু অনুতপ্ত হওয়ার কান্না কাঁদতে পারেন না। এই নেয়ামত সেখানে নেই। সুতরাং কোনো বান্দার চোখ দিয়ে অনুতাপের অশ্রু বের হলে ফেরেশতারা তাকে অতি গুরুত্বের সাথে আকাশে উঠিয়ে আল্লাহর সামনে পেশ করেন।

موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لئے

قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

'আমার প্রেমের ঘামের ফোঁটা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, মুক্তা মনে তাঁর মহানুভবতার শান তা-ও কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

আল্লাহর ভয়ে কাঁদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ -

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

بكاء এর আভিধানিক অর্থ

بكاء আরবি শব্দ। কুরআন-হাদীছে তা ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কাঁদা। শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয়। রস্ব স্বরে পাঠ করলে এর অর্থ হলো শুধু চোখ থেকে পানি বের হওয়া। আর যদি দীর্ঘ স্বরে পড়া হয়, তাহলে এর অর্থ হলো শব্দ করে কাঁদা।

পারিভাষিক অর্থ : মানুষের অন্তরে কোনো দুঃখ, বেদনা বা ভয়ের কারণে চোখ থেকে পানি নির্গত হওয়াকে কান্না বলে। সুতরাং চিন্তার সময়ও চোখে পানি আসে, আতঙ্কের সময়ও পানি আসে। একে বলা হয় কান্না।

কান্নার প্রকার : ওলামায়ে কেরাম কান্নার ব্যাখ্যা করে বলেন, কান্না সাত প্রকার। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারা (রহ.) বলেন, সাত কারণে কান্না আসে। যথা–

(১) অতি সুখে কান্না : খুশির কারণে চোখে পানি এসে যায়। যেমন– পিতা সংবাদ পেল, তোমার ছেলে হয়েছে। তখন সে খুশিতে কেঁদে ওঠে। ছাত্র খবর পেল, তুমি সারা মাদরাসায় এক নম্বর হয়েছ। তখন সে খুশিতে কেঁদে ফেলে। অর্থাৎ– যখন কোনো আশাতীত বস্তু হাতে এসে যায়, তখন তার আনন্দে চোখে পানি এসে যায়।

(২) চিন্তার কারণে কান্না : চিন্তার কারণে কান্না আসে। অর্থাৎ– কোনো বান্দার ওপর যখন কঠিন বিপদ আপতিত হয়, তখন তার চোখে পানি আসে। যেমন– কোনো ব্যবসায় মারাত্মক লস হয়ে গেল। এতে সে কেঁদে ওঠে। কোনো সন্তান পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল। এতে তার কান্না এসে যায়। মায়ের সন্তান মরে গেলে সে কাঁদতে শুরু করে। অর্থাৎ– হৃদয়ে কোনো চিন্তা প্রভাবান্বিত হলেই কান্না আসে। যেমন– কোনো মানুষ কাউকে বেশি ভালোবাসলে তার কথা স্মরণ হলে কান্না আসে।

নবীজির ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল (রাযি.) মসজিদে নববিতে আযান দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি বলেন, আগে আমি আযান দেওয়ার পর আমার নেতার চেহারা দর্শন করতাম। এবার যখন আযান দেওয়ার পর তাঁর চেহারা দেখব না, তখন এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারব না। সুতরাং আযান দেওয়াই বন্ধ করে দিলেন।

বায়তুল মাকদিস বিজয়ের পর সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে আবেগ হলো যে, আমাদের এ নতুন বিজয়ে আমরা নবীজির যুগের আযান শুনতে চাই। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের অনুরোধে হযরত ওমর (রাযি.) নির্দেশ দিলেন, বেলাল! তুমি আযান দাও। এবার বেলাল (রাযি.) আর অস্বীকার করতে পারলেন না। খলীফাতুল মুসলিমীনের আদেশ পালন করলেন। দ্বিতীয় আযানের ঘটনা সম্পর্কে হযরত শায়খুল হিন্দ (রাযি.) বলেন–

একবার হযরত বেলাল (রাযি.) খাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেন। তিনি বেলাল (রাযি.)কে বলছেন, বেলাল! তুমি এত পাষাণ হলে কীভাবে? একবার আমাকে দেখতেও আসছ না! তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, এক্ষণি প্রস্তুনি নাও; মদিনায় যাব। সুতরাং সিরিয়া থেকে মদিনার পথে রওনা দিলেন। মসজিদে নববিতে গেলে সাহাবায়ে কেরাম অনুরোধ করলেন, আমাদের আযান শোনান। বেলাল (রাযি.) অস্বীকার করলেন। পরিশেষে হযরত হাসান ও হোসাইন (রাযি.) এসে আবদার জানালেন, আমরা নানাজির যুগের আযান শুনতে চাই। এবার বেলাল (রাযি.) আর অস্বীকার করতে পারলেন না। তখন তিনি আরেকটি আযান দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বেলাল (রাযি.) যখন আযান দিতে শুরু করলেন, তার আযানের ধ্বনি শুনে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের হৃদয়ে অস্থিরতা নেমে এল। একটা সময় এমন ছিল যে, এই সুরে

আযান শুনে আমরা নবীজির অপেক্ষা করতাম, তিনি এসে নামায পড়াবেন। সুতরাং সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের চোখে পানির প্রস্রবণ শুরু হয়ে গেল। আযানের আওয়াজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘরে মহিলারা বলতে লাগল, এ তো বেলালের আযান! সুতরাং তাদের হৃদয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা মাথায় চাদর দিয়ে মসজিদে নববির পার্শ্বে এসে ভিড় জমাল। ভেতরে পুরুষরা এবং বাইরে মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কী আজব দৃশ্য! মহিলারা নিজেদের সন্তানদের উপরে উঠিয়ে উঠিয়ে কাঁদছে। তখন তাদের কোনো-কোনো সন্তানরা বলতে শুরু করল, আম্মাজান! বেলাল (রাযি.) তো কিছু দিন পর আমাদের নিকট এসেছেন। বলুন, নবীজি কখন আসবেন? একে বলা হয় চিন্তার কান্না, বেদনার কান্না।

(৩) ভয়ের কান্না : ভয়ের কারণে কান্না আসে, চোখে পানি আসে। ভয় বিভিন্ন প্রকারে হয়ে থাকে। যেমন– জান-মাল ইজ্জত, আবরু ইত্যাদি ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়। এগুলোর কারণে চোখে অশ্রু আসে। কোনো-কোনো সময় দেখবেন, সন্তান কোনো ভুল করে ফেললে কাঁদতে থাকে। কারণ, সে জানে, এখন আমার আম্মা আমাকে মারবে। এমনিভাবে ছোট শিশুদেরকে ডাক্তার ইনজেকশনের সুঁই দেখালে সে কাঁদতে থাকে। কারণ, সে জানে, এটা দিয়ে আমাকে ব্যথা দেবে। অথচ তার এখনো রোগ হয়নি; কিন্তু তার সুঁইয়ের ভয়।

(৪) লৌকিকতার কান্না : লোক দেখানোর জন্য কান্না আসে। এটা মানুষকে দেখানোর কান্না। এদেরকে কুমিরের চোখ বলা হয়। নিজের কৃতকর্ম ঢাকার জন্য কাঁদা। এর দৃষ্টান্ত কুরআনে রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করে পিতার নিকট গেল–

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

'রাতের বেলায় কেঁদে-কেঁদে তাদের পিতার নিকট গেল।'[১]

এটা হলো মানুষকে দেখানোর জন্য মিথ্যা কান্না।

(৫) ব্যথার কারণে কান্না : মানুষের দেহে কোথাও আঘাত লাগলে এতে তার কান্না আসে। চোখে পানি চলে আসে। কোনো সময় হৃদপিণ্ডের রোগীকে দেখবেন, সে ব্যথার কারণে কীভাবে কাঁদে। সেই অবস্থায় চোখের পানি সামলে রাখা কঠিন হয়ে যায়।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৬

(৬) শুকরিয়া আদায় করার কান্না : কোনো-কোনো সময় শুকরিয়া আদায় করতে চোখে পানি এসে যায়। মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, হে আল্লাহ! আমার চাওয়াবিহীন আপনি আমাকে এ-সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন। কোনো এক বুযুর্গ রাস্তায় পথ চলছেন। দেখলেন, একটা পাথর কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? সে বলল, আমি শুনেছি, জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; তাই আমি কাঁদছি। আমার ভয় হচ্ছে, কী জানি আমিও এদের মধ্যে হয়ে যাই। তার কথা শুনে বুযুর্গ আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এ পাথরটাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করো না। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করে নিলেন। আল্লাহর নির্দেশমতো তিনি পাথরকে সুসংবাদ দিলেন, তোমাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে না। এ কথা বলে তিনি এখান থেকে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর তিনি ওই রাস্তা দিয়ে পুনরায় যাচ্ছেন। দেখলেন, পাথরটা কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন কাঁদছ কেন? সে বলল, আগে ছিল ভয়ের কান্না আর এখন হচ্ছে আল্লাহর শুকরিয়ার কান্না।

(৭) আল্লাহর ভয়ে কান্না : আল্লাহর ভয়েও চোখে পানি আসে। বাস্তবেও মানুষ যখন আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নিজের ত্রুটির কথা স্মরণ করে, তখন ভাবতে থাকে, সেই মহা পরাক্রমশালীর সামনে আমার কী অবস্থা হবে। তাতে তার চোখে পানি চলে আসে। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাযি.) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত ওমরের (রাযি.)-এর ঘরে আছি। নবীজি আমাদের বাড়িতে এলেন। কথাবার্তা বলতে-বলতে দেরি হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা করলেন, আমাদের বাড়িতেই শুয়ে থাকবেন। সুতরাং তিনি আমার বিছানায় এসে শুয়ে গেলেন। তিনি বলেন, হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, আমার গালে গরম-গরম ভাব লাগছে। আমি উঠে বসে গেলাম। আমরা একই বালিশে মাথা রেখেছিলাম। তাই তাঁর চোখের পানিতে বালিশ ভিজে গেল। আমি সেই আর্দ্রতার গরম পেয়ে উঠলাম। দেখলাম, নবীজির দু-চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম–

مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাঁদছেন কেন?'

তিনি বললেন, তুমি শোননি তোমার ভাই বারান্দায় তাহাজ্জুদ পড়ছে। তিনি এখন কোন আয়াত তেলাওয়াত করছেন। তখন আমি একটু ধ্যান ধরে

শুনলাম, আমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাহাজ্জুদের নামাযে তেলাওয়াত করছেন–

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

'কখনো নয়; ওই সমস্ত লোক কেয়ামতের দিন আল্লাহর থেকে আবৃত থাকবে। অর্থাৎ– তারা আল্লাহর দর্শন পাবে না।'[১]

এই আয়াতটি শোনার পর নবীজির দুচোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। তারা কতই হতভাগা। কেয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার থেকে বঞ্চিত থাকবে।

কান্নার বিধান

কান্নার বিধান কী? কান্নার বিধান হলো, কিছু কান্না প্রশংসনীয় আর কিছু কান্না নিষিদ্ধ। অতএব যদি আপনার গোনাহের কথা স্মরণ করে কাঁদেন, আল্লাহর মাহাত্ম্য সামনে রেখে কাঁদেন, শুকরিয়ার অনুভূতি নিয়ে কাঁদেন অথবা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কাঁদেন, তাহলে আপনার কান্না স্তুতিপূর্ণ। আর যদি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কাঁদেন, তাহলে এটা ঘৃণিত ও শরীয়তবহির্ভূত। আর মানবপ্রকৃতি হলো, চিন্তায় ও ব্যথায় কান্না আসে, চোখে পানি আসে। এটা নিষিদ্ধ নয়। নবীজির সন্তান হযরত ইবরাহীমকে কবরে রাখার সময় নবীজির চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। কোনো সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাঁদছেন? নবীজি বললেন–

اَلْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنٌ

'অন্তর চিন্তিত হয়, চোখ অশ্রু ঝরায়। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমি গভীরভাবে শোকাহত।'

ওই ব্যক্তির কল্যাণ হোক

হযরত ছাওবান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন–

طُوْبٰى لِمَنْ مَلَكَ نَفْسَهٗ وَوَسِعَهٗ بَيْتُهٗ وَبَكٰى عَلٰى خَطِيْئَتِهٖ

'ওই ব্যক্তির কল্যাণ হোক, যে নিজের নফসকে আয়ত্ত করেছে এবং তার ঘর প্রশস্ত হয়েছে এবং নিজের গোনাহের ওপর কান্না আসে।'

---

১. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ১৫

এ হাদীছে নবীজি ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ অর্জিত হয়েছে, তার কল্যাণ হোক।

(১) যে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিজের মধ্যে অশালীন বিষয়ের আক্রমণ দমন করার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

(২) যার ঘর এমন হয় যে, তার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনই হয় না। অর্থাৎ– পরিবার ভালো, সহধর্মিণী ভালো ইত্যাদি। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে থাকতে হয় না। কতিপয় মানুষ তো এমন আছে যে, তারা রোড লাইসেন্স করে ফেলে। সারা জীবনই রাস্তায় থাকে।

(৩) যে-ব্যক্তি নিজের কৃত অপরাধের ওপর লজ্জিত হয়। কেননা, নিজের ভুলের কথা স্মরণ করে কাঁদা খুবই প্রশংসনীয় বিষয়। এতে মানুষের হৃদয় অস্থির থাকে আর চিরদিনের জন্য গোনাহ বর্জন করার সৌভাগ্য পায়।

সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন দিন

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন, নবীজি একদিন জুমার খুতবায় ইরশাদ করেছেন–

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ

'আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। ফলে আমি আজকের মতো কল্যাণ ও অকল্যাণ (অর্থাৎ– জান্নাতের মতো সুন্দর ও জাহান্নামের মতো অকল্যাণকর) কিছু কোনো দিন দর্শন করিনি। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নবীজির সাহাবাদের মধ্যে এর চেয়ে কঠিন দিন কখনো আসেনি। একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম চুপে-চুপে কাঁদতে শুরু করলেন।'

সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলে তাদের হৃদয়ের এই অবস্থা হতো।

জাহান্নাম থেকে নিরাপদ দুটি চোখ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি–

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

দুটি চোখ এমন আছে, যেগুলোকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। ওই চোখ, যা আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং ওই চোখ, যা আল্লাহর রাস্তায় প্রহরীর কাজে রাতযাপন করেছে। সুবহানাল্লাহ! নিজের কৃত অপরাধ স্মরণ করে কাঁদা আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়।

কান্না আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কেন?

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহর ভয়ে কাঁদার এত মূল্য কেন? উত্তর হলো, কোনো বস্তু দুর্লভ হলে তার মূল্য অধিক হয়। মালটা বিদেশি হলে আরো বেশি দামী হয়। কারণ, সেটা দেশে আসতে বেশি খরচ হয়। কেউ একটা সিডি ক্রয় করল অনেক দাম দিয়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, এত মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন কেন? সে উত্তর দিল, এটা বিদেশি জিনিস, এগুলোর মূল্য বেশিই হয়। এবার বুঝে নিন, গোনাহগারের চোখের পানি আসমানের উপরের জন্য বিদেশি বস্তুর মতো। তার মূল্যায়ন বেশিই হয়। ফেরেশতারা ইবাদত করেন; কিন্তু অনুতপ্ত হওয়ার কান্না কাঁদতে পারেন না। এই নেয়ামত সেখানে নেই। সুতরাং কোনো বান্দার চোখ দিয়ে অনুতাপের অশ্রু বের হলে ফেরেশতারা তাকে অতি গুরুত্বের সাথে আকাশে উঠিয়ে আল্লাহর সামনে পেশ করেন।

موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لئے

قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

'আমার প্রেমের ঘামের ফোঁটা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, মুক্তা মনে তাঁর মহানুভবতার শান তা-ও কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।

আল্লাহর খাজানায় চারটি বস্তুর স্বল্পতা

এক উদাসীন কবি বলেন–

چہار چیز آوردہ ام شاہا در گنج تو نیست

হে আল্লাহ! আমি চারটি বস্তু নিয়ে এলাম, যা আপনার কোষাগারে নেই।

মানুষ তার কথা শোনে অবাক যে, এই পাগলটা কী বলে! পাগল শুধু কবিতার একটি চরণই পাঠ করছে আর ঘুরছে। এক যুবক সংকল্প করল, এই পাগল কী বলে আমাকে শুনতে হবে। সাথে-সাথে সেও ঘুরছে। জিজ্ঞেস

করল, কী জিনিস একটু খুলে বলো। সে বলতে অস্বীকার করল। কিন্তু যুবকও সুইঙ্গামের আঁঠার মতো তার সঙ্গে লেগে আছে। অবশেষে আল্লাহর পাগল তার কবিতার দ্বিতীয় লাইন পাঠ করছে–

چہار چیز آوردہ‌ام شاہا در گنج تو نیست

نیستی وحاجت وعذر وگناہ آوردہ‌ام

এগুলো নেই, বিলুপ্ত, প্রয়োজন, অজুহাত ও গোনাহ আমি নিয়ে এসেছি। আমলের বিলুপ্তি আছে; আপনার বিলুপ্তি নেই। আমি মুখপেক্ষী; আপনি মুখাপেক্ষী নন। আমি অজুহাত পেশ করি; আপনি কোনো বাহানা করেন না। আমি গোনাহ করি; আপনার খাজানায় কোনো গোনাহ নেই। বাস্তবেও এ অনুতপ্ত হওয়া আল্লাহর খাজানায় নেই। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা অনুতপ্ত হওয়াকে পছন্দ করেন। তাই বুঝে নিন, বিদেশি জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রেট লাগিয়ে দেন। এটি অনেক মূল্যবান।

ঝরনা ও চোখের পানির মধ্যে পার্থক্য

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

'এটি একটি প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।'[১]

عين শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর একটি অর্থ হলো ঝরনা। আল্লাহ পবিত্র কালামে বলেন, জান্নাতের তলদেশে প্রবাহিত ঝরনা, যা থেকে নৈকট্যশীলগণ পান করবে।

عين এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে চোখ। এ চোখ থেকেও পানি নির্গত হয়। কিন্তু উভয় পানির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যথা–

(১) ঝরনা থেকে প্রবাহিত পানিকে পানি বলা হয় আর চোখ থেকে নির্গত পানিকে বলা হয় অশ্রু।

(২) ঝরনা থেকে নির্গত পানি দেহের তৃষ্ণা নিবারণ করে। আর চোখ থেকে নির্গত পানি আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করে।

(৩) ঝরনা থেকে নির্গত পানি দ্বারা পৃথিবীর উদ্যান সিক্ত হয় আর চোখ থেকে নির্গত পানি দ্বারা মনের বাগান সিক্ত হয়।

---

১. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ২৮

(৪) ঝরনার পানি দ্বারা বাহ্যিক দুর্গন্ধ দূর করা যায় আর চোখের পানি দ্বারা হৃদয়ের দুর্গন্ধ দূর করা হয়।

(৫) ঝরনা থেকে নির্গত পানি দ্বারা পৃথিবীর আগুন নির্বাপণ করা হয় আর চোখের পানি দ্বারা জাহান্নামের আগুন নেভানো যায়।

হৃদয় কীভাবে ধৌত করা যায়

একবার হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট ওহী এল, হে আমার প্রিয় ইবরাহীম! তোমার হৃদয়কে ধৌত করো। ইবরাহীম (আ.) অত্যন্ত অধীর হয়ে গেলেন, হে আল্লাহ! সেখানে তো পানি পৌঁছে না; আমি কীভাবে সেটা ধৌত করব? তখন আল্লাহ বললেন, হে ইবরাহীম! এ অন্তর দুনিয়ার পানি দিয়ে ধোওয়া যায় না। এটা অনুতপ্তের চোখের অশ্রু দিয়ে ধুতে হয়। আফসোস! যদি আমাদেরও কোনো অশ্রু এমন নির্গত হতো, যা আল্লাহর নিকট পছন্দ হয়ে যেত। কোনো কবি বলেন–

ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو

کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو

'এ দিকে বের হয় ওদিকে তার খবর হয়ে যায়। কোনো অশ্রু যদি এমন গ্রহণযোগ্য হয়ে যেত।'

অনুশোচনার সাথে যদি কোনো অশ্রু নির্গত হয়ে যেত, যা দেখে আমাদের মালিকের ভালোবাসার সাগরে ঢেউ এসে যেত। উক্ত হাদীছে শেষংশে বলা হয়েছে–

وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

'যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় প্রহরীর কাজে রাত্রি জাগরণ করেছে।'

এমন চোখের ওপর আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

আল্লাহর জন্য কান্নার ফযিলত

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন–

لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ

'আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ-না দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করবে।'

সুতরাং দোহনকৃত দুধও স্তনে প্রবেশ করানো যাবে না, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী লোকও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ

'আল্লাহর রাস্তায় ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না।'

দুটি প্রিয় ফোঁটা ও দুটি প্রিয় চিহ্ন

হযরত আবু উসামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন–

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ

আল্লাহ তা'আলার নিকট দুটি ফোঁটা ও দুটি চিহ্নের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু নেই। একটি ফোঁটা হলো আল্লাহর ভয়ে কান্নার ফোঁটা। আরেকটি হলো আল্লাহর রাস্তায় নির্গত (রক্তের) ফোঁটা। আর দুটি চিহ্ন হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আঘাতের চিহ্ন এবং আল্লহর ফরজ আদায় করার চিহ্ন। যেমন– কতিপয় লোকের আত্তাহিয়্যাতু বসার দরুন হাঁটু ও গিরায় দাগ পড়ে যায়। সেজদার দরুন কপালে কালো দাগ পড়ে। এগুলো আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি বললেন–

مَنْ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتّٰى يُصِيْبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

'আল্লাহর স্মরণে যে-বান্দার চোখে অশ্রু আসে, এমনকি তা মাটিতে পড়ে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে কোনো প্রকার শাস্তি দেবেন না।'

চোখ প্রবাহিত হবে; হৃদয় অস্থির হবে

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযি.) বলেন, একদিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর আমাদের উপদেশ দিলেন। তা অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ উপদেশ ছিল। চোখ প্রবাহিত হলো এবং হৃদয় কেঁপে উঠল। কেউ তা শুনে বলল, এটি ভিন্ন ধারার ওয়াজ দেখা যাচ্ছে! যেমন– কেউ অসিয়তস্বরূপ কিছু বলে থাকে। অতঃপর নবীজি বললেন, আমি তোমাদেরকে পরহেযগারির ব্যাপারে অসিয়ত করছি। শুনবে এবং

আমল করবে কোনো হাবশী গোলামও যদি তোমাদের নেতা হয়। তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘ হায়াত পাবে, তারা এই উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য দেখতে পাবে এবং বিদয়াত থেকে বেঁচে থাকবে। এটা ভ্রষ্টতা। যারা এরকম যুগ পাবে, তাদের জন্য উচিত আমার সুন্নতের ওপর আমল করা এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতের ওপরও আমল করা। সাহাবাদের আমলকে তোমরা দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরো।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল সুন্নত

এখানে সূক্ষ্ম একটি বিষয় রয়েছে যে, নবীজি খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে সুন্নত বলেছেন।

وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

এই হাদীছ একথার সুস্পষ্ট দলিল যে, তাদের আমল সুন্নত। এজন্যই আমরা আমাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত দাবি করি। এর মর্ম কী? মর্ম হলো, আমরা নবীজির সুন্নত পালন করি এবং সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সুন্নতও পালন করি। কারণ, সেগুলোও সুন্নত। নবীজি নিজে তা সুন্নত ঘোষণা করেছেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। তারা বলে, আমরা বিশ রাকাত তারাবীর নামায পড়ব না। এটি হযরত ওমর (রাযি.)-এর মাধ্যমে চালু হয়েছে। এটি বিদয়াত। এবার তাদের জ্ঞানের দক্ষতা দেখুন। নবীজি তো বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের আমলও পালন করো। আর ইন্টারনেটে দীন শিক্ষাকারীরা সাহাবায়ে কেরামের আমলকে বিদয়াত আখ্যায়িত করছেন।

فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا

'তাদের কী হলো যে, তারা কথা বোঝার চেষ্টা করছে না?'[১]

জাহান্নাম থেকে কীভাবে বাঁচব

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) বলেন– জনৈক ব্যক্তি রাসূলকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব কীভাবে? নবীজি বললেন,

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৭৮

بِدُمُوْعِ عَيْنَيْكَ فَإِنَّ عَيْنًا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ لَاتَمَسُّهَا النَّارُ اَبَدًا

তোমার চোখের পানি দ্বারা। কেননা, আল্লাহর ভয়ে যার চোখে পানি আসবে, সেই চোখ জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

সুবহানাল্লাহ! কেমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা। আজ যদি আমাদের চোখের ঝরনা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এটা আমাদের জন্য দুভার্গ্যের ব্যাপার। আর চেষ্টা করার পরও যদি চোখে পানি না আসে, এটা আরো বড় বিপদ।

হৃদয়ের পরিবর্তে বুকে ব্যথা থাকলে চোখ থেকে পানি আসে না। তা চোখের পানি বন্ধ করে দেয়। আর বুকের মধ্যে হৃদয় থাকলে চোখে পানি আসে। হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন–

عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ لَاتَمَسُّهَا النَّارُ اَبَدًا

'আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী চোখ কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'

হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, নবীজির এ হাদীছ আমার নিকট পৌঁছেছে। তিনি ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ قَطْرَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَةٍ مِّنْ دَمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَقَطْرَةِ دُمُوْعٍ قَطَرَتْ مِنْ عَيْنِ رَجُلٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

'আল্লাহর রাস্তায় নির্গত রক্তের ফোঁটার চেয়ে প্রিয় আল্লাহর নিকট কোনো বস্তু নেই এবং ওই অশ্রু, যা রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর ভয়ে মুমিনের চোখ থেকে নির্গত হয়। এই ফোঁটা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়।

ক্রন্দনকারী একজন; মুক্তি সকলের!

হযরত নাযার (রাযি.) বর্ণনা করেন–

আল্লাহ ভয়ে কারো চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ সেই দেহের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। যদি সেই অশ্রু গাল বেয়ে পড়ে, তাহলে ওই চোহারাকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন লজ্জিত করবেন না। যদি তাদের বিশাল জামাতের মধ্যে কোনো একজন কাঁদে, তাহলে একজনের চোখের পানির কারণে আল্লাহ ওই জামাতের সকলকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। (সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ কেমন মূল্যায়নকারী! একজনের চোখের পানির বদৌলতে সারা জামাতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি

দিয়ে দেন।) প্রত্যেক আমলের ওজন হয়, প্রত্যেক আমলের প্রতিদান পাওয়া যায়। তবে অনুতপ্ত হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করলে সেই অশ্রু ব্যতীত। কারণ, এই অশ্রুর দ্বারা আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের সমুদ্র নির্বাপিত করে দেন।

আল্লাহু আকবার! এক ফোঁটা অশ্রু জাহান্নামের আগুনকে নির্বাপিত করে দেয়!

অনুতপ্তের অশ্রুর ওজন

হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন–

আমার নিকট এ হাদীছ পৌঁছেছে যে, আল্লাহর ভয়ে যার চোখে পানি বের হয়, সেই পানি মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তার ঘাড় জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। কোনো জামাতের মধ্যে আল্লাহর কোনো বান্দা কাঁদলে ওই এক ব্যক্তির উসিলায় আল্লাহ সেই জামাতের সকলের ওপর রহমত নাযিল করেন। আর গোনাহগারের চোখের পানি ব্যতীত সকল আমল ওজন করা হয়। সেই অশ্রু মিযানের পাল্লায় উঠানো যাবে না। জিবরাইল (আ.) বলেন, সব জিনিস ওজন করা হবে; কিন্তু গোনাহগারের চোখের পানি নয়। সেই অশ্রু আমরা মিযানে উঠাতে পারব না। কেননা, সেটি অনেক ভারী হবে।

অধিক হাসার নিন্দা

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন–

একদিন নবীজি মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন। বাইরে কতিপয় লোক একসঙ্গে বসে অট্টহাসি দিচ্ছে। নবীজি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করে বললেন, হাসি বিনোদন চুরমারকারী বস্তু। মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। অতঃপর আরেক দিন এমন হলো যে, লোকেরা হাসছে। নবীজি বললেন, সাবধান! ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জান, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অবশ্যই বেশি কাঁদতে আর কম হাসতে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, মূসা যখন খিজির থেকে পৃথক হতে চাইলেন, তখন মূসা খিজিরকে বলেছিলেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন খিজির বললেন, হে মূসা! তুমি ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকো। প্রয়োজন ছাড়া কোথাও যাবে না। আশ্চর্য বিষয় ব্যতীত হাসবে না, (কোনো বিস্ময়কর ঘটনার প্রেক্ষিতে অনিচ্ছায় হাসি এলে তা ভিন্ন কথা) গোনাহগার ও অপরাধীদের লজ্জা দিয়ো না যে, তুমি এমন করেছ। নিজের

অপরাধের জন্য কাঁদো। নবীজি বলেন, অতিমাত্রায় হাসা অন্তরকে মেরে ফেলে। তারপর নবীজি আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। যথা-

- যে-ব্যক্তি যৌবনকালে বেশি হাসবে, তাকে বার্ধক্যে কাঁদতে হবে।
- যে-ব্যক্তি নিজের ঐশ্বর্যের ওপর হাসবে, সে তার দীনতার ওপর কাঁদবে।
- যে তার জীবনের ওপর হাসবে, সে তার মৃত্যুর সময় কাঁদবে।

তিনটি চোখ কেয়ামতের দিন কাঁদবে না

তিনটি চোখ কেয়ামতের দিন কাঁদবে না। বাকী সকল চক্ষুই কাঁদবে। এক. যে-চোখ দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। দুই. যে-চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন থেকে বিরত রয়েছে। তিন. যে-চোখ আল্লাহর রাস্তায় রাত্রি জাগরণ করেছে।

অন্তর বিনষ্ট হওয়ার কারণ তিনটি

বলা হয়েছে, তিনটি বস্তু অন্তরকে শক্ত করে দেয়। এক. আশ্চর্য বিষয় ব্যতীত হাসা। দুই. ক্ষুধা ব্যতীত খাওয়া। তিন. প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা। ভাই! আমাদের জন্য উচিত নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর সামনে কাঁদা, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করা, অন্ধকারে আল্লাহর সামনে অনুতপ্ত হয়ে অনুনয়বিনয় করা, আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা; তাহলে আল্লাহর রহমত আমাদের প্রতি মনোনিবেশ হবে।

আল্লাহওয়ালাদের উপদেশের প্রভাব

একবার হাসান বসরি (রহ.) জনৈক যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে হাসছিল। তিনি বললেন, হে ছেলে! তুমি কি পোলসেরাত পার হয়ে গিয়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি এমন কোনো সুসংবাদ পেয়েছ যে, তুমি জান্নাতে যাবে? বলল, না। বললেন, তাহলে এত হাসছ কেন? (ভাই এটা আল্লাহওয়ালাদের নসিহত) বলা হয় যে, এরপর থেকে ওই যুবক তার জীবনে কোনোদিন হাসেনি। পরকালের চিন্তায় বিভোর ছিল। তার হৃদয়ে চিন্তা এসে গেল, আমাকে পোলসেরাত পাড়ি দিতে হবে। এখনই তো কেয়ামতের দিনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যখন এ চিন্তা এসে যাবে তখন মানুষের হাসি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রাধান্য হবে।

নিষ্ঠার সাথে ক্রন্দকারী এমন ছিলেন

আমাদের আকাবিরে কেরাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাঁদতেন এবং সেই কাঁন্নাকে অন্যের থেকে লুকিয়ে রাখতেন। বোঝা যেত না, কেউ কাঁদছে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসেহ (রাযি.) বলেন, আমি এমন ব্যক্তিত্বও দেখেছি যে, তিনি ও তার স্ত্রী এক বালিশে শুয়ে আছেন। তার চোখের পানিতে স্ত্রীর গাল সিক্ত হচ্ছে। তবু স্ত্রী বুঝতে পারছে না, তিনি কাঁদছেন। না কোনো শব্দ আছে, না কোনো নড়াচড়া। দিলে-দিলে চিন্তা করছেন আর চোখ থেকে পানি বের হচ্ছে। একে বলে নিষ্ঠার সাথে কান্না। তিনি বলেন, আমি এমন মনীষীও দেখেছি, যিনি আরেকজনের পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন আর তার দুই গাল ভেসে পানি মাটিতে পড়ছে। তবু পাশের লোক টের পাচ্ছে না, তিনি কাঁদছেন।

সূর্যগ্রহণের নামাযে নবীজির কান্না

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করেন–

নবীজির যুগে সূর্য গ্রহণ হলো। তিনি নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামও দাঁড়ালেন। নবীজি দীর্ঘ কেরাত পড়লেন। লম্বা রুকু করলেন। রুকু থেকে দাঁড়ালেন। লম্বা সেজদা করলেন। মাথা উঠালেন। দীর্ঘক্ষণ বসলেন। তারপর দ্বিতীয় সেজদা করলেন। মাথা উঠালেন। দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ালেন। প্রথম রাকাতের মতো দ্বিতীয় রাকাতেও দীর্ঘ কেরাত, দীর্ঘ রুকু, লম্বা সেজদা করলেন। বসলেন। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তো প্রতিশ্রুতি দেননি। অথচ আমি এখনো তাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছি। হে আল্লাহ! আপনি প্রতিশ্রুতি দেননি। অথচ আমরা আপনার দরবারে ইস্তেগফার করছি। তারপর কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

'হে আমার হাবীব! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে শাস্তি দেব না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইস্তেগফার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে শাস্তিদাতা হব না।'[১]

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩

উপরিউক্ত দু'আয় নবীজি এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দেখুন, সূর্যগ্রহণ দেখে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর শাস্তির কেমন ভয় করছেন!

রহমতের নবী পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন!

হযরত আবুহুবায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, যখন

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۝ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝

'তোমরা কি একথায় বিস্ময় বোধ করছ এবং হাসি-মশকারা করছ এবং কাঁদছ না?'[১]

কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হলো, শুনে সুফফাবাসী কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাদের অশ্রু গাল বেয়ে মাটিতে পতিত হলো। অতঃপর যখন নবীজি তাদের কাঁদতে দেখলেন, তখন তিনিও কেঁদে ফেললেন। তারপর নবীজি বললেন, যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে, তাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে না। আর যে-ব্যক্তি বারবার গোনাহ করবে, তাকে জান্নাতে দেওয়া হবে না। আর যদি তোমরা গোনাই না কর, তাহলে আল্লাহ এমন একটা জাতি নিয়ে আসবেন, যারা গোনাহ করবে এবং সাথে-সাথে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাও চাইবে।

কান্নার তিন কারণ

কান্না কীভাবে আসে এ কথাটা শুনে নাও। তাহলে আমরাও চেষ্টা করব, যাতে আমরা এই নেয়ামত হাসিল করতে পারি, যার দ্বারা আমাদের চোখে পানি আসবে। ওলামায়ে কেরাম এর তিনটি কারণ লিখেছেন।

১. তারা বলেন

إِذَا قَلَّتْ خَطَايَاهُ سَرَعَتْ دَمْعَهُ

গোনাহের পরিমাণ কমে গেলে অশ্রু তাড়াতাড়ি চলে আসে। গোনাহ অশ্রুর রাস্তা বন্দ করে দেয়, রাস্তায় কোনো ময়লা থাকলে তাতে অন্য বস্তু চলতে সমস্যা হয়ে থাকে। এটা গোনাহের ময়লা। তা থাকলে অশ্রু আসবে না। নিংড়ালেও বের হবে না। বান্দা যদি ইচ্ছা করে, চোখ নিংড়াবে, তবু

---

১. সূরা নাজ্‌ম : আয়াত ৫৯, ৬০

তার চোখে পানি আসবে না। হ্যাঁ যদি সে খালেছ নিয়তে তাওবা করে, তাহলে সেই তাওবা গোনাহের অন্ধকার কেটে ফেলবে। অতঃপর অটোমেটিকলি অশ্রু চলে আসবে।

২. কান্না আসার দ্বিতীয় কারণ হলো,

مَنْ أَكْثَرَ لِلّٰهِ الصِّدْقَ نَدِيَتْ عَيْنَاهُ

যার অন্তরে নিয়ত সত্য হবে, তার চোখে অতি সহজে পানি চলে আসবে।

অর্থাৎ– যার নিয়ত খাঁটি হবে, তার চোখে কান্না আসবে।

৩.

إِذَا فَرِحَ الْقَلْبُ نَدِيَتْ عَيْنَاهُ

'অন্তর চিন্তামগ্ন থাকলে অতি দ্রুত চোখে পানি চলে আসে।'

সুতরাং ভাই! পরকালের চিন্তা হৃদয়ে চড়িয়ে নিন; তাহলে এ পৃথিবীতে আমাদের চোখে পানি আসবে। আর এদিকে আমাদের ভুলত্রুটিগুলো মুছে দেওয়া হবে। এক ফোঁটা অশ্রু পেছনের সকল গোনা মুছে দিতে সক্ষম।

কান্নার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের উক্তি

এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের উক্তিও শুনে নিন।

- হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন-

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّبْكِيَ فَلْيَبْكِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَتَبَاكَ

'তোমাদের মধ্যে যারা কাঁদতে পারে, সে যেন কাঁদে আর যে কাঁদতে পারে না, সে যেন কান্নার ভান ধরে। হতে পারে আল্লাহ তার এই অবস্থাকেও কবুল করে নেবেন।'

- হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যখনই

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'ওই দিন যখন মানুষ সমস্ত জগতের পালনকর্তার নিকট দণ্ডায়মান হবে।'[১]

---

১. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ৬

এই আয়াতটি পড়তেন, তখনই কান্নায় ভেঙে পড়তেন। এমনকি অজ্ঞান হয়ে যেতেন। আর সেখানে তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে যেত।

• হযরত ওছমান (রাযি.)-এর এক গোলামের নাম ছিল হানী। তিনি দেখেছেন, হযরত ওছমান (রাযি.) জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় এত পরিমাণ কাঁদতেন না, যে-পরিমাণ তিনি কবরের আলোচনায় কাঁদতেন। তিনি তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত ওছমান (রাযি.) কোনো কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেই কান্না শুরু করে দিতেন। এমনকি কাঁদতে-কাঁদতে নিজের দাড়ি আঁকড়ে ধরতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় এত কাঁদেন না; তবে কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালে এত পরিমাণ কান্নার রহস্য কী? তিনি জবাব দিলেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন, পরকালের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ঘাঁটি হচ্ছে কবর। যদি কবরের মোয়ামালা সহজ হয়ে যায়, তাহলে এর পরের সকল ঘাঁটির মোয়ামালা সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি না পাওয়া যায়, তাহলে এর পরের কোনো ঘাঁটিতেই ছাড় পাওয়া যাবে না। হযরত ওছমান (রাযি.) বলেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন, আমি কবর থেকে কঠিন ও দুষ্কর কোনো দৃশ্য দেখিনি।

• একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) জনৈক ব্যক্তিকে নসিহত করছেন–

لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيْئَتِكَ وَكُفَّ لِسَانَكَ

'ঘরে থাকো; নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করো আর কাঁদো।'

• বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু সুলাইমান দারানি (রহ.) বলেন–

عَوِّدُوْا اَعْيُنَكُمُ الْبُكَاءَ وَقُلُوْبَكُمُ التَّفَكُّرَ

'তোমাদের চোখকে কান্নার এবং অন্তরকে চিন্তার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত বানাও।'

চিন্তাগ্রস্তদের আলামত

হযরত সিররি সাকতি (রহ.) বলেন, যে-বান্দার হৃদয়ে চিন্তার ছাপ পড়বে এবং সে চিন্তিত হবে, তার কিছু নিদর্শন রয়েছে।

(১) তার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তা বিরাজ করবে। চিন্তা তার মধ্যে প্রাধান্য থাকবে।

(২) তার মধ্যে ভাবনা প্রাধান্য হবে।

(৩) তার মধ্যে এমন ভয় থাকবে যে, তার হৃদয়কে অধীর করে দেবে।

(৪) সে অধিক পরিমাণে কান্না করবে।

(৫) দিনরাত সে আল্লাহর সামনে অবনত হবে।

(৬) আরামের জায়গা থেকে সে নিজেকে দূরে রাখবে।

(৭) তার হৃদয় প্রতিনিয়ত প্রকম্পিত থাকবে। কারণ, সে আল্লাহর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞাত।

একটিমাত্র বাক্যের মাধ্যমে যুবকের পরিশুদ্ধি

হযরত সিররি সাকতি (রহ.) বলেন, আমি ওয়াজ করছিলাম। তখন একটি বাক্য বললাম

عَجَبًا لِضَعِيْفٍ يَعْصِيْ قَوِيًّا

'আশ্চর্য ওই দুর্বলের ওপর, যে শক্তিশালীকে অমান্য করে।'

তিনি বলেন, এ বাক্যটি শুনে এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল। তার গায়ে আড়ম্বরপূর্ণ শাহী পোশাক ছিল। তার সঙ্গে অনুচর ও খাদেম অনেক ছিল। সে উঠে এখান থেকে চলে গেল। পরের দিন আমি বসে আছি। সে একা-একা আমার নিকট আগমন করল। সাদাসিধে পোশাক। তার সঙ্গে কোনো খাদেম বা অনুচর নেই। সে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, গতকাল আপনি একটি বাক্য বলেছিলেন। সেই বাক্যের মর্ম আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আমি বললাম, দেখুন; আল্লাহর চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই এবং মানুষের চেয়ে দুর্বল কেউ নেই। সুতরাং আশ্চর্য লাগে ওই ব্যক্তির ওপর, যে আল্লাহর নাফরমানি করে। যদি আল্লাহ তার এই নাফরমানির ওপর শাস্তি নির্ধারণ করে দেন, তাহলে তার কী অবস্থা হবে? তিনি বলেন, সে আমার কথা শোনার পর তার চোখে পানি এসে গেল এবং বলল, আজ থেকে আমার জীবনের গন্তব্য ফিরিয়ে দিলাম এবং আর কোনো দিন ওই শক্তিশালী খোদার নাফরমানি করব না।

আল্লাহর অভিযোগ

হযরত আতা (রহ.) বলেন, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, তোমরা মাখলুকের সমস্ত দরজা বন্ধ করতে পার, যেগুলো দিয়ে তারা তোমাদের দেখে ফেলবে। কিন্তু ওই দরজা বন্ধ করতে পারবে না, যেটা দিয়ে আমি দেখি। তারা কি মাখলুকের দরজা থেকে আমার

দরজাকে লঘু মনে করে? কাজেই ভাই! আমাদের জন্য উচিত, আমরা নিজেদের ভুলের প্রতি দৃষ্টি রাখব। কেয়ামতের দিনের চিন্তা রাখব, যা আমাদের অতিক্রম করতে হবে। তারপর বুঝতে পারবেন, আমাদের আকাবির এত পরিমাণ কাঁদতেন কেন? 'আখলাকুস সালিহীন' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, আমাদের বুযুর্গগণ রাতের বেলায় এত পরিমাণ কাঁদতেন যে, যেস্থানে তাদের চোখের পানি পতিত হতো, সেখানে উদ্ভিদ জন্মে যেত।

কান্নার একটি আশ্চর্য কারণ

এক লোক প্রতিনিয়ত কাঁদত। কেউ জিজ্ঞেস করল, ভাই! আপনি এত কাঁদেন কেন? সে বলল, একটা কথা চিন্তা করে আমার কান্না আসে যে, আমি গোনাহ করে আমার ওই মালিককে সাক্ষী বানালাম, যিনি আমাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অতঃপর তিনি সেই শাস্তি কেয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করলেন এবং আমাকেও কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলেন যে, যদি তুমি কান্নাকাটি করে সেগুলো মার্জনা করিয়ে নিতে পার, তাহলে মার্জনা করিয়ে নাও। আল্লাহর কসম! যদি আমাকে কেয়ামতের দিন বলা হয়, সসস্ত লোকের সামনে তোমার হিসাব গ্রহণ করে তোমাকে জান্নাতে দেয়া হবে অথবা কোনো হিসাব না করে তোমাকে মাটি বানিয়ে দেওয়া হবে এ দুটির কোনটি তুমি চাও, তাহলে অবশ্যই আমি মাটি হয়ে যাওয়াকে বেছে নেব। অর্থাৎ– আমি চাইব না যে, আমার আমলনামা সকল মাখলুকের সামনে প্রকাশ করা হোক।

এবার আপনারা একটু ভেবে দেখুন–

(১) যদি কেয়ামতের দিন পিতার আমল নামা সন্তানের সামনে প্রকাশ করা হয়

(২) যদি মায়ের আমলনামা সন্তানের সামনে প্রকাশ করা হয়

(৩) যদি ছাত্রর আমলনামা ওস্তাদের সামনে প্রকাশ করা হয়

(৪) যদি গুরুর আমলনামা শিষ্যের সামনে প্রকাশ করা হয়

(৫) যদি বড়দের আমলনামা ছোটদের সামনে প্রকাশ করা হয়, তাহলে কি আমরা এ কথার ওপর প্রস্তুত হব যে, সবার সামনে আমলনামা প্রকাশ করা হোক? কী ভাই! অন্তর কী বলে? স্ত্রী কোনো দিন রাজি হবে না, আমার স্বামীর সামনে আমার আমলনামা প্রকাশ করা হোক। সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি নিজে-নিজেই জাহান্নামে চলে যাচ্ছি; আমার আমালনামা প্রকাশ করার

প্রয়োজন নেই। কেননা, আমি অপমানের গ্লানি সইতে পারব না। সুতরাং ভাই! সত্যিই যদি আমরা ওই দিনের অপমান সহ্য করতে না পারি, তাহলে আজও সময় আছে নিজের কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করুন। আমলনামা থেকে অপরাধের তালিকাটা মেটানোর চেষ্টা কর। আজ সেই গোনাহ অতি সহজে মুছে দেওয়া হবে। তবে এর জন্য গোনাহের অনুভূতি নিয়ে অনুতপ্ত হওয়া জরুরি।

হৃদয়কাঁপানো একটি বর্ণনা

কেয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনা কীভাবে হবে? এ-ব্যাপারে কিছু হাদীছ শুনে নাও। আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) এই হাদীছটি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, যিনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন। নবীজি ইরশাদ করেন, জিবরাইল আমাকে কেয়ামতের ভয়ানক অবস্থা সম্পর্কে এ পরিমাণ ভয় দেখিয়েছেন, যা শুনে আমার কান্না এসে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার বন্ধু! আল্লাহ কি আমার আগের ও পরের গোনাহ ক্ষমা করেননি? একথা শুনে জিবরাইল বললেন, হে মুহাম্মদ! কেয়ামতের ভয়ানক অবস্থা দেখে আপনি ক্ষমার কথা ভুলে যাবেন। জিবরাইল (আ.)-এর একথা শুনে নবীজি এত পরিমাণ কাঁদলেন যে, অশ্রুতে তাঁর দাড়ি মোবারক সিক্ত হয়ে গেল।

আল্লাহর অদৃশ্য গ্রেফতারি থেকে বাঁচার চিন্তা

'তাহারাতুল কুলুব' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–

لَمَّا مَكَرَ بِاِبْلِيْسَ لَعَنَهُ اللهُ طَفِقَ جِبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ يَبْكِيَانِ

আল্লাহ ইবলিসকে অভিশপ্ত করে তার দরবার থেকে বের করে দেওয়ার পর হযরত জিবরাইল ও মিকাইল (আ.) কাঁদতে শুরু করলেন। বের করলেন ইবলিসকে। সে অভিশপ্ত হয়ে চলে যাচ্ছে আর কাঁদছেন জিবরাইল ও মিকাইল (আ.)।

فَاَوْحَى اللهُ تَعَالٰى اِلَيْهِمَا مَالَكُمَا تَبْكِيَانِ

'আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাঁদছ কেন?'

قَالَ يَارَبِّ مَا نَأْمَنُ مِنْ مَكْرِكَ

'তারা বললেন, হে আল্লাহ! আমরা আপনার অদৃশ্য তদবীর থেকে নিরাপদ নই।'

অর্থাৎ– ইবলিছ নয় হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিল। হাজার বছরের ইবাদতের পর আল্লাহর অদৃশ্য গ্রেফতারি কেমন প্রকাশ পেল? আল্লাহ ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। সুতরাং হে আল্লাহ! আমরা আপনার অদৃশ্য গ্রেফতারি থেকে নিরাপদ নই।

فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰكَذَا كُوْنَا لَا تَأْمَنَّا مَكْرِىْ

'আল্লাহ বললেন, এমনই হওয়া চাই। আমার তদবীর থেকে তোমরা নিরাপদ না হওয়া চাই।'

অর্থাৎ– তোমাদের ওপর আমার ভয় থাকা চাই। আমি যখন চাইব যে কারো অবস্থা যেমন ইচ্ছা তেমন করব।

বন্ধুগণ! যদি ফেরেশতাদের অবস্থা এমন হয়, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে!

জিবরাইল (আ.)-এর অস্থিরতা

একবার হযরত জিবরাইল (আ.) নবীজির নিকট এসে কাঁপতে লাগলেন আর কাঁদছেন এবং কাবা শরীফের গেলাফ ধরে দু'আ করছেন–

اِلٰهِىْ وَسَيِّدِىْ لَا تُغَيِّرْ اِسْمِىْ وَلَا تُبَدِّلْ جِسْمِىْ

'হে আমার আল্লাহ! হে আমার মালিক! আমার নামটা পরিবর্তন করো না এবং আমার দেহ বিবর্তন করো না।'

নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, জিবরাঈল! আজ তুমি এটা কীসের দু'আ করলে? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি যেদিন দেখলাম, আল্লাহ ইবলিসকে বিতাড়িত করে বের করে দিয়েছেন, সেদিন থেকে আমার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ঢুকে যায়, আমি সব সময় আল্লাহর দরবারে ইবলিসের পরিণতি থেকে ক্ষমা চাই। কারণ, আমি দেখেছি ইবলিসের নাম আযাযিল থেকে পরিবর্তন করে ইবলিস রাখা হয়েছে। আর তার দেহকে পুণ্যবানদের আকৃতি থেকে পরিবর্তন করে পাপিষ্ঠদের আকৃতিতে বদলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আজ আমি কাবার চাদরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! আমার নাম পরিবর্তন করো না এবং আমার দেহ পরিবর্তন করে পাপিষ্ঠদের মধ্যে শামিল করো না। ভাই! আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গ্রেফতারি থেকে বাঁচান। আমাদের উপস্থিতি কবুল করুন।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অস্থিরতা

ওই সমস্ত চিন্তা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ছিল। উদাহরণস্বরূপ সায়্যেদা আয়েশা (রাযি.)-এর অবস্থা দেখুন, যাকে নবীজি পবিত্র জবানে জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। তিনি রাতে জাগ্রত হয়ে যখন তাহাজ্জুদের নামাযে এ আয়াত পাঠ করতেন,

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝

'আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্মুখে এমন বিষয় প্রকাশ হবে, যে সম্পর্কে তারা ধারণাও করত না।'[১]

তখন তিনি কাঁদতে শুরু করতেন। অতঃপর সারা রাত এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। ভাই! একটু ভেবে দেখুন, আমরা কি কোনোদিন এমন চিন্তা করেছি যে, যদি কেয়ামতের দিন আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে?

হযরত ওমর (রাযি.)-এর অস্থিরতা

সাহাবায়ে কেরাম কুরআন তেলাওয়াত করার সময় যেসমস্ত আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে ধমকিস্বরূপ পাওয়া যেত, সেগুলোকে নিজেদের ওপর ধার্য করে কাঁদতেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাযি.) এই আয়াতটি পাঠ করে কাঁদতেন

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

'তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই শেষ করে এসেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ।'[২]

এ আয়াত যদিও কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তবু হযরত ওমর (রাযি.) সেটি তেলাওয়াত করে কাঁদছেন, কী জানি, যদি ওমরকেও একথা বলা হয়ে যায়।

কেয়ামতের দিন মানুষের স্ক্যানিং

কেয়ামতের দিন আমাদের মাথায় গোনাহের পাহাড় দেওয়া হবে। সেখানে আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ প্রত্যেককে এভাবে দেখবেন

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৪৭

২. সূরা আহকাফ : আয়াত ২০

যেভাবে এয়ারপোর্টে মানুষকে একজন-একজন করে মেশিনে তুলে স্ক্যানের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। কত সৌভাগ্যবান হবে যারা সেখানে ছাড় পেয়ে যাবে এবং জান্নাতের দরজা পরিদর্শন করানো হবে। কিন্তু কতিপয় মানুষ এমনও থাকবে, যারা চলতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন–

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۝

'ওদের দাঁড় করাও; ওরা জিজ্ঞাসিত হবে।'[১]

এরা সূফী সাহেব। বাইরে আল্লাহ-আল্লাহ আর ভেতরে কোন জোড়া ভালা। চিন্তা করুন, যদি আমাদের ক্ষেত্রে সেই আদেশ জারি হয়ে যায়! বলা হবে, ওই হাজী সাহেবদের দাঁড় করাও। ওই তালেবে ইল্‌মদের দাঁড় করাও। ওই আলেমকেও দাঁড় করাও। আকৃতি যেরকমই হোক মূলত প্রকৃতি অন্য রকম ছিল। আমার মেশিন তাদের স্ক্যান করে রেখেছে। তাদের অন্তরে ভালোবাসা ছিল না। তাদের হৃদয়ে রিপু প্রাধান্য ছিল। শয়তানি প্রবল ছিল। খারাপ ধারণা ছিল। তাদের আটকাও; আমি একটু জিজ্ঞেস করব। আমি যে নেয়ামত দিয়েছিলাম, সেগুলো ইবাদতে ব্যয় না করে কোথায় ব্যয় করেছে। বন্ধুগণ! আজই সময়; আমরা আল্লাহর দরবারে কাঁদব, আমাদের অপরাধ ক্ষমা চেয়ে নেব।

একটি অদ্ভুত সুপারিশ

নিজের ওপর দায়িত্ব মনে করে উপস্থাপন করছি। হাদীছ শরীফে এসেছে, কেয়ামতের দিন যখন জাহান্নামিদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন কতিপয় জাহান্নামিকে অন্যের সুপারিশের মাধ্যমে বের করে আনা হবে। নবীগণ সুপারিশ করবেন। শহীদগণ, হাফেযগণ, আলেমগণ জান্নাতিগণ সুপারিশ করবেন। এমনকি কোনো সুপারিশকারী বাকি থাকবে না। সকলেই সুপারিশ করবে। এক জাহান্নামি উপস্থিত হবে, যার চোখের ভ্রূ আল্লাহর দরবারে তার জন্য সুপারিশ করবে, হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে আপনার ভয়ে একদিন কেঁদেছিল। তার কান্নার ফলে ছোট এক ফোঁটা পানিও বের হয়েছিল। এতে আমি ভিজে গিয়েছিলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই বান্দা ওইদিন আপনার ভয়ে কেঁদেছিল। তখন আল্লাহ জিবরাঈল (আ.)কে বলবেন, জিবরাঈল! ঘোষণা দিয়ে দাও, ওই

---

১. সূরা সাফফাত : আয়াত ২৪

ব্যক্তির ভ্রূর একটি লোমের সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিলাম।

আজ গোনাহের ওপর কেঁদে নাও

বন্ধুগণ! যেহেতু কেয়ামতের দিনের অবস্থা ভয়াবহ হবে; সুতরাং আজ সহজ কাজ হলো, আমরা আল্লাহর দরবারে কেঁদে নেব। কেঁদে-কেঁদে গোনাহ ক্ষমা করার এবং ভবিষ্যতে পুণ্যময় জীবন গড়ার নিয়ত করব। তাই কোনো কবি বলেন–

بَكَيْتُ عَلَى الذُّنُوْبِ لِعَظْمِ جُرْمِيْ * وَحَقَّ لِكُلِّ مَنْ يَّعْصِى الْبُكَاءُ

فَلَوْ كَانَ الْبُكَاءُ يَرُدُّ هَمِّيْ * لَاَسْعَدَتِ الدُّمُوْعُ مَعًا دِمَاءً

আমার অপরাধ গুরু হওয়ার কারণে আমি গোনাহের জন্য কাঁদছি। যারা গোনাহ করে, তাদের প্রত্যেকের কাঁদা উচিত। এই কান্না যদি আমার চিন্তা দূর করতে পারে, তাহলে আমার অশ্রু ও রক্ত ধন্য হবে। আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের গোনাহের ওপর অশ্রু প্রবাহিত করার তাওফীক দান করুন এবং সেগুলোকে কবুল করুন। কেয়ামতের দিন যেন এই অশ্রু লৌকিকতার অশ্রু না হয়। তাই কেউ বলেছেন, বাহ্যিকভাবে ভালোবাসার কান্না কিন্তু ভেতরে উহ শব্দও নেই, কান্নার অন্তর সব ডিঙিয়ে মাহবুবকে কাছে পেতে চায়। আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর গ্রীবা জাহান্নামে যাবে না।

হে আল্লাহ! আমাদের ওপর দয়া করুন। কেয়ামতের দিনের অপমান আমরা সইতে পারব না। দুজন মানুষের সামনে আমরা অপমান সহ্য করতে পারি না। সুতরাং কেয়ামতের দিন আমাদের মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কী করে অপমান সইব। হে আল্লাহ! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন, আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন। আমাদের অন্তরকে কোমল করে দিন। চোখ থেকে অনুশোচনার পানি সহজে নির্গত করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

পরিপূর্ণ বিশ্বাসের গুরুত্ব

'আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষদের পূর্ণ ফলাফল অর্জনের জীবন শিক্ষা দিয়েছেন। সম্ভাব্য বিষয় পূর্ণাঙ্গ নয়। যারা নবীগণের পন্থায় জীবন গড়বে, তারা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান অর্জন করবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একেই ঈমান ও বিশ্বাস বলে। শতভাগ লোকের হৃদয়ে একথা বসিয়ে নেওয়া দরকার যে, আজ থেকে আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশমতো জীবন গড়ব। আমার দৃষ্টি যা-ই দেখুক আল্লাহর নির্দেশমতো আদায় করলে আল্লাহ তাতে সম্মান দান করবেন। আর যদি আমি আল্লাহর বিধান থেকে সরে যাই, তাহলে আমাদের সফলতার চিত্রে আল্লাহ পরিশেষে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা ঢেলে দেবেন।'

পরিপূর্ণ বিশ্বাসের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا -

وَقَالَ تَعَالٰى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

وَقَالَ تَعَالٰى وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

আল্লাহর রীতি ও তাঁর শক্তি

আল্লাহ সৃষ্টিকে তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি দ্বারা সৃজন করেছেন আর সেগুলো পরিচালিত হওয়ার জন্য কিছু নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে নীতিমালা অনুযায়ী সৃষ্টিকুল পরিচালিত হয়। আমরা সেই নীতিমালাকে Physieal laws বা প্রাকৃতিক নীতিমালা বলি। আরবি ভাষায় একে 'আল্লাহর সুন্নত' বা রীতি বলা হয়। সৃষ্টিজীব এই রীতির অধীনে চলে। তবে কোনো-কোনো সময় এই রীতির ব্যতিক্রম হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছামতো পরিচালিত হয়। একে আল্লাহর কুদরত বা শক্তি বলে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে মনে করুন যে, কারখানার মালিক কিছু নীতিমালা তৈরি করেছেন। সে অনুযায়ী তাঁর কারখানা পরিচালিত হয়। কিন্তু তিনি এই নীতিমালা পালন করতে বাধ্য নন। তিনি ইচ্ছা করলে নীতিমালা পরিবর্তন করতে পারেন। এতে কারো কোনো কিছু বলার অধিকার নেই। সুতরাং আল্লাহও তাঁর নির্ধারিত নীতিমালা বহির্ভূত কাজ করতে পারেন। এটা বলা হয় আল্লাহর কুদরত। সাধারণত দুনিয়া সেই নীতি অনুযায়ীই পরিচালিত হয়।

আল্লাহ বলেন–

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا

'তুমি আল্লাহর নীতিতে পরিবর্তন পাবে না।'[১]

এর দৃষ্টান্ত হলো, আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর পানি সমতলে চলে। এটি আল্লাহর নীতি। কিন্তু যদি আল্লাহ চান, তাহলে এর ব্যতিক্রমও করতে পারেন। যেমন– ইবরাহীম (আ.)কে আগুন জ্বালাতে পারল না। হযরত মূসা (আ.) সাথিদের নিয়ে সমুদ্রের কিনারায় গেলেন আর পানি তার নিয়ম মেনে সমতল হয়ে বসে আছে। কিন্তু সে তার নিয়মে অটল থাকতে পারেনি। দু-পাশে আলাদা হয়ে মধ্যখানে আল্লাহর পয়গম্বর ও তাঁর সাথিদের রাস্তা করে দিল। এটি আল্লাহর কুদরত। তিনি রাজাধিরাজ। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু তাঁর আজ্ঞাবহ। নিজের ইচ্ছামতো যেভাবে চান, সেভাবে পরিচালিত করেন।

উপকরণ ও উপকরণের সত্তার ওপর ভরসাকারী

এখানে মুসলমানের জীবন ও কাফেরদের জীবনের পার্থক্য বোঝা যায়। কাফেররা সৃষ্টিকে তাদের নীতিমালার ওপর পরিচালিত দেখে এটাই বুঝেই বসে আছে যে, সবকিছু তার নিয়মের ওপর চলে। আর মুমিনগণ আল্লাহর সত্তা ও তাঁর কুদরতের ওপর ভরসা রাখে। তারা জানে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ যা চান তা-ই হবে। সুতরাং মুমিনের দৃষ্টি বস্তু সৃষ্টিকারীর সত্তার ওপর আর কাফেরদের দৃষ্টি বস্তুর ওপর। এজন্যই কাফেররা পৃথিবীতে ধোঁকা খায় আর মুমিনগণ কামিয়াব হয়। এই রহস্য আল্লাহ নবীগণের নিকট খুলে দিয়েছেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসে মানুষদের বলেছেন, হে লোকসকল! সমস্ত সৃষ্টির তোমরা যে বাহ্যিক রূপ দেখেছ, তা সব সময় প্রতিফলিত হয় না। আল্লাহ যখন চাইবেন, তখন তোমাদের দৃষ্টি তোমাদের ধোঁকা দেবে। তোমাদের হাজার বছরের নিরীক্ষা বিফলে যাবে। আর আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে।

এবার এর একটি উদাহরণ শুনুন। কোনো রোগীকে ইমারজেন্সিতে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে এক নজর দেখেই কিছু ওষুধ লিখে দেয়। একে বলা হয় Differntial Reasons (সম্ভাব্য চিকিৎসা)। এই রোগীর এমন অবস্থা; সুতরাং

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৪৩

এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে। এরপর তাকে বিভিন্ন টেষ্ট দেওয়া হয়। যথা– রক্ত, প্রস্রাব, কফ ইত্যাদি। তারপর টেষ্টের রিপোর্ট দেখে তারা নির্ধারণ করে, তার এই রোগ রয়েছে। একে Differntial Reasons বলে। সুতরাং যারা বাহ্যিক উপকরণের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, তারা Differntial Reasons ওপর জীবন যাপন করে। আর মুমিন যেহেতু আল্লাহর নির্দেশকে সামনে রেখে জীবন যাপন করে, তাই তাদেরকে Differntial Reasons বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বুঝে নাও যে, আকাশে মেঘ দেখা দিলে এটা বৃষ্টির আলামত। তবে এটা Differntial Reasons হবে। প্রতিনিয়ত তো এমনটা হয় না। কেননা, অনেক সময় দেখা যায়, সারা মাস আকাশে মেঘ আছে; কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। আর যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তাকে Differntial Reasons বলা হয়। কুরআন স্পষ্ট বলে দিয়েছে, কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর নিকট নিজেদের অপরাধের ওপর অনুশোচনা করলে, আল্লাহ তার রহমতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আল্লাহ বলেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝

'তোমরা ক্ষমা চাও তোমাদের প্রভুর দরবারে। তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি নাযিল করবেন।'[১]

এজন্য নবীজি ইরশাদ করেছে, যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন গোত্রের সবাই মাঠে গিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবে, তাওবা করবে। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করে তাঁর রমহতের বৃষ্টি জাতির কল্যাণের জন্য নাযিল করবেন। একে বলা হয় Differntial Reasons

বাহ্যিক উপকরণ বরতনের মতো

বাহ্যিক উপকরণ হচ্ছে খালি বরতনের মতো। তাতে কল্যাণকর বস্তু কিংবা অকল্যাণকর বস্তু রাখা এটা মালিকের অধিকার। তোমার একটা গ্লাস আছে। এতে তুমি চাইলে পানিও রাখতে পার, চাইলে দুধও রাখতে পার। এটা তোমার অধিকার। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক উপকরণ খালি বরতন। আল্লাহ তা চাইলে তাতে উপকার রাখতে পারেন, চাইলে ক্ষতি রাখতে পারেন। অতঃএব, এ পৃথিবী আল্লাহর ইচ্ছাধীন পরিচালিত হয়।

---

১. সূরা নূহ : আয়াত ১০, ১১

অপমানের চিত্রে সম্মানের সিদ্ধান্ত

যে-বান্দা আল্লাহকে রাজি-খুশি করে জীবন যাপন করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে অপমানের আদলেও সম্মান দান করবেন। যেমন– হযরত ইউসুফ (আ.)কে গোলামির আদলে বাদশাহি দান করেছিলেন।

সম্মানের চিত্রে অপমানের সিদ্ধান্ত

যে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করবে, আল্লাহ তার সম্মানের চিত্র থেকে অপমান নির্গত করে দেবেন। যেমন– কারুনকে কী পরিমাণ সম্মান দেওয়া হয়েছিল? সে তার যুগের কত বড় ব্যবসায়ী ছিল? সে বলত–

إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ

'আমার জ্ঞানের বিনিময়ে আমাকে এগুলো দেওয়া হয়েছে।'[১]

নিজের বিবেক, টেকনিক ও বুদ্ধিমত্তার ফলে আমি এত বড় ব্যবসায়ী হয়েছি। আমি ভালো বিনিয়োগ করি; তাই আমার সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ

'জাতির সামনে অত্যন্ত সাড়ম্বরে বের হলো। তা দেখে মানুষের চোখ যেন ফেটে যাচ্ছে।'[২]

তারা বলল–

يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ

'আফসোস! যদি আমার কাছে এত থাকত, যত আছে কারুনের!'[৩]

তার যুগে সে খুব আড়ম্বর ও বিনোদনে ছিল। আল্লাহ তার ইজ্জতের চিত্রে বেইজ্জতি ঢেলে দিলেন–

فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ

'তাকে এবং তার কোষাগার ও তাতে যা কিছু ছিল সবগুলোকে আমি জমিনে ধসিয়ে দিলাম।'[৪]

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৭৮
২. সূরা কাসাস : আয়াত ৭৯
৩. সূরা কাসাস : আয়াত ৭৯
৪. সূরা কাসাস : আয়াত ৮১

দুধের দ্বারা সুস্থতা ও মৃত্যু

চিন্তা করে দেখুন, একলোক দুধ পান করে সুস্থতা পায় এবং শক্তি লাভ করে। আরেক লোকের ডায়রিয়া হলো। সে দুধ পান করার কারণে রোগ বৃদ্ধি পেয়ে মারা গেল। সুতরাং আল্লাহ চাইলে দুধের মধ্যে জীবন দেন আর চাইলে এই দুধের মাধ্যমেই মৃত্যু দান করেন। এ বিষয়টা যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সহজ হয়ে যাবে।

আরোগ্য আল্লাহর হুকুমে পাওয়া যায়

হযরত মূসা (আ.) অসুস্থ হলেন। তুর পাহাড়ে গিয়ে বললেন, হে আমার মালিক! শরীরটা অনুকূলে দেখা যাচ্ছে না। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, যাও; অমুক গাছের পাতা চিবিয়ে খাও। মূসা (আ.) গেলেন। সে গাছের পাতা খেলেন। ফলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর পুনরায় সেই রোগ দেখা দিলে তিনি পাহাড়ে গিয়ে ওই গাছের পাতা ভক্ষণ করলেন। কিন্তু কোনো প্রকার আরোগ্য এল না। তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আপনার নির্দেশে এই গাছের পাতা ভক্ষণ করলাম। ফলে সুস্থ হয়ে গেলাম। এবার দেখছি, এ গাছের পাতার কোনো প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে না।

আল্লাহ বললেন, হে আমার প্রিয় মূসা, ওই গাছের পাতায় তোমাকে আরোগ্য দেওয়ার শক্তি নেই। তুমি সুস্থ হয়েছিলে আমার হুকুমে। আমি তার পাতায় তোমার আরোগ্য রেখেছিলাম।

সুতরাং ভাই! আল্লাহ যখন যা চান তখন তা করেন। তিনি চাইলে যেকোনো বস্তুর মধ্যে মানুষের কল্যাণ রাখেন। চাইলে ওই বস্তুতেই মানুষের অনিষ্ট রাখেন।

নবীগণের পথ সম্মানের পথ

আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষদের পূর্ণ ফলাফল অর্জনের জীবন শিক্ষা দিয়েছেন। সম্ভাব্য বিষয় পূর্ণাঙ্গ নয়। যারা নবীগণের পন্থায় জীবন গড়বে, তারা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান অর্জন করবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একেই ঈমান ও বিশ্বাস বলে। শতভাগ লোকের হৃদয়ে একথা বসিয়ে নেওয়া দরকার যে, আজ থেকে আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশমতো জীবন গড়ব। আমার দৃষ্টি যা-ই দেখুক আল্লাহর নির্দেশমতো আদায় করলে আল্লাহ তাতে সম্মান দান করবেন। আর যদি

আমি আল্লাহর বিধান থেকে সরে যাই, তাহলে আমাদের সফলতার চিত্রে আল্লাহ পরিশেষে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা ঢেলে দেবেন।

হযরত আলী (রাযি.)-এর বিশ্বাস

সাহাবায়ে কেরাম ঈমানকে এমন মজবুত করেছিলেন যে, চাক্ষুষ দেখার পরও এমন বিশ্বাস হতো না, যেমন বিশ্বাস তাঁরা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর ওপর করতেন। একবার নবীজি বললেন, এক মহিলা মদিনার মুসলমানদের সংবাদ মক্কায় কাফেরদের নিকট বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। নবীজি হযরত আলী (রাযি.)সহ কতিপয় সাহাবাকে প্রেরণ করলেন, যাও; ওই মহিলার কাছ থেকে সেই চিরকুটটা নিয়ে আসো। তারা চলে গেলেন। রাস্তায় গিয়ে মহিলাকে পেয়ে গেলেন। তারা বললেন, তোমার কাছে একটা চিরকুট আছে; অতি সত্তর সেটা বের করে দাও। মহিলা সেটা তার গোপন অঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিল। সে অস্বীকার করল– আমার হাতে কোনো চিরকুট নেই। তারা বাহ্যিক সব কিছু চেক করলেন। কিন্তু চিরকুট পেলেন না। তারা প্রায় নিরাশ, সে চিরকুটটা রাখল কোথায়? হযরত আলী (রাযি.) বললেন, না; তা হতে পারে না। আমার মাহবুব মিথ্যা বলতে পারেন না। এর কাছে চিরকুট অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, এই মেয়ে! ভালো মনে করলে নিজহাতে চিরকুটটা বের করে দাও। নতুবা কাপড় খুলে তোমার গুপ্তাঙ্গ থেকে চিরকুট বের করতে আমি বাধ্য হব। একথা বলার পর মহিলা ভয়ে তার গুপ্তাঙ্গ থেকে নিজহাতে চিরকুটটা বের করে দিল।

ভাই! একেই বলে ঈমান। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; তা মিথ্যা হতে পারে না। ভাই! আমাদের এমন ঈমান অর্জন করা চাই। আমাদের নবীজির সুন্নতময় জীবন গড়া চাই। আমরা সর্বাবস্থায় সফল হব।

শরীয়তের বিধানে উপকার আর উপকার

এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, বাহ্যিক উপকরণের ওপর দৃষ্টি দানকারীরা যেহেতু বস্তুর উপরিভাগ দেখে; সুতরাং বস্তু দেখার সঙ্গে-সঙ্গে তার বাহ্যিক অবস্থার প্রতিই তাকায়। উপকরণের সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা দেখে, সুদ গ্রহণ করলে আমার সম্পদ অতি তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে; কিন্তু শরীয়ত বলে, এতে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়নি বরং তোমাদের সম্পদ থেকে বরকত দূরীভূত হয়। যা আসবে তা স্বল্প, কিন্তু যা ক্ষতি হবে তা

অনেক। আমি ডজনের চেয়ে বেশি লোককে দেখেছি, সুদের ব্যবসা করে নিঃস্ব হয়েছে।

সুতরাং এক হলো বাহ্যিক দৃষ্টির পন্থা, আরেকটি হলো দূরদর্শিতার রাস্তা। অতএব, সাধারণত মানুষদের দেখা যায় যে, বাহ্যিক অবস্থার ওপরই মানুষ চলে। কথায় বলে, চলো তোমরা ওই দিকে, যেদিকে বাতাস চলে। কিন্তু ভাই! এটা তো বিধর্মীদের জিন্দেগি, যেদিকে বাহ্যিক উপকার দর্শন করে, সেদিকেই চলে। তাদের মস্তিষ্কে তো একথা নেই যে, আমার আল্লাহকে রাজি করতে হবে। কিন্তু মুমিনের ধারা ভিন্ন। ওরা নবীর বান্দা নয়– ওরা আল্লাহর বান্দা। তারা আল্লাহর নির্দেশমতো জীবন গড়ে। পরিশেষে আল্লাহ তাদেরকে স্থায়ী সফলতা দান করবেন।

ভয় নবুওতের পরিপন্থী নয়

আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তুর পর্বতে কথা বললেন। আল্লাহ বললেন–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى

'তোমার ডান হাতে কী?'[১]

তিনি উত্তর দিলেন–

قَالَ هِيَ عَصَايَ

'হে আল্লাহ! এটা আমার লাঠি।'

তার উপকারিতাও বলে দিলেন–

أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا

'আমি তার ওপর ভর করি।'

وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي

'এর দ্বারা আমি আমার ছাগলপালকে পাতা ছিড়ে দিই।'

وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ

'এছাড়াও এটা আমার অনেক কাজে লাগে।'[২]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৭

২. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৮

তখন আল্লাহ বললেন–

قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى

'হে মূসা! একে ভূমিতে রাখো।'[১]

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

'তিনি সেটা জমিনে রাখলেন। তখন সে একটা বিরাট সাপ হয়ে নড়াচড়া করতে শুরু করল।'[২]

হযরত মূসা (আ.) যখন দেখলেন, সেটা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে,

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

'তখন তার অন্তরে ভয় এসে গেল।'[৩]

সুতরাং ভয় নবুওতের দায়িত্বের পরিপন্থী নয়। এটা প্রকৃতিগত বিষয়। যেমন– ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ইত্যাদি এগুলো নবুওতের পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে বাহ্যিক বস্তুতে ভয় আসা নবুওতের পরিপন্থী নয়। যাক, যখন তিনি সেটা দেখে ভয় পেলেন, তখন আল্লাহ বললেন–

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ

'একে ধরো; ভয় করো না।'[৪]

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

'আমি তাকে পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে দেব।'[৫]

অতঃপর যখন তিনি তাকে ধরলেন, তখন সেটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল।

এখানে উদ্দেশ্য কী ছিল? উদ্দেশ্য হলো, হে আমার প্রিয় মূসা! যে-বস্তুকে তুমি তোমার নিজের জন্য এত উপকারী বললে, আমার হুকুমে যখন সেটা মাটিতে রাখলে, তখন সেটা ক্ষতিকারক বস্তু হয়ে গেল। অতঃপর তুমি ক্ষতিকর বস্তু দেখে ভয় পেয়ে দূরে সরে গেলে। আমি পুনরায় নির্দেশ দিলাম তাকে ধরতে। তখন তা তোমার উপকারী লাঠি হয়ে গেল।

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৯
২. সূরা ত্বহা : আয়াত ২০
৩. সূরা ত্বহা : আয়াত ৬৭
৪. সূরা ত্বহা : আয়াত ২১
৫. সূরা ত্বহা : আয়াত ২০

সুতরাং স্মরণ রেখো, উপকার ও ক্ষতি বস্তুর কৃতিত্ব নয়। সবকিছু আমার নির্দেশে হয়। এটিই হয় মুমিনের দৃষ্টি। তারা সর্বদা আল্লাহর ওপর দৃষ্টি রাখে। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ যখন যেটা চান, তখনই সেটা করেন। আল্লাহ বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াও কাজ সমাধা করতে পারেন। এটাই মুমিনের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা। পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্তা থেকে দৃষ্টি সরে গেলেই মানুষ ধোঁকা খায়।

আল্লাহর প্রতি হযরত ওমর (রাযি.)-এর বিশ্বাস

সাহাবায়ে কেরামের জীবন এমন ছিল যে, তারা সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাসনকাল। আল্লাহ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)-এর হাতে অসংখ্য বিজয় দান করেছেন। যেদিকে যেতেন সেদিকেই বিজয় অর্জন করে প্রত্যাবর্তন করতেন। বিজয়ের ক্ষেত্রে তাকে তোতা পাখি বলা হতো। হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাসনামলের কোনো এক যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় হযরত ওমর (রাযি.) এক সাহাবির মাধ্যমে একটা চিঠি প্রেরণ করলেন। বলে দিলেন, 'খালিদ! পত্রবাহক তোমার নিকট পত্র পৌঁছানোর সঙ্গে-সঙ্গে সে তোমাদের জামাতের সেনাপতি। এরপর তুমি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদ করলে সাধারণ সৈনিক হয়ে তার নেতৃত্বে জিহাদ করবে। আর সেটা পছন্দ না হলে তুমি সোজা মদিনায় চলে আসবে।'

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) পত্র পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পত্রবাহককে সেনাপতির ঝান্ডা সোপর্দ করে বললেন, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদ করতে চাই। সুতরাং সাধারণ সৈনিক হয়ে জিহাদ করছেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জনাব, আপনি সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। কোনো ধরনের নির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত খলীফা আপনাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করলেন। এবার আপনি সাধারণ সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করছেন। এতে আপনার মনে কষ্ট হচ্ছে না?

তিনি বললেন, কেন? আমার কষ্ট হবে কেন? আমি সেনাপতি থাকা অবস্থায় যে আল্লাহকে রাজি করার জন্য জিহাদ করেছি, এখনো সেই আল্লাহকে রাজি করার জন্যই জিহাদ করছি। সুতরাং এতে কষ্ট আসার কোনোই কারণ নেই।

এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাযি.)কে কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এ কাজ করে জাতিকে এত বড় সেনাপতির তত্ত্বাবধান থেকে

বঞ্চিত করলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, জাতিকে এক মহান সেনাপতির নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছি সত্য, তবে এতে আমি উম্মতের ঈমান সংরক্ষণ করেছি।

কীভাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের হাতে এত পরিমাণ বিজয় দান করেছেন, যার ফলে সাধারণ সৈনিকরা একথা ভেবে বসতে পারে যে, আমাদের সঙ্গে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রয়েছেন; সুতরাং আমাদের বিজয় নিশ্চিত। এতে মুজাহিদগণের ভরসা আল্লাহর ওপর কমে যাচ্ছে। তারা বিজয়ের কারণ খালিদকে মনে করে। তাই আমি আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রাখার জন্য তাকে অপসারণ করছি। আল্লাহর সাহায্য তো এখনো আসবে।

সুতরাং ভাই! আমাদেরও সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা চাই। আমাদের ঈমাম মজবুত করা চাই।

বদর যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সাহায্য

এজন্যই আল্লাহ বদর যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামকে অস্ত্রবিহীন যুদ্ধের ময়দান নিয়েছিলেন। সমস্ত সৈনিকের মধ্যে মাত্র দুটি তরবারি ছিল। এটি কীভাবে হলো? অথচ এ-সময় মানুষ অস্ত্র ব্যতীত ঘর থেকে বের হতো না। আসল কারণ হলো, আল্লাহ ওই জামাতকে প্রস্তুতিবিহীন শত্রুদের সম্মুখে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, দুনিয়াবাসীকে জানাতে চেয়েছেন, যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষে অস্ত্র থাকে। অতঃপর একদল বিজয় অর্জন করে। তখন প্রমাণিত হয়, তারা অস্ত্রচালনায় পারদর্শী; তাই জয়যুক্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ এমন অবস্থা বাস্তবায়িত করে দেখালেন যে, এদের হাতে কোনো অস্ত্রই নেই। অপর পক্ষে লোহার গড়া সৈনিকরা অবস্থান নিয়েছে।

পবিত্র কুরআন বলে–

كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

'তারা দেখেশুনে নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে টেনে নিচ্ছে।'[১]

অথচ সাহাবায়ে কেরাম দেখছেন, শত্রুরা লোহার গড়া প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এরপরও বিজয় দান করলেন। কেন?

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৬

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ

'আল্লাহ চেয়েছেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং বাতেলকে মিসমার করবেন।'[১]

সুতরাং আল্লাহ এই নিরস্ত্র সৈনিকদেরকে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে এমন সাহায্য করলেন যে, পরিশেষে তারা কৃতিত্বের সাথে বিজয় অর্জন করল। আল্লাহ বলেন–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ

'কতবার এমন হয়েছে যে, ছোট একটি জামাত অনেক বড় জামাতের ওপর জয়ী হয়েছে।'[২]

আরো সহজে বুঝে নিন যে, কতবার এমন হয়েছে যে, আল্লাহ চড়ুই পাখির দ্বারা বাজপাখি ধ্বংস করেছেন।

وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'[৩]

ভাই! আল্লাহ যখন চান, তখন চড়ুই পাখির দ্বারা বাজপাখিকে ধ্বংস করেন। একেই ঈমান বলে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে স্থাপন করতে হবে.। তাহলে আল্লাহর সাহায্য তোমার সাথি হবে। আর এই বিশ্বাস না থাকলে গায়বি সাহায্য আসবে না। তখন বাহ্যিক উপকরণের খেলা হবে। যার নিকট অস্ত্র শক্তিশালী ও অধিক থাকবে, সে বিজয়ী হবে। সুতরাং মুমিনদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, জীবনের ময়দানে শুধু উপকরণ নিয়ে এলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, জীবনের মাঠে বিশ্বাস নিয়ে আগমন করো। বিশ্বাস এমন একটি নেয়ামত যে, পৃথিবীর কোনো বস্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন–

تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ

'আমরা আগে ঈমান শিখেছি। তারপর কুরআন শিখেছি।'

আজ আমাদের সেই ঈমান শিক্ষা করা জরুরি। কারণ, দুনিয়ার কিছুসংখ্যক ব্যতীত সকলেই আজ বাহ্যিক উপকরণের ওপর নির্ভরশীল।

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৮
২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

বর্তমানে তো সবাই বলে, আমি ঈমান এনেছি। ভাই! আমরা তো মুখে বলি ঈমান এনেছি, কিন্তু বাস্তবতার সম্মুখীন হলে বোঝা যায় ঈমান কাকে বলে। পার্থক্য এতটুকু যে, কেউ কথা বলে, কেউ বলে না। আর বাস্তবের সম্মুখীন হলে মনে হয় কারো ঈমানের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। যদি প্রকৃত ঈমানদার ৩১৩ জন মাথা নাড়া দিয়ে অবস্থান নেয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পৃথিবীর কালচার পরিবর্তন করে দেবেন। পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টে যাবে।

আমার মুরশিদ বলতেন, তোমার হাতে কুরআন থাকবে আর তুমি পৃথিবীতে পেরেশান হবে? তোমার হাতে কুরআন থাকবে আর তুমি নাকাম হবে? তোমার হাতে কুরআন থাকবে আর তুমি পৃথিবীতে অন্যের গোলাম হবে? নিজের নফস, শয়তান কিংবা কোনো মানুষের গোলাম হবে? কুরআন আমাদের বলে, হে আমাকে বিশ্বাসকারী মুসলমান

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

'তুমি কুরআন পড়ো, তোমার প্রভু তোমাকে সম্মান করবেন।'[১]

তোমার প্রভু তোমাকে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দান করবেন। তোমার জাহের-বাতেন শুধরিয়ে দেবেন। এমনো হয়েছে যে, সফল হওয়ার ব্যাপারে সবাই নিরাশ হয়েছে। সবার মুখে প্রকাশ পাচ্ছে, এটা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ অতি সহজে সেটা জয় করে দিয়েছেন।

অজেয় দুর্গের বিজয়

মদিনার নিকটবর্তী এলাকায় একটা সম্প্রদায় ছিল, যারা বড়-বড় দুর্গ তৈরি করে রেখেছিল। আমি অধম সেই দুর্গগুলো দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। প্রায় দেড় মিটার চওড়া দেওয়াল, যেগুলো দেখে বাস্তবেই মনে হয়, সেগুলো বিজয় করা দুঃসাধ্য। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামও নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এগুলো জয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন, সেগুলো মুসলমানদের হাতে বিজয় করাবেন। কুরআন বলে–

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا

১. সূরা আলাক : আয়াত ৩

'তিনি ওই সত্তা, যিনি আহলে কিতাবদের কতিপয় লোককে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। তারা বের হওয়ার ব্যাপারে তোমরা কল্পনাও করছিলে না।'[১]

وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ

'তারাও ভেবে ছিল, তাদের এই দুর্গসমূহ আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধক হবে।'[২]

কেউ তাদের জয় করতে পারবে না। তিনি আমাদের মালিক। তিনি বলেন–

فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا

'অতঃপর আল্লাহ এমন কৌশল অবলম্বন করলেন, যে সম্পর্কে তারা ধারণাও করতে পারল না।'[৩]

কী হলো?

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

'তাদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করে দিলেন।'[৪]

তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল, এই মুসলমানরা যেখানেই যায় সেখানেই বিজয় অর্জন করে প্রত্যাবর্তন করে। যদি তারা আমাদের দিকে মনস্থ করে, তাহলে আমাদের বিবি-বাচ্চাদের কী অবস্থা হবে? সম্পদের কী হবে? সুতরাং তারা আমাদের অভিমুখে অভিযান চালানোর পূর্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতএব, তারা আসবাবপত্র বের করে ঘরবাড়ি খালি করতে শুরু করল।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ

'তারা নিজহাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিল এবং মুমিনদের হাতেও।'[৫]

---

১. সূরা হাশর : আয়াত ২
২. সূরা হাশর : আয়াত ২
৩. সূরা হাশর : আয়াত ২
৪. সূরা হাশর : আয়াত ২
৫. সূরা হাশর : আয়াত ২

মুমিনরা তাদের এই সংকল্প সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের ওপর অক্রমণ করে তাদের পলায়নে সহায়তা করলেন।

فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ

'হে বিবেকবানরা! এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।'[১]

যখন আমি চাই, তখন এরকম সাধারারণ মানুষ দিয়ে অজেয় দুর্গের বিজয় হাতের নাগালে এনে উপস্থিত করে দিই। এই বিশ্বাস নিজের জীবনের মধ্যে স্থাপন করা চাই। এর ওপর শ্রম দিতে হবে। এ-বিজয় দু-চার কথায় হাসিল হয় না। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমি-আপনারা বসলাম, ওয়াজ করালাম, খুতবা দিলাম– এ সামান্য সময়ে তা অর্জন হবে না। এর জন্য অনেক সাধনা করতে হবে। এরপর বিশ্বাস কোনো হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে আল্লাহর সাহায্য তার সাথি হবে। সুতরাং একটি হলো দেখা পথ, আরেকটি হলো শোনা পথ।

শোনা পথেই সফলতা

শোনা পথে বিজয় নিশ্চিত। আর দর্শনের রাস্তায় বিজয় আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। দেখুন কুরআন কী বলে। হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তাদের হাতের রশি ও ছড়ি নিক্ষেপ করল–

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى

'তাদের জাদুর ফলে এমন অনুভূতি হলো, যেন তাদের রশিগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে।'[২]

তখন মানুষের বিবেক কী বলবে? বিবেক বলবে, এই সাপ! এগুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমার হাতে একটি লাঠি ব্যতীত কিছুই নেই। সাবধান লাঠিটা শক্ত করে ধরো। সেটা যেন হাত থেকে ছুটে না যায়। সাপ তোমার দিকে ধাওয়া করলে লাঠি দিয়ে আঘাত করে সেগুলোকে প্রতিহত করবে। আবার এক্ষেত্রেও সতর্ক থাকবে, যাতে লাঠি ভেঙে না যায়। কারণ, তোমার জীবনে শেষ ভরসা হচ্ছে লাঠি এবং এটিই হচ্ছে তোমার জীবনের শেষ কর্তব্য। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টি এটিই শিক্ষা দিল। মূসা (আ.) আল্লাহর

---

১. সূরা হাশর : আয়াত ২

২. সূরা ত্বহা : আয়াত ৬৬

নবী। আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন, হে আল্লাহ! এক্ষেত্রে আপনার নির্দেশ কী? আল্লাহ নির্দেশ দিলেন–

أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ

'হে মূসা! এ লাঠিটা জমিনের ওপর রাখো।'[১]

এবার বিবেক কী বলছে? সে চিল্লাপাল্লা শুরু করে দিল, হে মূসা! কী করছ? জীবনের শেষ ভরসা লাঠিটাও নিজের হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছ! কিন্তু মূসা (আ.) আল্লাহর নবী। তিনি আল্লাহর নির্দেশের ওপর আমল করলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিকে লাথি মেরে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে লাঠিটা জমিনে রাখলেন। ফলে লাঠি বিরাট অজগর সাপ হয়ে জাদুকরদের সমস্ত সাপ খেয়ে নিল। আল্লাহ মূসা (আ.)কে বিজয় দান করলেন।

মূসা (আ.) সাথিদের নিয়ে সমুদ্রের প্রান্তে উপনীত হলেন। কী করুণ দৃশ্য! সামনে নদী, পেছনে ফেরাউনের বাহিনী!

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

'মূসা (আ.)-এর সাথিরা বলল, এবার আমরা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে যাব।'[২]

এখন আমাদের কী অবস্থা হবে? তখন বিশ্বাসপূর্ণ শব্দ ধ্বনিত হলো। মূসা (আ.) বললেন–

كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

'কখনো নয়, আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন। তিনি অবশ্যই আমাকে দিকনির্দেশনা দেবেন।'[৩]

তখন বিবেক কী বলবে? ভাই! সামনে নদী, পেছনে শত্রুবাহিনী আত্মরক্ষার মতো তোমার নিকট একটা লাঠি ব্যতীত কিছু নেই। সাবধান! লাঠিটা শক্ত করে ধরো। শত্রু এলে কমপক্ষে এই লাঠির মাধ্যমে হলেও আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। এতে হয়তো বেঁচে যাবেন। কিন্তু না, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দিকে ধাবিত হলেন।

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১৯
২. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬১
৩. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬২

আল্লাহ বললেন–

اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ

'আমার প্রিয় মূসা! তোমার হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো।'[১]

তখন বিবেক হইচই আরম্ভ করল, মূসা! এ কী করছ? জীবনের শেষ ভরসা লাঠিটা পানিতে রেখে দেবে? আরে ভাই! আঘাত করলে তো এটা দিয়ে ফেরাউনের মাথায় আঘাত করবে? পানিতে কেন? শত্রুকে মারলে হয়তো কোনো পথ পেয়ে যেতে পার। আল্লাহর পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.) বাহ্যিক অবস্থাকে লাথি মারলেন। লাঠি দিয়ে নদীতে আঘাত করলেন। আল্লাহ তাদের জন্য সমুদ্রে বারোটা রাস্তা খুলে দিলেন। বনী ইসরাঈলের বারোটা সম্প্রদায় বারো রাস্তা দিয়ে নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেল। আল্লাহ তাদের বিজয় দান করলেন।

হযরত মূসা (আ.) নিজের সম্প্রদায়কে নিয়ে তিহ প্রান্তরে অবস্থান করছেন। পানি নেই। অত্যন্ত বিলাসিতাপ্রিয় জাতি। অভিযোগ করতে লাগল, সাধারণ কথায় মূসা (আ.)-এর ওপর বোঝা চাপিয়ে দিল। বলতে লাগল, মূসা! পান করার পানি নাই। বেঁচে থাকার জন্য পানি চাই। এবার বিবেক কী বলবে? বিবেক বলবে, আপনার সঙ্গে লাঠি ব্যতীত কোনো অস্ত্র নেই। দেখুন, লাঠি দিয়ে চেষ্টা করুন। কোনো গর্ত খনন করা যায় কিনা? তবে সাবধান লাঠি যেন ভেঙে না যায়। তাহলে গর্তও করতে পারবে না, পানিও পাবে না। কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বর মূসা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহ বললেন–

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ

'আমার প্রিয় মূসা! লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো।'[২]

এবার বিবেক চিল্লাতে লাগল, হে মূসা! এ কী করছ? একমাত্র অবলম্বন লাঠিটা দিয়ে পাথরে আঘাত করছ! এটা ভেয়ে গেলে তোমার কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ? এটা থাকলে তো কমপক্ষে একটা গর্ত করে পানি বের করতে পারতে আল্লাহর নবী মূসা বাহ্যিক যুক্তিকে লাথি মেরে আল্লাহর নির্দেশ পালন করলেন। লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলেন। পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাদের সফল করলেন।

---

১. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬৩

২. সূরা বাকারা : আয়াত ৬০

সুতরাং প্রতিভাত হয় যে, সফলতা অবহতির রাস্তায় বাহ্যিক যুক্তির পথে নয়। অবহতি বা সংবাদ বলা হয় আল্লাহর পয়গম্বরগণ মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে-ব্যবস্থাপনা নিয়ে এসেছেন, তাকে। এই রাস্তায় জীবন গড়লে বিজয় নিশ্চিত। এর অবাধ্য হলে নাকাম হবে, দুর্দশা গ্রাস করবে। যদি এটা বিশ্বাস হয়, তাহলে আমরা আজ সংকল্প করব, জীবনে কোনোদিন শরীয়ত ও সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করব না। আমরা আমাদের মালিকের অবাধ্য হব কেন? আমাদের জীবনের উত্থান-পতন আমাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে। আর আমি অধম বলেছি, বিশ্বাস এত সহজ বিষয় নয়।

এজন্যই ভাই! বিশ্বাস থাকলে আমাদের চোখ খেয়ানত করতে পারবে না। ভেবে দেখুন, আমাদের কত চোখ খেয়ানত করে। এদিকে 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়' বলে নামায পড়তে যায়। ওদিকে বের হয়ে গিয়েই চোখের খেয়ানত করে। সেখানে আল্লাহর হুকুম মানল, নাকি নফসের হুকুম মানল? তাই বলা হয়েছে, ঈমান এখনো হয়নি। ঈমানকে মজবুত করা চাই।

জনৈক তাবেয়ীর বিশ্বাস

এক তাবেয়ী ছিলেন। বাদশাহ তাকে গ্রেফতার করল। অতঃপর তার কন্যাকে বলল, আমি এ কয়েদিকে আমার করে নিতে চাই, তুমি একটু চেষ্টা করো অর্থাৎ– তাকে প্রলোভন দেওয়ার নির্দেশ দিল। রাজকুমারী অভিনবরূপে সেজেগুজে তাঁর নিকট যাতায়াত করছে। কিন্তু তিনি চোখ তুলে তার প্রতি তাকান না। টানা এক মাস যাওয়ার পরও তিনি তার প্রতি তাকালেন না।

তার পর শাহাজাদী বলল, আপনার কী হলো? আপনি কি পুরুষ নন? আমার মধ্যে কোন জিনিসের ঘাটতি আছে? আমি তো রূপের বাহার, গুণের আধার। তাহলে আপনি একবারও চোখ তুলে আমার প্রতি তাকাচ্ছেন না কেন? আমি নিজে আপনাকে আহ্বান করছি। আপনি পুরুষ হলে আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন?

তিনি বললেন, তুমি যা বলছ সবই আমি মেনে নিয়েছি, স্বীকার করছি। তবে আমি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত না করার কারণ হলো, আমার মালিক তোমার প্রতি তাকাতে নিষেধ করেছেন। তাই আমি তাকাচ্ছি না। আমাদের ধর্ম এটাই শিক্ষা দেয়।

এবার শাহাজাদী বলল, এমন নিষ্কলুষতা যে-ধর্ম শিক্ষা দেয়, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। আমাকে আপনার ধর্ম শিক্ষা দিন। তিনি তাকে পড়িয়ে দিলেন

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

শিকার করতে এসে নিজেই শিকার হয়ে গেল। একেই বলে ঈমান।

বিশ্বাস অর্জনের জন্য মেহনত জরুরি

এমন বিশ্বাস কখন অর্জন হবে? এখানে বসে ওয়াজ শুনবেন, বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো কথা বলবেন, মিথ্যাও বলবেন! হিংসা-বিদ্বেষও করবেন! এগুলো কেন হয়? আমাদের ঈমান পোক্ত হয়নি। সুতরাং জেনে রাখতে হবে, ঈমান কারো হাসিল হয় না। আমলের দ্বারা ঈমানের উন্নতি হয়। সুতরাং ভাই! আমাদের ঈমানের ওপর মেহনত করা দরকার। ঈমান তৈরি করতে হলে জান-মাল সবকিছুর দরকার। সময়ের দরকার। তাহলে আমাদের ঈমান মজবুত হবে। এই যে আমরা ৬০/৭০ বছরের জীবন পেয়ে থাকি। এটা তো আমাদের ঈমান অর্জনের জন্যই দেয়া হয়েছে। পার্থিব জীবনের প্রয়োজনাদি তো এমনিতেই পূরণ হয়ে থাকে। যদি আমাদের ঈমান হাসিল হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন, জীবনের ক্রমধারা কেমন সুবিন্যস্ত হয়।

দুটি অমূল্য কথা

দুটি কথা মস্তিষ্কে বসিয়ে নিলে আপনার সব কিছুর পরিপাটি হয়ে যাবে।

১. চিন্তার যে কারণ, আনন্দেরও সেই একই কারণ। প্রথম কথা হলো, যদি আল্লাহর নির্দেশের ওপর অটল থাকেন, তাহলে যে-বস্তুকে তোমার লাঞ্ছনার কারণ দেখছ, তাকে আল্লাহ তোমার সম্মানের কারণ বানিয়ে দেবেন। তোমার চিন্তার বাহ্যিক কারণকে আল্লাহ তোমার সুখের কারণ বানিয়ে দেবেন। একথা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করে তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে পিতার নিকট এল।

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾

'রাতের বেলায় তারা কেঁদে-কেঁদে তাদের পিতার নিকট আগমন করল।'[১]

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৬

এতে প্রমাণিত হয়, অশ্রু সর্বদা সত্য হয় না– মাঝে-মাঝে মিথ্যাও হয়। কেঁদে-কেঁদে অনেক ধোঁকাও দেওয়া হয়। যাহোক, তারা কেঁদে-কেঁদে তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)কে বলল, আব্বাজান! আমাদের সামানার নিকট আমাদের ভাইকে রেখে গিয়েছিলাম। একটা দুষ্টু বাঘ এসে আমাদের ভাইকে খেয়ে ফেলছে। প্রমাণস্বরূপ তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটা জামার মধ্যে রক্ত মাখিয়ে ইয়াকুব (আ.)-এর সামনে উপস্থিত করল।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ

'তারা তার জামায় ভুয়া রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এল।'[১]

এবার ছেলের রক্তমাখা জামা দেখে ইয়াকুব (আ.)-এর অন্তরে খুব আঘাত লাগল। একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে, ইয়াকুব (আ.) হৃদয়ে ব্যথা পাওয়ার বাহ্যিক কারণ কী? ছেলের রক্তমাখা জামা। আল্লাহ এই ঘটনাকে 'উত্তম ঘটনা' বলেছেন। ফেরাউন-প্রকৃতির লোকদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা। শেষ পর্যন্ত কী হলো? ভাইদের সঙ্গে পরিচয় হলো। তারা ক্ষমা চাইল আর বলল, ভাই! তোমার বিচ্ছেদে আমাদের পিতা কাঁদতে-কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছেন।

وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ

'চিন্তার কারণে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গেছে।'[২]

শুধু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া উদ্দেশ্য হলে ইউসুফ (আ.) একথা বলতে পারতেন যে, আচ্ছা ঠিক আছে; আমি আব্বাজানের জন্য দু'আ করছি। কিন্তু-না; তিনি বললেন,

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا

'আমার এই জামাটা নিয়ে যাও।'[৩]

এর রহস্য কী? রহস্য হলো, এ জামা দেখেই তিনি ছেলের শোকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর পছন্দ হলো যে, এ জামাটাই আমার পয়গম্বরের সুখের কারণ বানাব। জামা নিয়ে তাঁর চোখে স্পর্শ করা হলো। আল্লাহ তাকে ভালো করে দিলেন। তিনি সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৮
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৪
৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯৩

যে-বস্তু দুঃখের কারণ ছিল, সেটাই সুখের কারণ হলো। আল্লাহ সেটার মধ্যেই সফলতা দান করলেন।

আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর মাকে নির্দেশ দিলেন, তোমার ছেলেকে পানিতে ভাসিয়ে দাও।

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ

'আমি মূসার মাকে প্রত্যাদেশ করলাম, তাকে দুধ পান করাতে থাকো।'[১]

আর যদি ফেরাউনের বাহিনী তাকে ধরে নেওয়ার আশঙ্কা কর, তাহলে

فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ

'তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো।'[২]

فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ

'অতঃপর সমুদ্র তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে।'[৩]

আল্লাহ এই শিশুকে রক্ষা করার ব্যবস্থাপনা করছেন। সাথে-সাথে বলছেন, তার শত্রু ও আমার শত্রু তাকে উঠিয়ে নেবে। কিন্তু আল্লাহ মূসা (আ.)-এর মাকে সান্ত্বনা দিলেন–

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي

'তুমি ভয়ও করো না, চিন্তাও করো না।'[৪]

إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

'আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং আমি তাকে আমার পয়গম্বর বানাব।'[৫]

দেখুন, সাধারণ নিয়ম হলো, মহিলা যদি বুঝতে পারে, এ-কাজ করলে আমার সন্তানের ক্ষতি হবে, তাহলে সে এদিকে কস্মিনকালেও পা বাড়াবে না। অথচ এখানে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ছেলেকে পানিতে নিক্ষেপ করো।

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৭
২. সূরা কাসাস : আয়াত ৭
৩. সূরা ত্বহা : আয়াত ৩৯
৪. সূরা কাসাস : আয়াত ৭
৫. সূরা কাসাস : আয়াত ৭

তার বিবেক তাকে শিক্ষা দেয়, আল্লাহ যদি আমার ছেলেকে রক্ষা করতে চান, তাহলে আমার ঘরে ফেরাউনের বাহিনীর আগমন রোধ করেই তো আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারেন। তারা এদিকে আসবেই না। অথবা আরো সহজ ব্যবস্থা হলো, আল্লাহ যদি নির্দেশ দিতেন, তোমার ছেলেকে কোনো নির্জন গর্তে রেখে আসো, তাহলে তো সেদিকে আর কেউ যেত না। কিন্তু আল্লাহ বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত কাজ করলেন। নির্দেশ দিলেন তাকে পানিতে রেখে দাও।

বিবেক কী বলে? বিবেক বলছে, যদি তোমার ছেলেকে পানিতে রাখ, তাহলে নিশ্চয় সে মারা যাবে। কীভাবে? কারণ তাকে কোনো সিন্দুকে রেখে পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। তাতে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ছিদ্র রাখতে হবে। আর ছিদ্র রাখলে অবশ্যই সেটা দিয়ে পানি প্রবেশ করে তা ডুবে যাবে। সুতরাং নিশ্চিত শিশুটি মারা যাবে। আর ছিদ্র বন্ধ করে দিলে তো এমনিতেই অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে। অতএব, বিবেক বলছে, তোমার ছেলে বাঁচবে না।

মূসা (আ.)-এর মা একজন মহিলা। কিন্তু আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তিনি বাহ্যিক অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি বললেন, আমার মালিক বলছেন; তার হুকুম আমাকে পালন করতেই হবে। এবার মালিকের আচরণ দেখুন। ছেলের ব্যাপারে আল্লাহ মাকে পরীক্ষা করছেন।

আপনারা মায়ের আবেগটা একটু যাচাই করবেন। মনে করুন, বিয়ের দশ-পনেরো বছর পর এক মায়ের একটা সন্তান হলো। তাকে যদি বলা হয়, তোমার সন্তানকে পানিতে ফেলে দাও, তাহলে তার চেহারার প্রতি তাকিয়ে বিষয়টা যাচাই করুন। তিনিও মা, পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে; কিন্তু বিশ্বাস অর্জিত হয়ে গেছে। বিশ্বাস অর্জিত হয়ে গেলে এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের থেকেও অগ্রণী হয়ে যাবে। ওই রকম বিশ্বাস আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন।

বিবি হাজেরাকে আল্লাহ কেমন বিশ্বাস দিয়েছিলেন! পুরুষদের থেকে অগ্রণী হয়ে গিয়েছিলেন।

পরিশেষে মূসা (আ.)-এর মা পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে চলে এলেন। আল্লাহই ভালো জানেন ঘরে আসার পর তার হৃদয় কী করছিল। বর্তমানে কোনো মা তার ছেলেকে বিদেশ প্রেরণ করলে দু মিনিট পর ছেলে মাকে ম্যাসেজ করে, ফোন করে। তার পরও মায়ের মনের অস্থিরতা দূর হয় না। আর যে-মা শিশুসন্তানকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন, তার হৃদয় কী করছে? রাতের বেলায় বাড়িতে এলেন। এদিকে কী হলো? ফেরাউন তার

স্ত্রীকে নিয়ে নদীর তীরে বিনোদন করছে। তার সেবার জন্য আটশো গোলাম নিয়োজিত ছিল। তাদের কেউ সিন্দুকটা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত করল। সে বলল, এটা খোলো। আল্লাহ্ বলেন–

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي

'তোমার ওপর আমি আমার পক্ষ থেকে মহব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম।'[১]

সুতরাং মূসা (আ.)-এর চেহারায় আলাদা মহব্বত প্রস্ফুটিত হতো, যা চুম্বুকের মতো আকর্ষণ করত। ফেরাউনের স্ত্রী তাকে দেখে তার স্বামীকে বলল–

لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

'এই ছেলেটি হত্যা করবেন না। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে কিংবা আমরা তাকে আমাদের সন্তান বানিয়ে নেব।'[২]

অত্যাচারী ফেরাউন হাজার-হাজার শিশুকে হত্যা করেছে। সে তার স্ত্রীর কথা শুনে শিশুটিকে হত্যা করা থেকে বিরত রইল। লোকে বলে, মানুষ নাকি স্ত্রীকে মান্য করে না। ভাই! স্ত্রীকে তো বড়-বড় ফেরাউনরাও মেনেছে। এটা ছিল সরকারি অনুষ্ঠান। সে ঘোষণা করে দিল, এই শিশুকে হত্যা করা হবে না। আমি তাকে আমার সন্তান বানিয়ে নিলাম। ফেরাউন ভাবল, যদি আমি তাকে আমার সন্তান বানিয়ে নিই, তাহলে সে আমার নিকট বন্দক রইল। সুতরাং সে আমার আজ্ঞাবহ থাকল। তাহলে কি আর সে আমার মুকুট কেড়ে নেবে?

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে-সময় ফেরাউন এত খুশি হয়েছিল যে, সেই খুশিতে সে আটশো গোলাম আযাদ করে দিয়েছিল। একথার ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে আশ্চর্য একটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহওয়ালাগণ যেখানেই থাকেন, সেখানে মানুষকে মানবপূজা ও আত্মপূজা থেকে মুক্ত করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর উসিলায়ও সেদিন আটশো গোলাম মুক্তি পেয়েছিল। ফেরাউন মূসা (আ.)কে তার রাজমহলে নিয়ে এল। বর্তমান যুগের মতো তো তখনকার সময় দুধের ডিব্বা পাওয়া যেত না। তখন মহিলারা শিশুদের দুধ পান করাত। সে ঘোষণা করে দিল, দুগ্ধ

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ৩৯

২. সূরা কাসাস : আয়াত ৯

দানকারিণী মহিলাদের নিয়ে এসো; ওকে দুধ পান করাতে হবে। এ-সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ

'অন্যান্য মহিলাদের দুধ আমি তার জন্য হারাম করে দিলাম।'[১]

মহিলারা এসে তার মুখে স্তন দিতে থাকল। কিন্তু সে কারো দুধ পান করছে না। ক্ষুধার জ্বালায় অনবরত কাঁদছে। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া শিশুটির অবস্থা দেখেই মনে-মনে কিছু ভেবেনিলেন। যাক অস্থির অবস্থায় রাত কাটল। সকালবেলা ফেরাউন আবার নির্দেশ দিল, কোনো মহিলাকে নিয়ে আসো; সে একে দুধ পান করাবে। এদিকে আল্লাহ বলেন–

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا

'মূসার মা অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় সকাল করলেন।'[২]

চিন্তায় জর্জরিত হয়ে কোনো কিছু খাচ্ছেন না। আল্লাহ জানেন, আমার ছেলের রাত কী অবস্থায় কেটেছে। আল্লাহ বলেন–

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا

'আমি যদি তার অন্তরকে সংযত না করতাম, তাহলে সে কেঁদে ফেলত। ফলে সকল রহস্য ফাঁস হয়ে যেত।'[৩]

আমি তার হৃদয়ে সান্ত্বনা দিলাম। সে তার মেয়েকে বলল, যাও তো মেয়ে! তোমার ভাইয়ের খোঁজ নিয়ে আসো। সে নদীর কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফেরাউনের বাড়িতে গিয়ে দেখল, মহিলারা তাকে দুধ পান করাতে চাচ্ছে; কিন্তু সে কারো দুধ পান করছে না। তখন বলল–

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

'আমি কি আপনাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব, যে তোমাদের জন্য এই শিশুর দায়িত্ব নেবে, তাকে দুধ পান করাবে এবং তাকে খুব সমাদর করবে?'[৪]

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ১২
২. সূরা কাসাস : আয়াত ১০
৩. সূরা কাসাস : আয়াত ১০
৪. সূরা কাসাস : আয়াত ১২

তার কথায় ফেরাউনের মস্তিষ্কে প্রভাব পড়ে গেল। ডেকে নিয়ে বলল, এ মেয়ে! তুমি কীভাবে বললে, ওই পরিবারের লোকেরা আমাদের কল্যাণ করবে? তিনি জবাব দিলেন, আমি দেখছি, আপনারা এই শিশুটিকে নিয়ে অত্যন্ত অশান্তিতে আছেন। সে কারো দুধ পান করছে না। এতে আপনাদের আরামের ঘুম হারাম হয়েছে। আর ওই পরিবার সম্পর্কে আমি জানি, সেই মহিলাটি খুবই ভদ্র। আমার জানামতে আজ পর্যন্ত কোনো শিশু তার স্তনে মুখ লাগিয়ে ফিরে আসতে দেখিনি। সে শিশুদের খুব আদর করে। তাই সকল শিশুই তার দুধ পান করে। আর আমি হলাম আপনার গোত্রের লোক। আমি আপনার এই অশান্তির সময়ে আপনার সাথি না হলে আর কে হতে পারে?

ফেরাউন ভাবল, বিষয়টা ঠিকই দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা; তুমি যাও; মহিলাকে নিয়ে আসো। মূসা (আ.)-এর বোন বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা মাকে জানালেন। ছেলে বেঁচে আছে শুনে মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাহলে আমার ছেলেকে এখনো সে মারেনি! তারা ফেরাউনের বাড়িতে চলে এলেন। শিশুকে কোলে নিয়ে মা দুধ পান করালেন। শিশুটি কোনো রকমের আপত্তি ছাড়া মহিলার দুধপান করা দেখে সবাই অবাক হলো। ফেরাউন, তার স্ত্রী; এমনকি রাজদরবারের সবাই শিশুর কান্নার কারণে গত রাত ঘুমাতে পারেনি। এবার শিশুটির কান্না থামলে ফেরাউন খুব খুশি হলো। মহিলাকে বলল, তুমি রাজমহলে থাকো; শিশুটাকে দুধ পান করাও। একথা বলে সে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মূসা (আ.)-এর মা দু-তিন দিন ফেরাউনের রাজমহলে থেকে বললেন, জনাব! আমার একা-একা এখানে ভালো লাগছে না। পরিবারের সকলকে ছেড়ে একা থাকা কেমন যেন লাগছে। সুতরাং আমাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে। পরের বাড়ির দালানকোটা থেকে নিজের বাড়ির কুঁড়েঘর উত্তম। ফেরাউন বলল, ঠিক আছে, তুমি তোমার বাড়িতে চলে যাও এবং একে সঙ্গে করে নিয়ে নিজবাড়িতে থেকে তাকে দুধ পান করাবে। তোমার ভাতা তুমি সঠিকভাবেই পাবে। মূসা (আ.)-এর মা আপন সন্তানকে নিয়ে নিজবাড়িতে চলে এলেন।

আল্লাহ বলেন–

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

'আমি তাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ স্থির হয় এবং কোনো প্রকার চিন্তা না করে এবং একথা বুঝতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তবে তাদের অধিকাংশই তা অনুধাবন করতে পারে না।'[১]

ভাই! কথা তো সত্য। তা আমরা এখন বুঝতে পারব না। আল্লাহ চাইলে আমাদের বুঝে আসবে। আমরা সেই ঈমান শিক্ষা করার নিয়ত করব। এ তো ছিল একজন মহিলার বিশ্বাস। পরিশেষে আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাইলকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিলেন। ফেরাউনকে তার দলবলসহ নিঃশেষ করে দিলেন। এবার ফেরাউনকে মারার জন্য আল্লাহ যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন। কারুনের মতো জমিনে ধসিয়ে দিতে পারতেন। আকাশ থেকে পাথর, আগুন, বৃষ্টি ইত্যাদি শত পন্থায় তাকে শেষ করতে পারতেন। কিন্তু সেগুলো না করে পানিতে ডুবিয়ে মারলেন কেন? এর রহস্য কী? মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, মূসা (আ.)কে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় এই পানি মূসা (আ.)-এর মায়ের দুঃখের কারণ হয়েছিল। পরিশেষে ছেলের ও জাতির শত্রুকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে পানিকেই মূসা (আ.)-এর মায়ের সুখের কারণ বানালেন। সুতরাং ফেরাউনের নিমজ্জনের সংবাদ শুনে মূসা (আ.)-এর মা বলেছিলেন 'আলহামদুলিল্লাহ'।

অতএব, ভাই! যদি বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর বিধান পালন করে জীবন গড়েন, তাহলে যে-বস্তু তোমার দুখের কারণ হবে, তাকে আল্লাহ তোমার সুখের কারণ বানিয়ে দেবেন।

যেমন কর্ম তেমন ফল

একটি সূক্ষ্ম বিষয় জেনে নাও। আল্লাহর সঙ্গে আমরা যেমন আচরণ করব, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে তেমনই আচরণ করবেন। একেই বলে যেমন কর্ম তেমন ফল। এটা ১০০% সঠিক নীতিমালা। আমরা আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখব; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন। আর যদি আমরা আল্লাহ থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যের ওপর ভরসা করি, তাহলে তিনিও আমাদের সঙ্গে ওই রকমই আচরণ করবেন। বান্দা যেমন আমল করে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই রকমই প্রতিদান দেওয়া হয়। এ-বিষয়ে পবিত্র

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ১৩

কুরআনের প্রমাণ দেখুন। বনী ইসলাঈলের তাওবা কবুল করার জন্য আল্লাহ নিয়ম বানিয়ে দিলেন, তোমরা গ্রাম ছেড়ে মাঠে যাও; আমি বৃষ্টির মাধ্যমে তোমাদের আচ্ছন্ন করে দেব।

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

'নিজের ওপর ছুরি মেরে নিজেকে আহত করো; তোমাদের রক্ত প্রবাহিত করো।'[১]

কুরআনে বলা হয়েছে, এরপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেছেন। আর উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তাওবা কী? তোমরা নিজের অপরাধের ওপর অনুশোচনা প্রকাশ করো। আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হও। মুখেও বলতে হবে না। নিজের স্থান থেকে উঠতেও হবে না। স্বস্থানে থেকে মনে-মনে অনুতপ্ত হয়ে যাও। লজ্জিত হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করে নেবেন। এই পার্থক্য কীভাবে? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। হযরত মূসা (আ.) তাদের সামনে আল্লাহর বিধান উপস্থাপন করার পর তারা বলেছিল।

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

'আল্লাহকে প্রকাশ্য না দেখে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব না।'[২]

সুতরাং তারা ঈমান গ্রহণের জন্য শর্ত লাগিয়েছিল, আগে স্বচক্ষে দেখব। তারপর ঈমান গ্রহণ করব। এতএব, আল্লাহও তাদের তওবা কবুল করার জন্য শর্তারোপ করলেন, তোমরা নিজেদের রক্ত বের করো; তাহলে আমি বুঝব, সত্যিই তোমরা তাওবা করতে চাচ্ছ। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত উপস্থাপন করলে তারা কোনো ধরনের শর্ত ব্যতীত দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়েছেন। সুতরাং মহামহিম পালনকর্তাও আমাদের সংবাদ কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া গ্রহণ করে নিয়েছেন। আমিও পার্থিব জীবনে তোমাদের থেকে কোনো প্রকার প্রমাণ চাইব না। শুধু অন্তর দ্বারা অনুতপ্ত হয়ে যাও; আমি তোমাদের তাওবা কবুল করে নেব। 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

একটি ছোট উদাহরণ শোনো। যারা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবে, তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৫৪
২. সূরা বাকারা : আয়াত ৫৫

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

'তাদের চোখের স্থিরতার জন্য আমি জান্নাতে কী তৈরি করে রেখেছি, তা কেউই জানে না।'[১]

এখানে তালেবে ইল্‌মদের মনে একটা প্রশ্ন জাগবে যে, আল্লাহ এটা স্পষ্ট করে বলে দিলেন না কেন? তাহলে তো পুরস্কারের কথা শুনে মানুষের হৃদয় আনন্দিত হতো যে, আমি এই পুরস্কার পাব। তাছাড়া চোখ স্থির হওয়ার কথা বলেছেন। অথচ আনন্দের আশ্বাস পেলে মানুষের হৃদয় খুশি হয়। তাহলে চোখের কথা বললেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, আল্লাহ এখানে তাহাজ্জুদগুযারদের পুরস্কারের কথা বলেছেন। সুতরাং যারা তাহাজ্জুদ পড়ে, রাতে এদের ঘুম কম হওয়ার কারণে সকালে তাদের চোখ জ্বালাপোড়া করে। তাই আল্লাহ বলেছেন, এর প্রতিদান পেয়ে তাদের চোখ স্থির হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওপর অপবাদ দেওয়া হলো। এর নিষ্কলুষতা প্রমাণিত করার জন্য ছোট একটা দুধের শিশু দুটি বাক্য বলেছিল, যদি তাঁর জামা সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে তিনি মিথ্যাবাদী আর যদি তাঁর জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে ইউসুফ সত্যবাদী আর জুলায়খা মিথ্যাবাদী। পরে দেখা গেল, তাঁর জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া। সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইউসুফ একাজ করতে চায়নি; মহিলা নিজেই চেয়েছিল। ইউসুফ তা অস্বীকার করে চলে গেলে মহিলা পেছন দিক থেকে তাঁর জামায় টান দিয়েছে; তাই তার জামা পেছন দিকে ছিঁড়ে গেছে।

হযরত মারয়াম (আ.)কে অপবাদ দেওয়া হলো। কুরআন বলে–

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

'মারয়ামের ঘটনা স্মরণ করুন যখন সে তার পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের স্থানে গিয়েছিল।'[২]

কেন গিয়েছিল? গোসল করার জন্য। পূর্ব দিকে বলা হয়েছে; কারণ, তাদের কেবলা পূর্বে দিকে ছিল।

---

১. সূরা সাজদা : আয়াত ১৭

২. সূরা মারয়াম : আয়াত ১৬

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا

'তিনি তাদের থেকে আবৃত্ত হলেন।'[১]

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

'আমি একজন পরিপূর্ণ পুরুষের আকৃতিতে জিবরাঈলকে তার নিকট প্রেরণ করলাম।'[২]

হযরত মারয়াম (আ.) একাকি একজন পুরুষকে সামনে উপস্থিত দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন–

اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

'আমি দয়াময় প্রভুর আশ্রয় কামনা করছি। যদি তুমি আল্লাহকে ভয়কারী হও।'[৩]

জিবরাঈল (আ.) দেখলেন, মারয়াম তো ভয় পেয়ে গেছে। তিনি বললেন–

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

'আমি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত। তোমাকে একজন পবিত্র ছেলে দান করার জন্য এসেছি।'[৪]

একথা শুনে মারয়াম আরো আতঙ্কিত হলেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম হলো, সন্তান হতে হলে মহিলার বিয়ে হবে। স্বামীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করবে। তারপর সন্তান হবে। অথবা মহিলা কোনো পুরুষের সঙ্গে বিয়ের পূর্বে অপকর্ম করলে তার অবৈধ সন্তান হবে। এখানে তো মারয়াম (আ.) সন্তান হওয়ার বাহ্যিক উভয় কারণ থেকে মুক্ত। তাহলে...। সুতরাং তিনি বললেন, কীভাবে আমার সন্তান হবে? আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি! আর আমি ব্যভিচারিণীও নই। জিবরাঈল (আ.) দেখলেন, মারয়াম ভয় পেয়ে গেছেন। তিনি বললেন–

قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ১৭
২. সূরা মারয়াম : আয়াত ১৭
৩. সূরা মারয়াম : আয়াত ১৮
৪. সূরা মারয়াম : আয়াত ১৯

'তোমার পালনকর্তা একাজ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।'[১]

فَحَمَلَتْ

অবশেষে মারয়াম অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলেন। মারয়াম অত্যন্ত পেরেশান। এবার ভেবে দেখুন, যে-মেয়ে শৈশব থেকে পবিত্র, যার দায়িত্ব নিতে মানুষ পরস্পরে ঝগড়া করেছিল, যে-মহিলা মসজিদের খেদমত করছে, এতেকাফ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে, সেই মেয়ে যৌবনে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলে তার অস্থিরতার ধরন কেমন হতে পারে! সুতরাং মারয়াম (আ.) একজন পরাজিত ভদ্রলোকের মতো চিন্তায় কাতু হয়ে বসে আছেন–

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا

'আফসোস! যদি আমি এমন অবস্থা হওয়ার আগে মরে যেতাম! আর আমি চিরতরে ভুলে যাওয়া কোনো বস্তু হতাম! আমার কথা যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেত!'[২]

তখন আল্লাহ বললেন–

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝

'আমি ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে অবগত করলাম, তুমি কোনো চিন্তা করো না। তোমার প্রভু তোমার নিচ দিক থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেবেন।'[৩]

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝

'খেজুরের ডাল তোমার দিকে টান দাও; সেটা থেকে তোমার জন্য তাজা খেজুর বেরিয়ে আসবে।'[৪]

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا

'খেজুর খাও, পানি পান করো। সন্তান হলে তার প্রতি তাকাও; তোমার চোখ স্থির হয়ে যাবে।'[৫]

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ২১
২. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৩
৩. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৪
৪. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৫
৫. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৬

আর তাকে নিয়ে তোমার সম্প্রদায়ের নিকট যাওয়ার পর তারা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে–

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا

'আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি।'[১]

সুতরাং আমি কোনো কথা বলব না। সেই যুগে রোযার একটি সুরত ছিল কথা না বলা।

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ

'সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে মারয়াম (আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট গমন করল।'[২]

তারা বলল–

يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

'হে মারয়াম! তুমি তো অত্যন্ত গর্হিত বস্তু নিয়ে আগমন করলে। এ কী বিপদ নিয়ে এলে?'[৩]

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

'হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো চরিত্রহীন লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না।'[৪]

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় জানা যায় যে, যুবকরা ভুল করে আর তাদের ভাই ও মাতাপিতা অপমানের গ্লানি সহ্য করে। তারা মারয়ামকে কিছু না বলে বলছে, হারুনের বোন! তোমার মাতাপিতা খারাপ লোক ছিলেন না। সুতরাং হে যুবসমাজ! সতর্ক জীবন যাপন করো। কখনো নিজের সম্মানী লোকদের অসম্মানের পথে চালিয়ে দিয়ো না। মাতাপিতা জীবন বিপন্ন করে সম্মান অর্জন করেন। আর সন্তানরা সামান্য অপরাধ করে তাদের সম্মান ধূলিসাৎ করে দেয়। পরিশেষে তাদের জবাবে মারয়াম (আ.)

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৬
২. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৭
৩. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৭
৪. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৭

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ

'শিশুসন্তানের প্রতি ইশারা করে দিলেন।'[১]

আমাকে নয়– একে জিজ্ঞেস করো। তখন তারা বলল, এ কী বলছ?

قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

'এই দোলনার শিশুর সঙ্গে আমরা কীভাবে কথা বলব?'[২]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওপরও এই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে একটি দুধের শিশু দুটি বাক্য বলেছিল। দেখুন, তার জামা কোন দিকে ছেঁড়া। সামনের দিকে, নাকি পেছনের দিকে। আর এখানে হযরত ঈসা (আ.) কথা বলছেন। দেখুন ঈসা (আ.)-এর কথার ধরন কী ছিল। তিনি বললেন–

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

'শিশু ঈসা বলল, আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি, তত দিন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যু বরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।'[৩]

কত দীর্ঘ সাক্ষ্য। মুফাসসিরীনে কেরাম এখানে একটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন যে, সেখানেও সাক্ষ্য ছিল; কিন্তু মাত্র দুটি বাক্য দ্বারা। আর এখানে এত দীর্ঘ সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, সেখানে একজন মহিলা অপবাদ দিয়েছিল। সুতরাং দুটি বাক্যের মাধ্যমেই তার প্রমাণ দেওয়া হয়ে গেছে। আর এখানে অপবাদ দিয়েছে গোটা জাতি। সুতরাং আল্লাহ এখানে শিশুর মাধ্যমে জাতিকে ওয়াজ করালেন।

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৯
২. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৯
৩. সূরা মারয়াম : আয়াত ৩০-৩৩

বোঝা গেল, 'যেমন কর্ম তোমন ফল'। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

দেখুন, ইয়ামানের গর্ভনর আবরাহা দেখল, সারা দুনিয়ার মানুষ কা'বা শরীফকে সম্মান করে, তাই সে নিজের দেশে একটি নকল কা'বা তৈরি করে। এই কা'বা ধ্বংস করার পরিকল্পনা করল। সুতরাং হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কায় এল। আল্লাহ তাকে সাধারণ পাখির মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করে দিলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ চাইলে যেকোনোভাবে শাস্তি দিয়ে তাদের ধ্বংস করতে পারতেন। তাহলে পাখির মাধ্যমে ধ্বংস করলেন কেন? এ-প্রশ্নের জবাবে সাধারণত এ জবাব দেওয়া হয় যে, আবরাহা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী নিয়ে এসেছিল। অতএব, আল্লাহ সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী দ্বারা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। কিন্তু মুফাসসিরীনে কেরাম এখানে আরেকটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেন। তা হলো, আবরাহা চেয়েছিল আল্লাহর ঘর ধ্বংস করে নিজের প্রতিষ্ঠিত ঘরের সম্মান সমুন্নত করার জন্য। অথচ নিয়ম হলো, আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঘরেরই সম্মান করা হবে। এখানে আবরাহা সেই নিয়ম রহিত করে নিজের ঘরের যশ ছড়াতে চেয়েছিল। তাই আল্লাহও নিয়মের বহির্ভূত কাজ করেছেন। সেটা কী? সেটা হলো, সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষ হয় শিকারী আর পাখি হয় শিকার। এখানে আবরাহা নিয়মের বহির্ভূত কাজ করার কারণে আল্লাহও সাধারণ নিয়মের বিপরীত করে পাখিকে বানিয়েছেন শিকারী আর মানুষকে বানিয়েছে তার শিকার। 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

সর্বশেষ কথা হলো ভাই! আমাদের অন্তরে আল্লাহর সত্তার পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানের জীবন দান করবেন। আর এই বিশ্বাস অর্জনের জন্য বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চলছে।

সারা বিশ্বে এর মেহনত চলছে। এতে জান-মাল বির্সজন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হয়। ফলে দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে দূর হয়, আল্লাহর মহব্বত অন্তরে আশ্রয় পায়। তাই আমরা সবাই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার নিয়ত করি, আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অধিক পরিমাণে যিকির করার উপকারিতা

'যে-বস্তুর কথা অধিকহারে স্মরণ হয়, সেই বস্তু অর্জনের জন্য সেই পরিমাণ আবেগ সৃষ্টি হয়। একদিন কেউ বলল, আনারস কী জিনিস? পরের দিন তার আনারসের কথা স্মরণ হবে। পরের দিন আনারস খাওয়ার ইচ্ছা হবে। সুতরাং আলোচনার ধারা বস্তুর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কাজেই যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে, সে দুটি জিনিস অর্জন করতে পারবে। হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূর হবে আর আল্লাহর ভালোবাসা নসিব হবে।'

অধিক পরিমাণে যিকির করার উপকারিতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

অধিক পরিমাণে যিকিরের নির্দেশের রহস্য

আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। এখানে আল্লাহ বান্দাদেরকে বিশ্বপালনকর্তার স্মরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটি পরিসংখ্যানও দিয়েছেন যে, অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। এতে আমাদের জন্য অনেক উপকারিতা রয়েছে। কারণ, আপনারা দেখে থাকবেন, কোনো ডাক্তার রোগীকে ওষুধ দিলে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়, দৈনিক একবার দুবার ইত্যাদি। মনে করুন, এক ডাক্তার বলল, এ ওষুধটা তুমি দৈনিক তিনবার খাবে। এখন সে তিনবার না খেয়ে তৃতীয় দিন খেল, তাহলে এ ওষুধে তার কোনো কাজ হবে না। কারণ, সে নিয়ম পালন করেনি। অথচ ওষুধ তো খেয়েছে ঠিকই। নিয়ম না মানার কারণে তার ব্যাধি ভালো হবে না।

এমনিভাবে শিষ্যরা তো যিকির করে, কিন্তু নিয়মমতো আদায় করে না, যিকিরে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, জি হুজুর! পাঁচ-দশ মিনিট আদায় করি। ভাই! যিকিরের হিসাব মিনিটে হবে না। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা হিসাব করতে হবে। পৃথিবীর বাদশাহদের সাধারণ নিয়ম হলো, তাদের সাক্ষাতের জন্য কেউ আগমন করলে ঘন্টার-পর-ঘন্টা তার জন্য অপেক্ষা

করতে হয়। কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেও আমার মনে হয়, এর চেয়ে কম অপেক্ষায় চলে না। বরং অনেক সময় দেখা যায়, দু-চার দিন যেতে হয়। অতএব যিনি রাজাধিরাজ ও মহামহিম পালনকর্তা; তাঁর সাক্ষাতের জন্য মিনিটের হিসাব করেন কীভাবে? সুতরাং জেনে রাখবেন, যারা আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত রাখতে চায়, যারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, তারা আল্লাহর যিকিরে মিনিট নয়, ঘন্টা নয়, দিন নয়, সারা জীবন সাধনা করতে হবে। অতএব সামান্য যিকিরে পূর্ণ উপকারিতা পাওয়ার আশা করা যায় না। আল্লাহ বলেন–

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ

'তারা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে। তারা দোদুল্যমান রয়েছে। না এদের সঙ্গে, না ওদের সঙ্গে।'[১]

আল্লাহ পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তোমরা অধিক পরিমাণে যিকির করো।

অপাত্রে অভিযোগ

বর্তমানে মুরিদরা নিয়ম মেনে যিকির আদায় করে না। অথচ অভিযোগ করে, হুজুর! আমার তো কোনো উপকার হচ্ছে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, চোখ ঠিক নেই, গায়রে মাহরাম থেকে হেফাযত করতে পারছে না। অন্তরও কন্ট্রোল করতে পারছে না। ভাই! পথনির্দেশক গুরু তো আপনাকে সঠিক পথই দেখিয়েছেন; কিন্তু রোগী তার ওষুধের কোর্স পুরা করছে না। তাহলে এখানে ডাক্তারের ত্রুটি কোথায়? আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলে, হুজুর! যিকিরে তো সময় দিতে পারি না।

এবার বলুন, সে কেমন মজনু, যে বলে, লায়লাকে স্মরণ করার সময় পায় না। আজ আমাদের এই অবস্থা। মানুষ মনে করে, সে তো সুফী সাধক হয়ে গেছে। সে অমুক পীর সাহেবের নিকট মুরীদ হয়েছে। অথচ সে পীর সাহেবের নির্দেশমতো যিকির আদায় করার সময় পাচ্ছে না। আমাদের মাশায়েখগণ বলেন–

مَنْ لَّا وِرْدَ لَهٗ لَا وَارِدَ لَهٗ

'যার অজিফা নেই, তার কাছে কোনো কিছু অবতরণ করে না।'

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৩

অর্থাৎ– যে ঠিকমতে অযীফা আদায় করতে পারবে না, সে কোনো ফায়দা পাবে না। তোমার ওপর অবতরণ হতে হলে আগে তুমি অবতরণ করা জরুরি। সুতরাং যে-সমস্ত আমলের নির্দেশনা দেওয়া হয়, সেগুলো তো তোমার ওপর অবতরণের ভিত্তি। অতএব সেগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করো। তারপর সেগুলোর বরকত দর্শন করো। দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষ কোনো প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করলে সেটা সবাইকে বলে দেয়। সুতরাং আমাদের মাশায়েখগণও যে-প্রেসক্রিপশন দ্বারা ফায়দা পেয়েছেন, তা-ই আমাদের নির্দেশনা দেন। আর সেই প্রেসক্রিপশন হলো অধিক পরিমাণে যিকির করো।

চিন্তার পঙ্কিলতা কীভাবে দূর করা যায়

একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি স্মরণ রাখবেন যে, চিন্তার নোংরামি সর্বদাই যিকিরের মাধ্যমে দূরীভূত হয়। সুতরাং যে-বান্দা চায়, আমার নাফরমানি, শয়তানি ও বিশৃঙ্খলাসমূহ যেগুলো আমার চিন্তার মস্তিষ্কে বাধা প্রদান করে, সেগুলোর অপসারণ হোক, সে যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহ তালার যিকির করে। এছাড়া তার অন্য কোনো ওষুধ নেই। ইল্‌ম শিক্ষার দ্বারা, অধিক পরিমাণে ইবাদতের দ্বারা শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাতের মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। যে-ব্যক্তির জ্বর হয়েছে, সে ভিটামিন খেলে তার জ্বর কমবে না। ব্যথার বড়ি খেলেও জ্বর সারবে না। তাকে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে। কারণ, এটাই জ্বরের ওষুধ। সুতরাং যিকির হচ্ছে অন্তরের ব্যাধির ওষুধ, তার জন্য যিকিরের আমলই করতে হবে। কেননা, নবীজি ইরশাদ করেছেন–

ذِكْرُ اللهِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ

'আল্লাহর যিকির অন্তরের ব্যাধির ওষুধ। সুতরাং এর দ্বারাই আরোগ্য পাওয়া যায়।'

কল্যাণ সংগ্রহ করার জন্য অন্তরের যোগ্যতা অর্জনের নিয়ম

একটি সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করছি। দেখুন, কুরআন মাজীদেও শেফা আছে।

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ

وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

এগুলো হচ্ছে শেফা বা আরোগ্য। কীভাবে? একটু ব্যাখ্যাসহ বোঝার চেষ্টা করুন। একজন হাফেয সাহেব যিনি শিশুদের নাযেরা কুরআন শিক্ষা দেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তিনি একসঙ্গে চার-পাঁচজনের সবক শোনেন। আবার প্রত্যেককে তাদের ভুলও ধরে দেন। কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ হলো–

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা নীরবে শোনো, যাতে তোমাদের ওপর রহমত বর্ষিত হয়।'[১]

সুতরাং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হওয়ার কথা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেহেতু একজনের তেলাওয়াতের কারণেই রহমত বর্ষিত হয়, তাহলে যে-ওস্তাদ নিজেও কুরআন তেলাওয়াত করছেন, তার নিকট আরো পঞ্চাশজন ছাত্র কুরআন তেলাওয়াত করছে, অতএব প্রত্যেকের তেলাওয়াতের কারণে রহমত নাযিল হচ্ছে। একেবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এখন ওই ওস্তাদ যদি তার গুরুকে বলেন, হুজুর! আমার দৃষ্টি তো আমার আয়ত্তে নয়, তাহলে কী বলা যাবে? অবশ্যই কোনো চিন্তার বিষয়, কোনো বিপদ তাকে গ্রাস করেছে। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে রহমত নাযিল হয়, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। তদুপরি এক-দুজন নয়, পঞ্চাশজন লোক একসঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তা-ও আবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এর পরও যদি কুরআনি নূরে তার হৃদয় নূরান্বিত না হলো, তাহলে অন্তর থেকে মরিচা দূরীভূত হচ্ছে না কেন? অন্তরের এ কুপ্রবৃত্তি ধ্বংস হচ্ছে না কেন? অবশেষে এই প্রশ্ন জাগবে যে, অবশ্যই এই ছোট-ছোট শিশুদের তেলাওয়াতের সময় তাদের প্রতি তার কুদৃষ্টি পড়ে।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৪

শেষ পর্যন্ত এই বিপদে লিপ্ত হওয়ার রহস্য কী? এত পরিমাণ তেলাওয়াত শুনেও যদি তার হৃদয় পরিষ্কার না হলো, তাহলে কোথায় হবে? তার শেফা হচ্ছে না কেন? আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, শিশু জন্ম নেয়ার পর প্রাথমিক অবস্থায় তার হজমশক্তি দুর্বল হয়। সুতরাং তাকে শুধু মায়ের হালকা দুধ পান করানো হয়। তারপর বকরি ও গাভীর দুধ পান করানো হয়। এবার যদি শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই তাকে মহিষের দুধ পান করানো হয়, তাহলে সে সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং আগে মায়ের দুধ পান করায়ে তার হজমশক্তির যোগ্যতা অর্জন করানো হয়। তারপর বকরির দুধ, গাভীর দুধ ইত্যাদি পান করে তার হজমশক্তির যোগ্যতা বর্ধিত হলে এবার তাকে মহিষের দুধ নয় উটের গোশত খাওয়ালেও কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, তার হজমশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, মানুষ প্রথমে বাইয়াত হয়ে গেলেই তার মধ্যে যোগ্যতা থাকে না। কুরআন মাজীদের নূরের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অন্তর সেই নূর সংগ্রহ করতে পারছে না। তৈলাক্ত পাত্রে বৃষ্টি হলেও তার মধ্যে পানির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ওই বেচারা শুরু থেকেই তৈলাক্ত পাত্র। কুরআনের নূর তো আছে বটে; কিন্তু তার প্রভাব তার মধ্যে পড়ছে না। কারণ, কুরআনের মধ্যে ভারিক্কি রয়েছে। আল্লাহ বলেন–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ ﴿٢١﴾

'যদি আমি কুরআন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম, তাহলে আপনি অবশ্যই দেখতেন, সেটা আল্লাহর ভয়ে ফেটে ধসে গেছে।'[১]

এটি এমন কালাম যে, আল্লাহ বলেন–

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾

'আমি আপনার ওপর ভারী বাণী ঢেলে দেব।'[২]

এই বাণীর মধ্যে ভারিত্ব রয়েছে। এটি বান্দার আয়ত্তের বিষয় নয় যে, তাকে তার হৃদয়ে সংগ্রহ করে নেবে। এর জন্য অন্তরের যোগ্যতার প্রয়োজন। কাজেই মাশায়েখে এযাম, প্রত্যেক আগন্তুককে প্রাথমিক অবস্থায় যিকিরের প্রশিক্ষণ দেন। কেননা, যিকির হচ্ছে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও হালকা

---

১. সূরা হাশর : আয়াত ২১

২. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৫

বিষয়। যত বড় গোনাহগার বান্দা-ই হোক, আল্লাহর যিকির করলে তার উপকার সে পাবেই। হযরত মাদানি (রহ.) বলেন, আল্লাহর নামের মধ্যে এমন বরকত যে, যদি কোনো রিয়াকার লোকও এ নামের যিকির করে, তবু সে তার কল্যাণ পাবে। প্রাথমিক অবস্থায় এ নামের যিকির করলে অন্তরের যোগ্যতা অর্জন হয়। পরিশেষে এমন হয় যে, যিকিরকারীর অন্তর কুরআনের নূর আয়ত্ত করতেও সমর্থ হয়ে যায়। অতঃপর কুরআনের তেলাওয়াত করলে তার অন্তর নূরানি হয়ে যায়, তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এরপর এমন একটি সময় আসে যে, তখন সে নামাযে দাঁড়ালে নামাযের নূর সংগ্রহ করতে পারে।

নকশবন্দি তরিকা অবশ্যই পৌঁছানেওয়ালা

আমাদের ওলামায়ে কেরাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এই প্রশিক্ষণ বা কোর্সকেই সুলুক বা তরিকা বলে। আমাদের এই নকশবন্দি তরিকার সবকই হচ্ছে যিকির। আর আমাদের ওলামায়ে কেরাম প্রত্যেক আগন্তুককে তার ওপরই নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্তমান যুগে যেমন উন্নত রাস্তাসম্পন্ন দেশসমূহের নিয়ম হলো, আপনি কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ঢুকে গেছেন। এবার আপনি গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আর এ রাস্তা থেকে বের হতে পারবেন না। উভয় দিকে দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে গিয়ে আপনার গন্তব্যের সমাপ্তি হবে, সেখানে যাওয়ার পরই এই রাস্তা থেকে বের হতে পারবেন। আমাদের এই তরিকাও এমনই। হযরত খাজা মাসূম (রহ.) বলেন, আমাদের মাশায়েখগণ আল্লাহর কাছ থেকে এমন রাস্তা চেয়ে এনেছেন, যাতে প্রবেশ করলে গন্তব্যে পৌঁছা আবশ্যক। এর অর্থ হলো, যে বান্দা এই রাস্তায় গমন করবে আল্লাহর দয়া তার সাথি হবে।

ফলে সে অবশ্যই তার গন্তব্যে পৌঁছবে। তার রচিত মাকতুবাতের মধ্যে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের এই তরিকায় গমনকারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে গমনকারীদের নিজের অলসতা ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিবন্ধক নেই। কোনো পথিক যদি তার গাড়ি বন্ধ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। আর যদি তার গাড়ি রাস্তায় ধীরে-ধীরেও চালায়, তবু সে একদিন তার গন্তব্যে পৌঁছবেই। চাই দেরিতে যাক আর তাড়াতাড়ি যাক। আর আমাদের তরিকাটা হুবহু এরকমই।

সুতরাং যে খোদাপ্রেমিক এ রাস্তায় চলবে, সে দেরিতে আর দ্রুত হোক অবশ্যই তার গন্তব্যে পৌঁছবেই। তবে যদি অলসতা করে, আমালিয়াত পালন

না করে, তাহলে সে এরকম যেমন রাস্তায় কেউ গাড়ি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার কোনো চিকিৎসা নেই। অতএব এ-পথের পথিকদের জন্য আবশ্যক হলো আমালিয়াত ঠিকমতো আদায় করা। নিজের খাওয়াদাওয়া থেকে একে গুরুত্ব দেওয়া, নাস্তা, খাবার ও ঘুম ছুটে যেতে পারে; তবু আমাদের আমল ছুটতে পারবে না। এ-পথের পথিকদের যখন এই অবস্থা হবে, তখন অন্যান্য অযীফা তাকে ফায়দা দেবে। প্রাথমিক অবস্থায় নিজে চেষ্টা করতে হবে।

প্রাথমিক অবস্থায় আমল ও অযীফার অবস্থা

হযরত আকদাস আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ের মুরীদগণের জন্য সবক ও অযীফা ওষুধের মতো। আর শেষ পর্যায়ের মুরীদগণের জন্য অযীফা হলো খাবারের মতো। অনেক সময় তিক্ত ওষুধ সেবন করা কঠিন হয়ে যায়। শিশুদেরকে তিতা ওষুধ সেবন করতে দিলে তারা মুখ বিকৃত করে নেয়। কিন্তু তাদেরকে আইসক্রীম দিলে এক প্লেট খেয়ে আরেক প্লেট খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। এমনিভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের শাগরেদদেরকে অযীফায় লাগানো কঠিন হয়ে যায়। পীড়াপীড়ি করে বসালেও ঠিকমতো আদায় করে না। এখানেও শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দেয়। অনেক শাগরেদ এসে বলে, হুজুর! আমি তো যিকির করতে বসি; কিন্তু ঘুম এসে যায়। এতে কী ফায়দা হবে? হে আল্লাহর বান্দা! ঘুম এলে তো ভালো যে, বসার ফায়দা পাচ্ছ। কেননা, সাধারণতই যিকিরকারীদের ঘুম আসে। এর মধ্যে তাদের বিশেষ অবস্থা শুরু হয়ে যায়। তারা পার্থক্য করতে পারে না, সেটা ঘুম ছিল, নাকি তন্দ্রা ছিল। শুনুন আল্লাহ কী বলেন–

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً

'যখন তোমাদেরকে প্রশান্ত অবস্থায় তন্দ্রা আচ্ছন্ন করছে।'[১]

এটা তন্দ্রার একটা প্রকার। সাধারণত মানুষ এর পার্থক্য করতে পারে না। কিন্তু এই তন্দ্রাবস্থায় মানুষ সূক্ষ্ম বিষয় অর্জন করে নেয়। ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার আস্তে-আস্তে উন্নতি হবেই। যেমন– মনে করুন, কোনো অসহায় লোক কোনো দানবীর বাদশাহর দরবারে ফজরের পরেই গিয়ে উপস্থিত হয়ে গেল। বাদশাহ কাচারীতে আসতে দশটা-এগারেটা বেজে গেল। এর মধ্যে ওই লোক অপেক্ষায় বসে-বসে দুঘন্টা ঘুমাল। এবার

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ১১

বাদশাহ এসে যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কখন উপস্থিত হয়েছিলে। তখন কী বলবে? ঘুমের দুঘন্টা কী বাদ দেবে? না, সে যখন এসেছে তখন থেকেই তার হিসাব হবে। ঠিক তেমনিভাবে যিকিরকারী আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে জায়নামাযে বসে গেল। এবার জায়নামাযে বসে যদি তার ঘুমও এসে যায়, তবু সে আল্লাহর দরবারে যিকিরকারী হিসেবেই গণ্য হবে। তার বাতেনি অবস্থায় উন্নতি হবে।

আল্লাহর ভালোবাসা পরিমাপের বাটখারা

ভাই! আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপন করতে ইচ্ছুকদের জন্য মোরাকাবায় বসার অভ্যাস করা চাই। যদি কেউ চায়, আল্লাহর প্রতি আমার ভালোবাসা কতটুকু সেটা জানতে চাই, তাহলে সে যেন একটু যাচাই করে দেখে যে, জায়নামাযে বসার ক্ষেত্রে তার আগ্রহ কতটুকু। তবেই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার যাচাই হয়ে যাবে। নামায আদায় করার পর যদি জায়নামাযে বসতে মনে না চায়, বরং ফরজ আর সুন্নতে মুয়াক্কাদা কোনোমতে আদায় করেই দৌড় দেয়, তাহলে বুঝতে হবে, এখনো অনেক দূরে রয়েছে। কেননা, হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ

'মসজিদের মধ্যে মুমিন বান্দা পানির মধ্যে মাছের মতো।'

মোরাকাবার জন্য সময় নির্ধারণ করা জরুরি

অতএব ভাই! শাগরেদদের জন্য মোবাকাবায় সময় দেওয়া দরকার। কিছু-কিছু মুরীদ তো আছে, যারা বলে, আমরা সময় পেলে যিকিরে বসব। না-না ভাই। এটা যিকির নয়। প্রাথমিক অবস্থায় সময় নির্ধারণ করবেন। নফসকে সুযোগ দিলে সে বলবে, রাতে করব। রাত এলে বলবে, সকালে করব। আর এই সকাল ও বিকালের মধ্যে জীবন শেষ হয়ে যাবে।

বর্তমান যুগে যেভাবে মানুষ তার খাবারের সময় নির্ধারণ করে নেয়, তেমনিভাবে খোদাপ্রেমিকদের বাতেনি খাবারের জন্য সময় নির্ধারণ করা দরকার। যেমন বলা হয়েছে–

تَحْتَاجُ الْقُلُوْبُ اِلٰى اَقْوَاتِهَا مِنَ الطَّعَامِ

'শক্তি অর্জনের জন্য অন্তরও খাবারের মুখাপেক্ষী হয়।'

শরীরের জন্য যেমন খাবারের প্রয়োজন, তেমনি অন্তরের জন্যও খাবারের প্রয়োজন। এর জন্য আমরা সময় নির্ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক বান্দা তার সুযোগমতো যিকিরে বসবে। কেউ সকালে, কেউ বিকালে, কেউ আছরের পরে, কেউ ঈশার পরে– যে যখন সুযোগ করতে পারে, তখন বসবে। এই সময়ের মধ্যে অনেক ব্যস্ততা আসবে। কেউ সাক্ষাৎ করার জন্য আসবে। তবু তোমার নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে হবে। পরিবারের লোকেরা বুঝতে হবে, এ-সময় থেকে ওই সময় পর্যন্ত তিনি মোরাকাবায় থাকেন। সুতরাং এ-সময় তাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। আমরাও তো কিছু সময় নির্ধারণ করি যে, হে আল্লাহ! সমস্ত দুনিয়াকে পেছনে রেখে তোমার স্মরণের জন্য বসে গেলাম। নবীজি ইরশাদ করেন–

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ

'আল্লাহর সঙ্গে আমার একটা সময় আছে।'

আল্লামা মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ

এর আশ্চর্য ব্যাখ্যা লিখেছেন। সুতরাং আপনাদের প্রতিও আরজ, সময়ের অনুসরণের জন্য নিজের সময়কে অবসর দেওয়া জরুরি। সুতরাং ওই সময় শুধু এ-ধারণাই থাকবে যে, আমি আমার মালিকের স্মরণে বসে গেলাম।

বিভিন্ন ধারণার উদ্রেক হলে ঘাবড়াবে না

নিবিষ্ট চিত্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। প্রথম দিন মোরাকাবায় বসলে হাজারো ধারণা আসবে। এর অধিকাংশই নোংরা থাকবে। এক দুটি ভালো থাকতে পারে। এভাবে হরেক রকম ধারণার ফলে ওলামায়ে কেরাম, ছাত্রগণ যিকির ছেড়ে দেয়। তারা বলে, যিকিরের মধ্যে আরো বেশি ওয়াসওয়াসা আসে। ভাই! ওয়াসওয়াসা বেশি আসে না। বিষয়টা হলো, যদি কোনো কামরায় বিড়াল পায়খানা করে, তাহলে তার দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে গন্ধ আসবে। এবার যদি ওই লোক দরজা বন্ধ করে বলে, আমি তো গন্ধের জন্য ভেতরেই প্রবেশ করতে পারছি না, সুতরাং দরজা আর খুলব না, তাহলে তার গন্ধ আর কোনো দিনও দূর হবে না। ঠিক তেমনিভাবে শয়তান বিড়াল আমাদের হৃদয়ে খারাপ ধারণার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে রেখেছে। এখন মোরাকাবায় বসে

হৃদয়ের দরজাটা সামান্য খুলতে চাইলেই তার দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। এই মাখলুকের মহব্বত। এই উল্টাপাল্টা কথা ইত্যাদি।

এতে কখনো ঘাবড়াবে না। এটা সহ্য করে নাও। এর ওপরও প্রতিদান পাবে। কোনো বুযুর্গকে এক শাগরেদ বলেছিল, হুজুর! আমি যিকিরে বসলেই আমার ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি তাকে বললেন, এতে ঘাবড়াবে না। চেষ্টা চালিয়ে যাও। সাধারণ মানুষ যিকিরের মধ্যে এক গুণ প্রতিদান পেলে তুমি দ্বিগুণ পাবে। কারণ, তোমার পথে বাধা রয়েছে। তুমি বাধা ডিঙিয়ে অতিক্রম করছ।

হাদীছ শরীফে এসেছে, কোনো বান্দা আটকে-আটকে কুরআন তেলাওয়াত করলে সে দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবে। কেননা, যার যেরকম কষ্ট, সে ওই রকম ছাওয়াব পাবে। সুতরাং বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা আসবেই। আপনি বসে পড়ুন। যিকিরের বরকত খোলার জন্য এতে গুপ্ত রহস্য রয়েছে।

চামড়ার কোমলতা ও হৃদয়ের কোমলতা

প্রাথমিক অবস্থায় মোরাকাবায় বসার অভ্যাস করলে এতে দেহকে যিকিরের অনুকূলে নিয়ে আসা হয়। এটি প্রথম পদক্ষেপ। তারপর অন্তরকে অনুকূলে নিয়ে আসা হয়। একটি উদাহরণ শুনুন। যারা নামাযে অভ্যস্ত হয়, আত্তাহিয়্যাতু অবস্থায় বসা তাদের জন্য সহজ। বরং কোনো সময় চেয়ারে বসা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু যারা নামাযে অভ্যস্ত নয়, আত্তাহিয়াতু অবস্থায় বসা তাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সময় নিচে বসতে হলে তারা পা ছড়িয়ে বসে। কেন? তারা বলে, আমার পা এভাবে মোড়া দিতে পারি না। এটা তাদের দেহের অনুকূলে নয়। ঠিক তেমন খোদাপ্রেমিকদের অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় তারা তাদের দেহকে অনুকূলে আনে। এরপর অন্তরকে অনুকূল বানায়। এজন্যই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

'অতঃপর তাদের চামড়া এরং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরের প্রতি কোমল হয়।'[১]

এখানে একটি সূক্ষ্মতা বিদ্যমান। আল্লাহ প্রথমে চামড়া তথা দেহের কোমলতার কথা বলেছেন। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় মোরাকাবায় উপবিষ্ট

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ২৩

ব্যক্তি এক ঘন্টা দু-ঘন্টা বসে। শেষ পর্যন্ত দু-চার ঘন্টা বসতেও কষ্ট হয় না। এটা দেহ কোমল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। বরং এমন একটা সময় আসে, যখন সে সামান্য সুযোগ পেলেই আল্লাহ-আল্লাহ বলতে থাকে। তখন তার তবিয়ত যিকিরের সময়ের সন্ধানে থাকে। সুতরাং যখন এই অবস্থা হাসিল হয়ে যাবে, যিকিরের জন্য সময়ের সন্ধান করবে। তখন বুঝবে, আল্লাহ আমাকে দেহের কোমলতার স্তর দান করেছেন, তারপর হৃদয়ের কোমলতার পালা আসে। হৃদয়ের কোমলতা এসে গেলে যিকির ছাড়া বান্দার জীবনযাত্রা সুখের হয় না। ইমাম রাযি (রহ.) বলেন, হে আল্লাহ! আপনার স্মরণ ব্যতীত আমার দিন সুখের হয় না এবং আপনার সঙ্গে বিনোদন ব্যতীত আমার রাত সুখের হয় না। আল্লাহর স্মরণ বান্দার লক্ষ্যবস্তু হলে যিকির তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এরপর তার বাতেনি অবস্থা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। অন্তর পরিষ্কার হয়। এরপর যিকির তার প্রভাব দেখায়। যে-ব্যক্তি যিকিরের মাধ্যমে নিজের অন্তরে যোগ্যতা অর্জন করে, পরে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তার বাতেনি অবস্থার উন্নতি হয়। কাজেই আমাদের নকশবন্দি তরিকায় প্রাথমিক সকল সবক হয় আল্লাহ-আল্লাহ যিকির। তারপর আসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর আসে মোরাকাবা। তারপর কুরআন তেলাওয়াত। তারপর প্রকৃত অবস্থা আসে নামাযের।

আমাদের মাশায়েখগণ এই ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করেছেন। আমরা যদি আমাদের নামায ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করতে চাই, তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় যিকিরের মাধ্যমে অন্তরকে যোগ্যতাসম্পন্ন বানাতে হবে।

অধিক পরিমাণে যিকিরের প্রভাব

আমি অধম এই শিরোনাম এজন্যই নির্ধারণ করেছি, যাতে আমাদের স্মৃতিপটে এই কথাটা বদ্ধমূল হয় যে, আমাদের সকল ব্যথার উপশম হচ্ছে অধিক পরিমাণ যিকির করা। আমরা যদিও যিকির করি, তবে তা অধিক পরিমাণে হয় না। এজন্যই আমরা এর দ্বারা উপকার পাই না। পরে অস্থিরতায় ভুগতে থাকি যে, এতদিন যাবৎ যিকির করছি; কিন্তু যিকিরের নূর অর্জিত হচ্ছে না। এর মূল ভিত্তি হলো, আমরা অধিক পরিমাণে যিকির করব, যাতে আমাদের প্রকৃতি অনুকূলে এসে যায়। অতঃপর এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষ সারাক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকবে। এরপর আল্লাহকে ভুলে যেতে চাইলেও ভুলতে পারবে না। আপনারা কি দেখেননি, পৃথিবীতে কারো প্রতি ভালোবাসা হলে সে তাকে ভুলতে পারে না?

তাই কবি বলেছেন–

روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے

اور روز یہ بات بھول جاتا ہوں

'প্রতিদিনই বলি তাকে ভুলে যাব, আর প্রতিদিনই একথাটা ভুলে যাই।'

দুনিয়ার ভালোবাসার এমন অবস্থা হলে আল্লাহর ভালোবাসার কেমন অবস্থা হওয়া চাই? তাই আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন–

جو دم غافل سو دم کافر

'যে শ্বাস উদাসীনতায় অতিবাহিত হয়েছে, সেই শ্বাস যেন কুফরি অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে।'

তাঁরা এটি সাধারণ কথা বলেননি। এমন অবস্থা মানুষের অর্জিত হয়। আমাদের মাশায়েখগণ একটা মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হতেন না। এটি ওই অবস্থা, যে ব্যাপারে বলা হয়েছে–

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'ওই সমস্ত লোক, যারা তাদের পালনকর্তাকে দাঁড়ানো, বসা ও শোওয়া অবস্থায় স্মরণ করে।'[১]

এটা হলো অধিক পরিমাণে যিকিরের প্রভাব। ফলে তাদের হৃদয়ের অবস্থা এমন হয়, প্রাথমিক অবস্থায় কষ্ট করতে হয়, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ সহজ করে দেন যে, এটা এরকম মনে করুন। যেমন– কোনো পিতা দু-তিন মিটার দূরে দাঁড়িয়ে তার শিশু ছেলেকে বলছে, আব্বু! আমার কাছে আস। ছেলে শুধু দাঁড়াতে পারে। এবার সে জানে, আমার ছেলে আমার নিকট আসতে হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। তারপরও বলে। অতঃপর যখন ছেলে আসতে থাকে আর পড়ে যায়, তখন পিতা এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ আমাদের দুর্বলদের অবস্থা জানেন। তারপরও আদর করে ডেকে বলেন, আমার দিকে আস। অতএব আমাদের জন্য উচিত, আমরা আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নেব। অতঃপর এই রাস্তায় কোনো বাধা এলে আল্লাহ আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে কোলে তুলে নেবেন।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১

কারামাতের অবস্থা

আমাদের এই তরিকায় কারামত হাসিল করার কোনো গুরুত্ব দেই না। আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, বাতাসে উড়লে তুমি একটা মাছির মতো। পানিতে ভাসলে শুকনা ঘাসের মতো। এতে কিছু হবে না। তোমার অন্তরকে কাবু করে নাও; তাহলে তুমি কিছু অর্জন করেছ। সুতরাং আমরা অন্তর দ্বারা আল্লাহকে মহব্বত করে আমাদের অন্তরকে কাবু করা চাই।

যিকিরের গুরুত্ব বোঝো

ভাই! এ সমস্ত মাহফিলের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, আমরা যিকিরের গুরুত্ব অনুধাবন করব। নিজের ত্রুটি দূর করব। কোনো সময় আমরা ওষুধ ব্যবহার করলে তার কোর্স পূর্ণ করব। তাহলে সেই ওষুধে আমাদের উপকার হবে। আমরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করব। আর আমরা যদি নামে মাত্র খোদাপ্রেমিক হই এবং নিজের আমলের প্রতি গর্ব বোধ করি, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। ফলে সারা জীবন মেহনত করেও কোনো কিছু হাসিল করতে পারব না।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা আবদুল্লাহ আনসারি (রহ.) হাররাতের পীর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব আশ্চর্য বাণী লিখেছেন। স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখা চাই। তিনি বলেন, কেউ নকশবন্দি, কেউ কাদেরি, কেউ চিশতি, কেউ সোহরাওয়ার্দি। যদি হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা জমাতে পার, তাহলে কিছু হয়েছ; নতুবা কিছুই নও। অতএব ভাই! অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা চাই; তাহলে আমাদের রাস্তা খুলে যাবে। আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষিত হবে।

যিকিরের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা আবশ্যক

আমাদের এই নকশবন্দি তরিকায় আল্লাহর বাণী

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

'তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো।'[১]

এ আয়াতের ওপর আমল করা হয়। আল্লাহ এখানে আমরের সীগাহ (আদেশসূচক ক্রিয়া) ব্যবহার করেছেন–

---

১. সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত ৭

اُذْكُرْ

'তুমি যিকির করো।'

সুতরাং আদেশ দিয়েছেন। বর্তমানে মানুষ বলে, যিকির কেন করেন? ভাই! করবেন না কেন? আল্লাহ তো আদেশ দিয়েছেন

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

'তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো।'[১]

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমাদের রবের নাম কী? তখন আমরা বলব 'আল্লাহ'। এই 'আল্লাহ' শব্দটিকে আল্লাহর সত্তাগত নাম বলা হয়েছে। আর বাকি সব নাম হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক নাম। সুতরাং আমাদের প্রভুর নাম 'আল্লাহ'। তিনি বলেছেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

'তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো।'[২]

তবে স্মরণ করার পরিমাণ রয়েছে। কী পরিমাণ স্মরণ করবে?

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

'একেবারে নিবিষ্ট চিত্তে, যাতে মাখলুক থেকে তোমার নিবিষ্টতা কেটে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।'[৩]

মাখলুক থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো। যাতে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই তোমার মন আকৃষ্ট হয়ে যায় ওই পরিমাণ স্মরণ করো।

মোরাকাবা কেন করা হয়?

মানুষ বলে, মোরাকাবা কেন করা হয়? আল্লাহ বলেছেন–

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ

'তোমার অন্তরে তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ করো।'[৪]

---

১. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৭
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫

সুতরাং নিজের মন, চাহিদা, চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান সব কিছুতে তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো। এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ। কীভাবে করবেন? তার ব্যাখ্যাও বর্ণনা করেছেন।

تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

'ভয় ও বিনয়ের সাথে নির্জনে।'[১]

মাআরিকুল কুরআনে আল্লামা মুফতী শফী সাহেব (রহ.) বলেন–

تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

দ্বারা অন্তরের যিকির প্রমাণিত হয়। সুতরাং পবিত্র কুরআনে এটি আল্লাহর নির্দেশ। মনে-প্রাণে-হৃদয়ে আল্লাহর যিকির করো। আল্লাহকে আমাদের হৃদয়ে বসিয়ে আমরা তাঁকে স্মরণ করব। এখানে না বোঝার কী আছে? মাঝে-মাঝে মানুষ বলে, যিকির ছাড়া এদের আর কোনো কাজ নেই। আলহামদু লিল্লাহ! এটিই আমরা চাই। আল্লাহর বান্দারা যিকিরকে কাজ মনে করে না। আল্লাহ যে-কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটি তাদের নিকট কোনো কাজই নয়। এটা অনুভূতির ত্রুটি। তাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা আমাদের মাকসাদ পূর্ণ করা চাই। আর আমাদের মাকসাদ হলো আত্মশুদ্ধি হাসিল করা। অন্তরকে নূরান্বিত করা। তাহলে আল্লাহর ভালোবাসায় আমাদের হৃদয় ভরে যাবে।

যিকিরের বিশেষ দুটি উপকার

ভাই! এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দুটি কথা জানতে পারলাম। এক. যিকির করলে অন্তর থেকে খারাপ ধারণার অপসারণ হয়। দুই. যিকিরের দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসা নসিব হয়। সাধারণ নিয়ম হলো, যে-বস্তুর কথা অধিকহারে স্মরণ হয়, সেই বস্তু অর্জনের জন্য সেই পরিমাণ আবেগ সৃষ্টি হয়। একদিন কেউ বলল, আনারস কী জিনিস? পরের দিন তার আনারসের কথা স্মরণ হবে। পরের দিন আনারস খাওয়ার ইচ্ছা হবে। সুতরাং আলোচনার ধারা বস্তুর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কাজেই যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে, সে দুটি জিনিস অর্জন করতে পারবে। হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূর হবে আর আল্লাহর ভালোবাসা নসিব হবে।

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ২০৫

মাশায়েখে এযাম ও অধিক পরিমাণে যিকির

আমাদের ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা অধিক পরিমাণে যিকিরে নিহিত। যিকিরের স্বল্পতা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ। তাই অধিক পরিমাণ যিকির করবেন। আমাদের মাশায়েখগণ কী পরিমাণ যিকির করতেন?

খাজা ফজলুল্লাহ কোরাইশি (রহ.) তাঁর রচিত মাকতূবাতে উল্লেখ করেন, তিনি যখন জমিনে হাল চাষ করতেন, তখনো আল্লাহ-আল্লাহ যিকির অন্তরে জারি থাকত। তিনি বলেন, একদিন আমি হাল শেষ করার পর গণনা করে দেখলাম, হাল চলাকালীন সময় আমি আশি হাজারবার 'আল্লাহ-আল্লাহ' যিকির করেছি।

হযরত খাজা হোসাইন আলী (রহ.)-এর খানকায় যিকিরের পর সমাপণি দু'আ অনুষ্ঠিত হতো না। এর অর্থ হলো, তিনি ঈশার পর মোরাকাবায় বসতেন। অনুমতি দেওয়া থাকত, যিকির করতে-করতে কেউ ক্লান্ত হলে চলে যেতে পারবেন। সুতরাং যিকির করতে-করতে ক্লান্তি এসে গেলে একেকজন করে চলে যান। পরিশেষে একজনও বাকি থাকে না। তিনি মাথা উঠিয়ে দেখছেন কেউ নেই। ফলে তিনি তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। এই তাহাজ্জুদে ফজরের আযান হতো। দেখুন, কী পরিমাণ যিকির করতেন।

মাশায়েখে কেরামের নির্জনতার জিন্দেগি

আমাদের মাশায়েখে কেরামকে আমরা দেখেছি, তারা ঘন্টার-পর-ঘন্টা জায়নামাযে বসে থাকতেন। দিন-রাত সারাক্ষণ আমরা তাদেরকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল দেখেছি। সাধারণ লোকেরা তাদের দেখত, তারা নির্জনতায় বসে আছেন। এতে তাঁদের আহার্যও পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রস্তুত করে দেওয়া হতো। তবে সাধারণ মানুষ এটা জানত না যে, তারা কত সময় এই নির্জনতা অবলম্বন করছেন। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর স্মরণে যত বেশি নির্জনতার সময় ব্যয় করবেন, আপনার চেহারায় আল্লাহর নূর তত বেশি প্রস্ফুটিত হবে। এজন্যই আল্লাহওয়ালাদের চেহারায় আল্লাহর বিশেষ নূর বিকশিত হয়। এজন্যই বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ

'আল্লাহওয়ালা হচ্ছেন তাঁরা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।'

সুতরাং অধিক পরিমাণে যিকির করা অত্যন্ত জরুরি। আমরা যদি নিজের আমলসমূহ আদায় না করি, তাহলে আমরা সফল হব কীভাবে।

মোরাকাবা সর্পদংশনের খাঁটি প্রতিষেধক

অনেক সময় বন্ধুদের চিঠিপত্রে অভিযোগ পেয়ে থাকি যে, হুজুর! দুরূদ শরীফের তাসবীহ আদায় করি, ইস্তেগফার করি; তবু মোরাকাবা হাসিল হয় না। ভাই! দুরূদ শরীফ-ইস্তেগফার এগুলো অযীফা। আর মোরাকাবা আমাদের সবক। জলাতঙ্ক প্রতিরোধক সবক তথা মোরাকাবাই হচ্ছে আসল উপাদান। ডাক্তার ওষুধ দিলে তাতে এন্টিবায়োটিক থাকে, ব্যথার ওষুধ থাকে, ভিটামিন থাকে, সবগুলো একটি প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়ে দেয়। এখন রোগী এন্টিবায়োটিক বাদ দিয়ে প্রতিদিন ভিটামিন খেলে তার জ্বর নিবারণ হওয়ার আশা করা যায় না। আসল তো এন্টিবায়োটিক ছিল, যার দ্বারা জ্বর নিবারণ হবে।

অতএব আমাদের অন্তরের জ্বরের জন্য অন্তরের যিকির ও মোরাকাবা জরুরি। আপনারা সেটি যাচাই করে দেখবেন। এটি এমন বিষয় নয় যে, আপনি-আমিই এই রাস্তার প্রবর্তক। বরং শত-শত বছর যাবৎ একাজ চলে আসছে। আমাদের মাশায়েখগণ করেছেন। আর যারাই এ-রাস্তায় পদার্পণ করে জীবন ধারণ করেছেন, তারা আবশ্যিকভাবে আল্লাহর ভালোবাসা পেয়েছেন। বর্তমানে যেমন ২*২=৪ এতে কারো সন্দেহ নেই। আমি অধম ওই রকম বিশ্বাস করে বলতে পারি যে, যে-বান্দা নিমতান্ত্রিকভাবে আল্লাহর যিকির আদায় করবে, দুনিয়াতে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে। এখন আমি একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমার থেকে আমাদের মাশায়েখদের জীবন বেশি দূরে নয়। এটি নতুন কোনো ওষুধ বাজারজাত করা হয়নি যে, যাচাই করে তার ফলাফল বলতে হবে। এটি অনেক পুরাতন বিষয়। ইসলামের শুরু থেকে চলে আসছে। আর যারাই এই ঘাঁটে অবতরণ করেছে, তারাই সফলতার সাথে পরিতৃপ্ত হয়েছে।

যিকির কখন থেকে চলে আসছে?

যিকিরের এই আমল নবীজির যুগ থেকে চলে আসছে। তারপর সাহাবায়ে কেরাম, তারপর তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন সকলেই নিয়তান্ত্রিকভাবে যিকির আদায় করেছেন। তবে হ্যাঁ, কিছু পরিভাষা আছে, যেগুলো পরবর্তী কালে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন– আল্লামা আবু সাঈদ খাররাজ সর্বপ্রথম فناء ও بقاء শব্দ ব্যবহার করেছেন। কাজেই বিভিন্ন পরিভাষা পরবর্তী কালে সংযোজন হয়েছে সত্য; কিন্তু তার ধারা ইসলামের সূচনা

থেকেই চলে আসছে। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবীজির সম্মুখে সাহাবায়ে কেরাম একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন। আল্লামা মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের এই নীরবতা কি উদাসীনতার জন্য ছিল? না; সে ছিল তাদের গবেষণা, চিন্তা। যা যিকির, থেকেও ঊর্ধ্ব স্তরের কাজ। কাজেই তাঁদের জীবনে যিকির সম্পৃক্ত ছিল। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

মনের চোখ খোলো বাবা!

আমরা আমাদের মনের চোখ খুলতে চাই। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত যিকির করব না ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি হাসিল হবে না। বাবা! মনের চোখ খোলো, বাবা! মনের চোখ খোলো। এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, সংসার বিসর্জন দাও– শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বদা আল্লাহর নাম স্মরণ করো।

بابا من کے آنکھیں کھول بابا من کے آنکھیں کھول

دنیا ہے ایک تماشا چار دنوں کے چھوٹی عاشہ

বাবা! মনের চোখ খোলো, বাবা! মনের চোখ খোলো। দুনিয়ার এই রং-তামাশা, চার দিনের ছোট আশা। সেকেন্ডে তোলা সেকেন্ডে মাশা, বিবেকের পাল্লা হাতে লও। নিজ আমল মেপে নত হও।

সুতরাং ভাই! আমরা মনের চোখ খুলে দেখি আমাদের অবস্থান কেমন হয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদীন ও সারাক্ষণ যিকির

খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তাঁদের জবানে অধিকাংশ সময় যিকির থাকত আর তাঁদের যিকির তাদের স্তর অনুযায়ী হতো। এ সম্পর্কে আশ্চর্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি সারাক্ষণ لا اله الا الله এর যিকির করতেন। অর্থাৎ– আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। এর মতলব হলো, তার অন্তর থেকে মাখলুকের অস্থিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তাই একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে শুধু الله الا اله لا এর যিকির করতেন। একে তাহলীলে লিসানী বলে। হযরত ওমর (রাযি.) সারাক্ষণ الله اكبر এর যিকির করতেন। মাখলুখের প্রতি মন গেলেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতেন الله اكبر كبيرا সুতরাং

হাঁটতে-বসতে সর্বদা এই বাক্য পাঠ করতেন। অর্থাৎ– আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন। এটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ওছমান (রাযি.) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সব সময় سبحان اللهএর যিকির করতেন। অর্থাৎ– আল্লাহ মহাপবিত্র। আপনারা হয়তো শুনেছেন, ফেরেশতারাও سبحان الله এর যিকির করেন। এজন্য ওছমান (রাযি.)-এর মধ্যে লাজুকতা বেশি ছিল। তাই তিনি سبحان الله এর যিকির করতেন। তিনি এমন লাজুক ছিলেন যে, আল্লাহর ফেরেশতারাও তাকে দেখে লাজুকতা প্রকাশ করতেন।

কথিত আছে, নবীজি শুয়ে আছেন। পায়ের গোছা সামান্য খোলা রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম যাচ্ছেন। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে বিদায় করছেন। কিন্তু হযরত ওছমান (রাযি.) তাশরীফ নিলে নবীজি নিজের পায়ের গোছা আবৃত্ত করেছেন এবং উঠে বসে গেছেন। আমাদের কোনো এক আম্মাজান জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এলেন। আপনি একটুও নড়াচড়া করলেন না আর ওছমান আগমন করলে আপনি গোছা আবৃত্ত করলেন এবং উঠে বসে গেলেন? নবীজি উত্তর দিলেন, আমি কি এমন লোকের আগমনে লজ্জাবোধ করব না, যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা বোধ করে।

হযরত আলী (রাযি.) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সর্বদা الحمد لله এর যিকির করতেন। এটা তার সারাক্ষণের আমল ছিল। সুতরাং চার সাহাবার নিজ-নিজ স্তর অনুযায়ী তাঁদের আমল সবর্দা বিকশিত হতো।

খেলাফতের ধারাবাহিতার মধ্যে ওলামায়ে কেরামের দলিল উত্থাপন

আমাদের এই তরিকার বুযুর্গ আল্লামা নকশবন্দী বোখারি (রহ.)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুজুর! আমাদের এই তরীকত পন্থা কি শরীয়তের বহির্ভূত কোনো বিষয়? তিনি জবাব দিলেন, না; তরীকতের মাকসাদ হলো, যা কিছু সমষ্টিগত রয়েছে, সেগুলোকে বিস্তারিত প্রকাশ করা আর যা কিছু ইঙ্গিতসূচক রয়েছে, সেগুলোকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা।

সুতরাং ওলামায়ে কেরাম এ দুটি কথাকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেন। মাশায়েখে কেরাম এগুলোকে কাশফের মাধ্যমে দেখতে পান। অতএব

মাশায়েখ কেরাম কাশফের মাধ্যমে ওই চার খলিফাকে দেখেছেন। সুতরাং তাঁরা জানতে পেরেছেন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের যিকির অনুপাতে স্তর দান করেছেন। আর সেই অনুযায়ী তাদের খেলাফতের ধারাবাহিকতা এসেছে। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম এই ধারাবাহিকতাকে দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। অতএব তারা দলিল দিচ্ছেন। তারা বলেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ

'উত্তম যুগ হলো আমার যুগ।'

এখানে যে قرنى শব্দ রয়েছে, তাতে খেলাফতের ধারাবাহিকতার রহস্য বিদ্যমান। দেখুন, খোলাফায়ে কেরামের প্রত্যেকের নামের শেষ অক্ষর আলাদা করলে قرنى শব্দ হয়। যেমন صديق এর ق عمر এর ر এবং عثمان এর ن على-এর ي যথা قرنى = قرنى হলো।

সুতরাং উলামায়ে কেরাম লিখেছেন قرنى শব্দের মধ্যে নবীজি তাদের খেলাফতের ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অতএব প্রমাণিত হয়ে গেল যে, খেলাফতের ধারাবাহিকতা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারা অনুযায়ী হয়েছে। কোনো-কোনো ওলামায়ে কেরাম খেলাফতের ধারাবাহিকতার প্রমাণ এভাবে দিয়েছেন যে, সাধারণ নিয়ম হলো, শ্বশুড় ও জামাতার মধ্যে শ্বশুড়ের সম্মান বেশি থাকে। কারণ, তিনি পিতৃতুল্য আর জামাতার সম্মান কম থাকে। কারণ, সে সন্তানতুল্য। সুতরাং হযরত আবুবকর ও ওমর (রাযি.) উভয় নবীজির শ্বশুর ছিলেন। এর মধ্যে হযরত আবুবকর (রাযি.) নবীজির অধিক প্রিয় ছিলেন। কারণ, তিনি আগে মুসলমান হয়েছেন। তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা নবীজির সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। এ হিসাবে হযরত ওমর থেকে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর অগ্রাধিকার বেশি ছিল। বাকি রইল পরের দুজন। তারা উভয়ই নবীজির জামাতা ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত ওছমান (রাযি.) ছিলেন নবীজির দুই মেয়ের স্বামী। যয়নব ও উম্মে কুলসুম। আর হযরত আলী (রাযি.) ছিলেন এক মেয়ের জামাতা। এ হিসেবে হযরত ওছমান (রাযি.) ছিলেন হযরত আলী (রাযি.) থেকে অগ্রাধিকারী। অতএব ওলামায়ে কেরাম যে-বিষয়ে দলিল পেশ করেছেন, আমাদের মাশায়েখগণ কাশফের মাধ্যমে সেগুলো অবলোকন করেছেন এবং আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং খোলাফায়ে রাশিদীনের

স্তর তাদের যিকিরের স্তর অনুযায়ী ছিল। তারা যিকির করেছেন। বর্তমানে আমরাও করা চাই। এতে আমাদের সমস্ত ব্যাধির উপশম নিহিত।

আল্লাহর স্মরণে সবকিছু ভুলে যাও

এত পরিমাণ যিকির করো যে, যিকির করতে-করতে নিজেকে ভুলে যাও। দিলের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর নাম থাকবে। হযরত খাজা ফজলে আলী কোরাইশি (রহ.)-এর খানকায় একসময় শ-দেড়শো লোক আল্লাহ-আল্লাহ যিকির শিক্ষা করার জন্য সমবেত থাকত। সকাল, দুপুর, রাত সব সময় এ পরিমাণ থাকত। তাদের জীবনীতে আছে, আমাদের ওস্তাদগণও বলেছেন যে, যখন রাত হতো, তখন কিছুক্ষণ পর এক প্রেমিকের মধ্যে এমন অবস্থা জারি হতো যে, সে জোরে জোরে আল্লাহ বলতে-বলতে বেহুশ হয়ে যেত। কিছুক্ষণ পর সে জ্ঞান ফিরে পেত। এভাবে একজন না একজনের এমন অবস্থার মধ্যে রাত শেষ হতো। বলা হয়, একবার তার খানকার মধ্যে দুজন বৃদ্ধ পাশাপাশি বসল। যিকিরের মধ্যে একবার হঠাৎ একজন আরেকজনের চুল ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। সে শান্ত হলে কিছুক্ষণ পর আবার ২য় জন প্রথম ব্যক্তিকে চুল ধরে টানতে শুরু করল। উপস্থিত সবাই অবাক হলো, এ কী ব্যাপার! যিকিরের মজলিসে ওরা এমন করছে কেন? ফলে বিষয়টা যাচাই করার জন্য একজন গিয়ে তাদের পাশে বসল। দেখা গেল, যিকিরের আবেগে উন্মাদের ভাব এসে গেছে; ফলে তারা এমন করছে। তারা উভয়ে পাশাপাশি বসে একজন বলছে, আল্লাহ পুরুষ, তখন দ্বিতীয়জনও বলছে, আল্লাহ পুরুষ। একথা বলে তারা একে অপরের চুল আঁকড়ে ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়। তাদের ভেতর আল্লাহর ভালোবাসা কত দেখুন। আফসোস! যদি আমাদের অন্তরে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হতো।

আল্লাহর ভালোবাসায় অস্থিরতা জরুরি

হযরত খাজা মাসুম (রহ.) বলেন, যিকিরকারী যতক্ষণ পর্যন্ত যিকিরের মধ্যে অস্থির না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কৃতকার্য হতে পারবে না।

حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ

'এমন অবস্থা হবে যে, পৃথিবী প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে যাবে।'[১]

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

وَظَنُّوٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ

'এবার আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল ও প্রত্যাবর্তনের স্থান নেই।'[১]

এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে দেখতে পাবেন, অন্তরে কেমন নূর বর্ষিত হয়। সুতরাং এটিই মূল ভিত্তি যে, অধিক পরিমাণে যিকির করা হবে। এই প্রেসক্রিপশনে কাজ হলে পরে কিছু সময়ের জন্য নিজের শায়খের খানকায় বসো। আল্লাহ তোমার সকল কাজ শুধরে দেবেন।

সম্পর্কের পরিবর্তনও আত্মশুদ্ধি

যে-সমস্ত বান্দা এসব ঘটনা অবগত হয়ে শায়খের দরবারে আসে, তারা একদিন কিংবা এক মাহফিলের মধ্যেই সম্পর্ক পেয়ে যায়। তারা ওই সমস্ত বান্দা, যারা অধিক পরিমাণে যিকির করে নিজের বাড়ি থেকে অন্তর পরিষ্কার করে এসেছে। সুতরাং যখন কোনো আয়না পরিষ্কার করে শায়খের কাছে আসবে, সেখানে সম্পর্ক সৃষ্টি না হওয়া দুষ্কর। আমরা নোংরা বর্তন নিয়ে উপস্থিত হই আর আশা করি, খাজা বাকী বিল্লাহর মতো তাওয়াজ্জুহকারী হয়ে যাই। আল্লাহ জানেন, এ সমস্ত ঘটনা তারা কোথা থেকে শোনে। কিন্তু একথা চিন্তা করে না যে, যারা তাওয়াজ্জুহের অধিকারী হয়েছেন, তারা কী পরিমাণ সাধনা করে তা অর্জন করেছেন।

খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর ঘটনা হলো, তিনি শায়খের খেদমত করছেন। সবক আদায় করছেন। পরিশেষে তার অন্তর শায়খের অন্তরের কাছাকাছি হয়ে গেল। শায়খ তাঁর অবস্থা অবলোকন করে বললেন, এবার তুমি কী চাও? তিনি বললেন, আপনার অবস্থা অর্জন করতে চাই। ফলে শায়খ তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। আল্লাহ অবস্থাকে এক বুক থেকে অন্য বুকে স্থানান্তর করে দিলেন।

হ্যাঁ ভাই! এ সম্পর্ক স্থানান্তরিত হয়। তবে এর জন্য আপনার বর্তন পরিষ্কার রাখা অবশ্যক। খাজা বাহাউদ্দীন (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি শায়খের নিকট আগমনের কয়েকদিন পরই তার অন্তর শায়খের অনুরূপ হয়ে যায়। তিনি ওই স্তরের আশেক ছিলেন, যিনি বাড়িতে থেকেই অধিক পরিমাণে যিকিরের মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার করে এসেছিলেন।

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

বর্তমান যুগের আশেকের অবস্থা

আজ আমাদের অবস্থা হলো, নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সবক ও অযীফা আদায় করবে না। অবশেষে শায়খের দরবারে এসে এই আশা পোষণ করে যে, শায়খের নিকট কোনো ড্রাম থাকে আর তাতে ডুব দিয়ে আমি আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে যাই। আসবে সবার পরে আর যেতে চাইবে সবার আগে আর বলবে, হুজুর! আমি অমুক-অমুক শায়খের নিকট যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কিন্তু সব ছেড়ে আপনাকে চয়ন করেছি। এতে সে আপনার নিকট আসার অনুগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে।

যাহোক, আমি আপনার দরবারে হাজির হয়ে গেছি। হুজুর! আমার থেকে তো মোরাকাবা-যিকির ইত্যাদি ঠিকমতো আদায় হয় না। আপনি একটু তাওয়াজ্জুহ দিন। কারণ, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। আরেকটি কথা বলে যে, হুজুর! আমার স্ত্রী তো আমার কথা শুনছে না; সে ক্ষেত্রেও আপনি একটু তাওয়াজ্জুহ দেবেন।

ভাই! যদি আশেক ও পীরের মধ্যে এমন অবস্থা হয়, তাহলে শুদ্ধি আসবে কোথা থেকে। এজন্যই আমি বলে থাকি, ভাই! ওয়াজ মাহফিলের উদ্দেশ্য শুধু অগ্নিঝরা বক্তব্য নয়। বরং আলোচিত কথাগুলো মস্তিষ্কে রাখা চাই। তাহলে কিছু উপকার হবে। আজ যদি আমরা সংকল্প করে নিই যে, আজ থেকে খাওয়াদাওয়া বর্জন করে আমাদের অযীফা আদায় করব, যিকিরে ফাঁকা দেব না, তাহলে বুঝে নাও, তোমার ভিত্তিস্থাপন হয়ে গেছে। এই মহব্বত তোমাকে মহব্বতের আদব শিক্ষা দেবে। এবার এ রাস্তায় তুমি দ্রুত চলতে থাকবে। এটি খুব সহজ উপায়– কঠিন নয়। কিছু জিনিস এমন হয় যে, সকলে পালন করতে পারে না। কিন্তু আমাদের মাশায়েখগণ এমন পন্থা বের করেছেন, যা সবার জন্য সহজ। আল্লাহর অনুগ্রহ দেখুন। আল্লাহ আমাদেরকে এখানে ওই সমস্ত ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

মাশায়েখগণ থেকে তাওয়াজ্জুহ গ্রহণের পদ্ধতি

আমরা ওই সমস্ত তাওয়াজ্জুহ থেকে ফায়দা তখনই পাব, যখন আমাদের মনের তাওয়াজ্জুহ তাদের প্রতি স্বচ্ছ হবে। তাদের সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। নিজেকে সব সময় শূন্য মনে করতে হবে। শায়খের সামনে উপস্থিত থাকলে মনে করতে হবে, আকাশ থেকে

কল্যাণ আসত আমাদের প্রিয় নবীজির অন্তরে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মাশায়েখে কেরামের অন্তর অতিক্রম করে আমার শায়খের মাধ্যমে, আমার অন্তরে কল্যাণ আসছে। এ হলো অন্তরের সম্পর্ক। আর সামনে উপস্থিত না থাকলে ذکر قلبی আদায় করতে হবে। এ দুটি কথা উপলব্ধি করে চলতে পারলে দেখুন, আল্লাহর বরকত কীভাবে আসে। বান্দার অন্তর ধুয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের মাশায়েখগণের একটি মাহফিলই যথেষ্ট। তবে এর জন্য তোমার হৃদয়ের গতি সঠিক থাকতে হবে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সামান্য একটি পেয়ালা উল্টিয়ে রাখলে তাতে এক ফোঁটা পানিও জমা হবে না। এটা কি বৃষ্টির ত্রুটি? এটা তোমার পিয়ালার ত্রুটি। সুতরাং আমরা এ সমস্ত মাহফিলে আগমন করলে আমাদের হৃদয়ের মুখ ওপর দিকে রেখে এসে বসা চাই। আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

'নিশ্চয় এতে রয়েছে উপদেশ। যাদের অনুধাবন করার মতো অন্তর আছে, তাদের জন্য অর্থাৎ– যার অন্তর সংগ্রহ করতে চায়। অথবা যারা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।'[১]

সারাটা শরীরকে কান বানিয়ে শায়খের চেহারার প্রতি তাকিয়ে শ্রবণ করবে। কান নিবিষ্ট থাকবে তিনি কী বলছেন সে দিকে। এরপর দেখুন একটি মাহফিলে আপনার কী পরিমাণ কল্যাণ অর্জিত হয়। আদবের সঙ্গে সামান্য সময় দিলেও তা আমাদের কল্যাণের কারণ হয়ে যাবে। সুতরাং এটি একটি ভিত্তিমূলক কথা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। উদ্দেশ্য হলো আমার নিজের সবক পুরা করা। আল্লাহ আমি অধমকেও এ সকল কথার ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আপনারাও গুরুত্বের সাথে আমল করুন; তাহলে অনেক ফায়দা পাবেন ইনশাআল্লাহ। তাই অধিক পরিমাণে যিকির করা চাই। যিকিরের আলাদা অবস্থা হয়ে যাবে। এরপর মানুষ তার মালিকের স্মরণে ব্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর নাম আর ভুলবে না।

হযরত মনি শাহ (রহ.) ও আল্লাহর যিকির

হযরত কারী তায়্যিব সাহেব (রহ.) লিখেছেন, দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় আল্লামা কাসেম নানুতবি (রহ.) বলেছিলেন, আজ

---

১. সূরা কাফ : আয়াত ৩৭

এমন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করা হবে, যিনি জীবনে কবীরা গোনাহ করবেন তো দূরের কথা কোনো দিন এমন কল্পনাও করেননি। এরপর জনগণ দেখল, সেই ভিত্তি স্থাপন করলেন আল্লামা মুযাফকর হোসাইন কান্দলবি (রহ.) যিনি মনি শাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। দেখতে খুব খাট ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর দরবারে তাঁর দেহ অনেক লম্বা ছিল। বাহ্যিকভাবে সাধারণ মানুষ মনে করা হতো; কিন্তু আল্লাহ কেমন পরহেযগারি তাঁকে দান করেছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের কোনো ওস্তাদ লিখেছেন, তিনি সারা বছর এক পয়সা এক পয়সা জমা করে বছরে এক দিন দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষকগণকে দাওয়াত খাওয়াতেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কারণ, তাঁর বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে আসার পর কমপক্ষে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামাযে নিবিষ্টতা, বিনয় ও নম্রতা বজায় থাকত। সুবহানাল্লাহ!

যার বাড়ির খাবারের কারণে কম পক্ষে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামাযে বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পেত, তাঁর মাধ্যমে মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়েছিলেন। তাঁর যিকিরের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি যিকিরে বসা আছেন। এমন সময় তার জামাতা 'আল্লাহবান্দা' সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন, মিয়া তুমি কে? বলল, আমি 'আল্লাহবান্দা'। তিনি বললেন, আরে মিয়া! সবাই তো আল্লাহর বান্দা। তুমি কে? বলল, আমি আপনার জামাতা আল্লাহবান্দা। বললেন, আচ্ছা! আচ্ছা! কিছুক্ষণ পর আবারও একই রকম প্রশ্ন, তুমি কে? বলা হয় যে, তাঁর ওই জামাতা দু-বছর পর্যন্ত তার খেদমত করেছেন। কিন্তু দু-বছরের মধ্যেও তার নাম তিনি মুখস্থ করতে পারেননি। অর্থাৎ– একমাত্র আল্লাহর নাম ব্যতীত কারো নাম তার অন্তরে ঠাঁই পায়নি।

এ ছিল আমাদের মাশায়েখগণের যিকিরের অবস্থা। একমাত্র আল্লাহর নাম ছাড়া অন্তরে কিছুই আশ্রয় পেত না।

আমরাও এমন যিকির করব

আমরাও এ-রকম যিকির করব; তাহলে আল্লাহর নাম আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হবে। আল্লাহর নামের আবেগ প্রকাশ পাবে। এমন অবস্থা হবে যেমন কোনো কবি বলেন–

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے

سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے ترے دل شاد رہے
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

তোমার স্মরণে সকলকে ভুলিয়ে দাও। কিছু যেন আমার স্মরণ না থাকে। তোমার ওপর ঘরবাড়ি বিলীন করে দাও; মনের ঘর আবাদ থাকবে। সকল আনন্দ জ্বালিয়ে দাও; তোমার চিন্তায় হৃদয় শান্ত থাকবে। দৃষ্টি থেকে সবাইকে সরিয়ে দাও; আবেদন থাকবে তোমার দরবারে। জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত জবানে রেখে দিয়ো হে আমার মালিক!

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

মন অবস্থা যেন তৈরি হয়ে যায়। আমরা আল্লাহর দরবারে এমন অন্তর চাইব–

اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو
دائمی رحمت کی اس پہ تیری نظر ہو
دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا
محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ اس کی خبر ہو

হে আল্লাহ! এমন অন্তর দাও, যা তোমার মহব্বতের ঘর হয়। সেই ঘরে সর্বদা তোমার রহমতের দৃষ্টি দাও। এমন হৃদয় দাও, যা তোমার ভালোবাসায় সিক্ত হয়। হাশরের ময়দানে শোরগোল হলেও যেন তার কোনো খবর না থাকে। আল্লাহ যেন আমাদের অন্তরে এভাবে এসে যান যে, আমরা সব কিছু থেকে উদাসীন হয়ে যাই। আল্লাহ আমাদের এমন অন্তর দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

তাছাওউফ ও সুলুক

'একটি বিষয় হলো নবুওতের শিক্ষা, আরেকটি হলো নবুওতের অবস্থা। নবুওতের শিক্ষাকে শরীয়তের ইল্‌ম বলে। আর নবুওয়তের অবস্থাসমূহকে علم الاحسان বলে। এই এলমে এহসানের আরেক নাম তাছাওউফ। ভাই! আমরা একে তাছাওউফ বলে দিলাম। এই নামের কারণে যদি আপনার রাগ এসে যায়, তাহলে আপনি একে علم الاحسان কিংবা تزكية বলে দিতে পারেন। এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কারণ, এটি কুরআন-হাদীছের শব্দ। আল্লাহ বলেছেন–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আল্লাহ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।'

তাছাওউফ ও সুলুক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

প্রত্যেক ফুলের রং ও সুবাস ভিন্ন

নবীজি ইরশাদ করেছেন–

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

মানুষ সোনা-রুপার খনির মতো। যদি মানুষের জীবনকে নিরীক্ষণ করা হয়, তাহলে বিভিন্ন গুণের মানুষ পাওয়া যাবে। কারো এমন গুণ, কারো তেমন গুণ। প্রত্যেক ফুলের রং ও সুবাস ভিন্ন। কারো মধ্যে ভালো গুণ পাওয়া যাবে, কারো মধ্যে খারাপ গুণ পরিলক্ষিত হবে। এমনকি যাকে আমরা একেবারে পাপিষ্ঠ মনে করি, কাছে থেকে তার জীবনের প্রতি লক্ষ করলে তার মধ্যেও ভালো গুণ পাওয়া যাবে। সুতরাং মানুষের জীবন যেন বিবেকের তারতম্যে পরিবর্তিত হয়।

ভালো-মন্দের পরিবেশ

মাখলুকাতের মধ্যে যাদের মধ্যে শুধু ভালো গুণ রয়েছে, তারা হলেন ফেরেশতা। যার মধ্যে শুধু খারাপ গুণ রয়েছে, সে হলো শয়তান। আর যারা ভালো-মন্দের সমন্বয়, তারা মানুষ। অর্থাৎ– প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় গুণ রয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, মানুষ ভালো পরিবেশে থাকলে

তার মধ্যে ভালো গুণ প্রাধান্য পায় আর পঙ্কিলতার পরিবেশে থাকলে তার মধ্যে খারাপ গুণ প্রাধান্য পায়। দুনিয়ার সবচেয়ে পুণ্যবান ব্যক্তিকেও নোংরা পরিবেশে রাখলে তার পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সবচেয়ে পাপিষ্ঠকে ভদ্র পরিবেশে রাখলে তার জীবন পরিশুদ্ধ হওয়ার আশা করা যায়। সুতরাং পরিবেশ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে।

পরিবেশের প্রভাব

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যারা বিভিন্ন প্রকার প্রাণী লালন করে, তাদের মধ্যে ওই সমস্ত প্রাণীর স্বভাব প্রভাব ফেলে। যেমন– যারা ঘোড়া পালে, তাদের মধ্যে বীরত্বের ভাব প্রকাশ পায়। যারা উট পালে, তাদের মধ্যে জেদ ও কর্মতৎপরতা প্রকাশ পায়। যারা ছাগল পালে, তাদের মধ্যে অপারগতা প্রকাশ পায়। ভাই! চিন্তার বিষয় হলো, যদি প্রাণীদের সঙ্গে থাকার কারণে প্রাণীর স্বভাব তার ওপর আছর করে, তাহলে আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে থাকলে তাদের প্রভাব আমাদের ওপর পড়বে না কেন?

এজন্যই বলা হয়েছে–

اَلصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ

'সান্নিধ্য প্রভাব বিস্তারকারী।'

কাজেই মানুষের জন্য উচিত ভালো পরিবেশে থাকা, পুণ্যবানদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। পুণ্যবান সাথী গ্রহণ করলে সে তোমাকে পুণ্যের রাস্তা থেকে সরতে দেবে না। সরে যেতে চাইলেও সে টেনে ধরে রাখবে। বর্তমানে যুবকরা বলে, আমার বন্ধু অমুক খারাপ কাজ করে, সে ভালো নয়। আমি এগুলো থেকে অনেক দূরে থাকি। এমন কথা যে যুবক বলবে, জেনে রাখবেন, সে ১০০% মিথ্যা কথা বলছে। কেননা, তার বন্ধু এমনটা করবে আর সে তাকিয়ে শুধু দেখবে তা হতেই পারে না। বন্ধুর দ্বারাই মানুষকে পরিচিত করা যায়। যদি তার বন্ধু ভালো হয়, তাহলে সেও ভালো হবে। আর বন্ধু খারাপ হলে সেও খারাপ হবে। সুতরাং মানুষ যে-পরিবেশে বসবাস করবে, সেই পরিবেশের প্রভাব তার মধ্যে পড়বেই। আল্লাহওয়ালাদের পরিবেশে থাকলে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবে আর পাপিষ্ঠদের পরিবেশে থাকলে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে।

দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধিসমূহ

মানুষের দেহে শারীরিক রোগও হয়, আত্মিক রোগও হয়। শারীরিক ব্যাধি তো আপনারা চিনেনই। যেমন– ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিক, আলসার, ঠোঁট কাটা, চোখ ওঠা, কান গলা, নাক গলা, প্যারালাইসিস, হৃদয়ব্যথা, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগ রয়েছে যেগুলো ডাক্তারদের চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে যায়। এমনিভাবে আত্মার রোগেরও বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন– হিংসা বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অহংকার, লৌকিকতা, মিথ্যা, প্রবৃত্তি। অলসতা, রোযা ভঙ্গ করা, যাকাত না দেওয়া, মুনাফেকি ইত্যাদি। এগুলো হলো বাতেনি ব্যাধি।

দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসাসমূহ

দৈহিক রোগের জন্য যেমন আমরা দেহবিশেষজ্ঞদের নিকট গমন করি, তেমনিভাবে বাতেনি রোগের জন্য আমাদেরকে বাতেনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। এ শ্রেণির ডাক্তারদেরকে মাশায়েখ, ওলামা ও সুলাহা বলা হয়, আর যারা দৈহিক চিকিৎসা করে, তাদেরকে হাকিম, ডাক্তার, সার্জন ইত্যাদি বলা হয়।

দৈহিক ও আত্মিক রোগ-ব্যাধির ওপর পুস্তকাদি

দৈহিক রোগের চিকিৎসার জন্য হাকিম ও ডাক্তারগণ বিভিন্ন প্রকার বইপুস্তক রচনা করেছেন। যেমন মীযানুত্তিব, তিব্বে আকবর, শরহে আসবাব। কানুচা, মিনহাজুল আতিব্বা ইত্যাদি। এমনিভাবে বাতেনি চিকিৎসার জন্যও কিতাবাদি রয়েছে। যেমন– সবচেয়ে বড় কিতাব হলো পবিত্র কুরআন। তারপর তার বিস্তারিত আলোচনাস্বরূপ বোখারি, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুয়াত্তাইন, আখলাকুস সালিহীন ইত্যাদি। এ সকল কিতাব মানুষের বাতেনি রোগের চিকিৎসা বর্ণনা করে।

চিকিৎসার প্রয়োজন ও গুরুত্ব

দৈহিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষ শুধু বইপুস্তকের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে না। কেউ এ কথা ভাবে না যে, আমার ব্লাডপ্রেসার হয়েছে; সুতরাং বই দেখে এ রোগের ওষুধ ক্রয় করে সেবন করে নেব। তাতেই তা সেরে যাবে। বরং সে ওই বইয়ের সবচেয়ে বিশেষজ্ঞের নিকট দৌড়ে যায়। এমনকি এর চেয়ে বড় অন্য কোনো ডাক্তারের খবর শুনলে সেখানেও যায়। এমনিভাবে বাতেনি রোগের চিকিৎসার জন্যও শুধু কিতাব পড়লেই কাজ হবে না। এর জন্যও কোনো বিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত জরুরি।

এখানে মিষ্টার ইবলিস খুব সুন্দর একটি ধোঁকা দেয় যে, তুমি নিজেই তো সব কিতাব অধ্যয়ন কর; তাহলে অন্যের নিকট যাওয়ার প্রয়োজন কী? নিজেই নিজের শুদ্ধির চিকিৎসা করার চেষ্টা করো। স্মরণ রাখবেন, যারা নিজের রোগের চিকিৎসা নিজে করবে, তারা অতি দ্রুত মারা যাবে। বরং আমরা দেখেছি, ডাক্তার অসুস্থ হলে সে অন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। নিজের চিকিৎসা নিজে করে না। অথচ তার মধ্যে এই চিকিৎসার যোগ্যতা রয়েছে। তবু অন্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করায়, দেখুন তো আমার মধ্যে কী রোগ আছে? নিজের ব্যাপারে মানুষের রোগ নির্ধারণ সঠিক হয় না। নিজের প্রবৃত্তি নিজের কাছে সকল কথা সাজিয়ে উপস্থাপন করে। কারো নিজের নিকট নিজের দোষ দোষ মনে হয় না। নিজের ছোট একটা ইবাদত নিজের নিকট অনেক বড় মনে হয়। কাজেই মানুষ নিজের ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত ঠিক করতে পারে, না, নিজের চিকিৎসাও নিজে করতে পারে না।

যেমন– মনে করুন, এক লোকের ছেলের ডায়রিয়া হয়েছে। ছেলের মা বলছে, ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। তখন সে মনে-মনে ভাবল, ও তো সাধারণ একটা রোগ; আমি ডাক্তার দেখিয়ে একশো টাকা দেওয়া থেকে যদি একশো টাকার ওষুধ কিনে নিয়ে আসি, তাহলেই তো চলে। সুতরাং সে চিন্তা করল, ছেলের ডায়রিয়া হয়েছে, এতে তার হজমশক্তি লোপ পেয়েছে। সুতরাং আমি যদি কন্ট্রোলের ওষুধ নিয়ে আসি, তবেই তার রোগ ভালো হয়ে যাবে। সুতরাং সে একটি ফার্মেসিতে গিয়ে বলল, আমাকে কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ দাও। ডাক্তার দিয়ে দিল। ছেলেকে খাওয়াল। এবার ছেলের অবস্থা আরো কাহিল হলো। ছেলে মারা যাওয়ার উপক্রম হলো। ছেলের মা খুব বুদ্ধিমতী ছিল। ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার ওষুধ দিলেন। ছেলে ভালো হয়ে গেছে। এবার ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ছেলেকে কোনো ওষুধ খাইয়েছিলে? সে বলল, কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ খাইয়েছিলাম। তখন ডাক্তার বললেন, নিজে-নিজে চিকিৎসা করেছ, তাই তো ছেলের এই অবস্থা হয়েছে। ডায়রিয়া হলে আগে ডায়রিয়া কন্ট্রোল করার ওষুধ দিতে হয়। তারপর কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ খাওয়ালে রোগী সুস্থ হবে।

ঠিক তেমনিভাবে ভাই! মানুষ নিজের চিকিৎসা নিজে করলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে পতিত করবে। তোমার নফস তোমাকে বলবে, আরে! আগে চাহিদা পূরণ করে নাও। তারপর দেখা যাবে, কী করা যায়। কাজেই চিকিৎসার প্রয়োজন।

দৈহিক ও আত্মিক চিকিৎসার পদ্ধতি

দৈহিক চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্র রয়েছে। যেমন– ইউনানি, হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক। বর্তমানে আরেকটা নতুন চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে আকুপাংচার। এটা খুবই আশ্চর্য পদ্ধতি। এক ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা একটা সুঁই রোগীর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে এটা চিকিৎসা করে চলে আসে। এক লোকের ঘুম হচ্ছে না। ডাক্তার ওই চিকিৎসার একটা সুঁই ঢুকিয়ে দিলে সে নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো শুয়ে রইল।

যাহোক, দৈহিক রোগ হলে যার যে শাস্ত্রে ইচ্ছা চিকিৎসা করাবে। এটা তার ব্যাপার। চাই হোমিও হোক, চাই এলোপ্যাথিক হোক, চাই ইউনানি হোক। আসল উদ্দেশ্য হলো আরোগ্য পাওয়া। তেমনিভাবে রুহানি চিকিৎসার জন্য আল্লাহ বিভিন্ন পদ্ধতি রেখেছেন। চাই নকশবন্দি হোক, চাই কাদেরিয়া হোক, চাই চিশতিয়া হোক, চাই সোহরাওয়ার্দিয়া হোক; যেকোনো তরিকায় চিকিৎসা করুক তার শুদ্ধি হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ, প্রত্যেক তরিকা-ই সঠিক। প্রত্যেক তরিকা-ই যিকিরের মাধ্যমে বাস্তব শুদ্ধি করে দেয়।

দৈহিক ও আত্মিক খাবারসমূহ

মানুষ যদি ভালো খাবার খায়, তাহলে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যেমন– মানুষ অসুস্থ হলে প্রথমে তাকে আটার রুটি, তারপর যবের রুটি, জুস ইত্যাদি খেলে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এমনিভাবে রুহানি সুস্থতার জন্য তাকে খাবার দেওয়া হয়। যেমন– আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর, বুযুর্গদের ফয়েজ, তাজাল্লি, প্রশান্তি ইত্যাদি। সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষের দেহ মাটি দ্বারা তৈরী। তার খাবারও মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। আর তার রুহ বা আত্মা এসেছে ওপর থেকে। সুতরাং সেটার খাবারও ওপর থেকে আসে। অতএব এ সমস্ত মাহফিলে বসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মার খোরাক পরিবেশন করা হয়। এখানে রুহানি ব্যাধির চিকিৎসা হয়।

সঠিক চিকিৎসা না করার ক্ষতি

দৈহিক ব্যাধির ক্ষেত্রে তার ওপর চিকিৎসা না করলে পরিশেষে সেই ব্যাধি তার দেহের মৃত্যুর কারণ হয়। এমনিভাবে রুহানি ব্যাধির চিকিৎসা না

করলে তার ঈমানের মৃত্যু হয়। তার পাপাচার এমন বৃদ্ধি পায় যে, শেষ পর্যন্ত এমন কথা বলে, যার দ্বারা তার ঈমান চলে যায়। একবার আমি কতিপয় ইঞ্জিনিয়ারের বৈঠকে বসলাম। ইঞ্জিনিয়ার তার এক শ্রমিক ফোরম্যানকে ডাকল। ফোরম্যান এসে এমন কথা বলল যে, আস্তাগফিরুল্লাহ! তার কথা শুনে আমার শরীর শিউরে উঠল।

এরকম কথা বললে ঈমান নিরাপদ থাকে কী করে? কাজেই দৈহিক রোগের চেয়ে আত্মার চিকিৎসা করা বেশি জরুরি।

শারীরিক ও আত্মিক রোগের লক্ষণ

এটাও স্মরণ রাখবেন যে, দৈহিক রোগের আলামত থাকে। যেমন– যার হাইব্লাডপ্রেসার হয়, সে অনুভব করতে পারে, তার মুখ ফুলে যাচ্ছে। চেহারার রং লাল হয়ে যাচ্ছে, কানেও কেমন যেন লাগে। তখন ডাক্তার তাকে বলে আপনার হাইব্লাডপ্রেসার হয়েছে।

একজনের বারবার বাথরুমে যেতে হয়। তখন ডাক্তার বলবে, আপনার সুগার যাচ্ছে। একজন কিছুক্ষণ হাঁটার পরই অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে যায়। ডাক্তার তাকে বলবে, তোমার হৃদরোগ হয়েছে। এ সমস্ত আলামত দেখা দিলে চলাফেরা করা, কাজ করা ইত্যাদি তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

এমনিভাবে রুহানি ব্যাধিরও লক্ষণ আছে। যার রুহানি বিমার হয়, নেক আমল করা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। নামায, রোযা তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি আমলে মন বসাতেই পারবে না, সত্য কথা বলতে পারবে না, নিজের ভুল স্বীকার করা কঠিন হয়ে যাবে। সে বলে, আমাকে যে বোঝাবে তাকে আমি আমার শত্রু মনে করব। বোঝাতে গেলে আপনার কথার আগে সে কথা বলবে। বোনকে যদি বল, নামায পড়ো, তাহলে সে বলে, আগে তোমার স্ত্রীকে নামায পড়াও। সে একথা বোঝে না যে, আমি তো নামায পড়ছি না, আমার নামাযের জবাব তো আমাকেই দিতে হবে।

কাজেই ভাই! দৈহিক ব্যাধি থেকে আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা করা বেশি জরুরি। এই যে সেলসেলা বলা হয়, এটা আমাদের রুহানি ব্যাধির চিকিৎসার জন্য শিকল। এর দ্বারা আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে চিকিৎসা করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রথমে রোগী ছিলেন। পরে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসায় তাঁরা সুস্থতা লাভ করেছেন।

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کو ہادی بن گیا خود
وہ کیا منظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

'যিনি নিজে সঠিক রাস্তায় ছিলেন না, তিনি পরে পথপ্রদর্শক হয়ে গেলেন। এটি কেমন দৃশ্য ছিল, যিনি মুরদাকে জীবিত করে দিয়েছেন!'

রুহানিভাবে মৃত লোক এলে ঈমানের দৌলতে ধন্য হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। তারপর এদের কাছে তাবেয়ীগণ রুহানি চিকিৎসা করেছেন। এরপর তাবয়ে তাবেয়ীগণ। তারপর এই ধারাবাহিকতা জারি হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত এই সেলসেলা অটুট আছে। মানুষ তাদের বংশের ধারাবাহিকতা হিসাব করে রাখে, আমরা সৈয়দ বংশ, আমরা অমুক বংশ। আমরা মুহাম্মদ ইবনে হানীফার বংশ। এমনিভাবে আমাদের রুহানি ধারার মধ্যে আমাদের সমস্ত মাশায়েখের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কে কার নিকট থেকে সবক নিয়েছেন, তা বর্ণিত রয়েছে।

ওস্তাদহীন ভিত্তিহীন

ভাই! দীন শিক্ষার মাধ্যমে আসে। নিজেনিজে আসে না। অদ্ভুত কথা হলো, বর্তমান যুগে ইন্টারনেটে দীন শিক্ষা করা হয়। কতিপয় মানুষ তো শুনে-শুনে মুসলমান। তাদের কোনো ওস্তাদ নেই। এদিকে কথা শুনল, সেদিকে শুনল। পত্রিকায় পেল; ব্যস তার দীন শিক্ষা হয়ে গেল। তাই কোনো কবি বলেন–

ہر آں کارے کہ بے استاد باشد
یقین دانی کہ بے بنیاد باشد

ওস্তাদ ছাড়া যে কাজ হবে, নিশ্চিত জেনে রেখো, সেটা ভিত্তিহীন হবে।

তাছাওউফ কি বিদয়াত?

বর্তমানে কিছু লোক খুব সহজেই বলে দেয় যে, তাছাওউফ বা সাধনার যে পথ সেটা বিদয়াত। ভাই! এটি বিদয়াত কোথায়? এটি তো রুহানি চিকিৎসার পথ। শরীয়ত বলেছে, তোমাদের মধ্যে অহংকার থাকলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার বলুন, এই অহংকার কীসের মাধ্যমে দূর করবেন? যে-সাধনা অহংকার থেকে বাঁচার শিক্ষা দেয়, সেটি আজ বিদয়াত হয়ে গেল?

আত্মার ব্যাধির কুরআনি প্রেসক্রিপশন

ওলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছ গবেষণা করে কিছু আমল কুড়িয়ে আমাদের প্রেসক্রিপশন দিয়েছে। তোমরা এর ওপর আমল করো, তোমাদের রুহানি ব্যাধি আরোগ্য লাভ করবে। সেই আমলের উৎস হলো কুরআন ও হাদীছ। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, যারা আমাদের তরিকায় বাইয়াত হয়, তাদেরকে বলা হয়, এই ছয়টি আমল শুরু করো, এগুলোকে আমরা মামুলাত বলি। এগুলোর নির্দেশ কুরআনে বিদ্যমান। আমাদের মাশায়েখগণ ঈমানের নূরের মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করে হীরে-মুক্তার মতো আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। এবার এগুলোর কিছু ব্যাখ্যা শুনুন–

(১) প্রথমেই বলা হয়, সকালে একশোবার এবং বিকালে একশোবার দুরূদ শরীফ পাঠ করো। ভাই! এ দুরূদ শরীফের কথা তো কুরআনে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'নিশ্চয় আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীজির ওপর দুরূদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তার ওপর দুরূদ পাঠ করো এবং উত্তমভাবে সালাম প্রেরণ করো।'[১]

এবার বলুন صلوا কেমন ক্রিয়া? এটা আদেশসূচক ক্রিয়া। আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন। সুতরাং যে-বান্দা সকাল-সন্ধ্যা দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কুরআনের আদেশের ওপর আমল করল।

(২) সকাল-সন্ধ্যা ১০০ বার করে ইস্তেগফার করো। এবার দেখুন, কুরআনে ইস্তেগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

'তোমাদের প্রভুর নিকট ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল।'[২]

এখানে استغفروا কেমন ক্রিয়া? আদেশসূচক ক্রিয়া। আল্লাহর নির্দেশ, তোমরা ইস্তেগফার করো। এখন কাউকে সকাল-সন্ধ্যা ইস্তেগফারের কথা বলা হলে এটা বিদায়াত হলো কীভাবে? এটি তো কুরআনের ওপর আমল করা হলো।

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৫৬
২. সূরা নূহ : আয়াত ১০

(৩) কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এটিও তো কুরআনেই নির্দেশ। আল্লাহ বলেন–

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

'কুরআনে যা সহজ মনে কর তা তেলাওয়াত করো।'[১]

বলুন। اقرؤا কেমন ক্রিয়া? আদেশসূচক ক্রিয়া। আমরা কি এই আয়াতের ওপর আমল করতে চাই না? সুতরাং কাউকে দৈনিক এক পারা, আধা পারা তেলাওয়াতের কথা বলা এটা তো কুরআনের নির্দেশ। তাহলে বিদায়াত হলো কোথায়?

(৪) চলাফেরায়, শয়নে-জাগরণে সর্বদা আল্লাহর প্রতি ধ্যান রাখা। এটিও আল্লাহর নির্দেশ।

(৫) আল্লাহ বলেন–

فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

'দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো।'[২]

এখানে। اذكروا কেমন ক্রিয়া? আদেশসূচক ক্রিয়া। আল্লাহর নির্দেশ হলো, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে তাঁর যিকির করো। সুতরাং এটিও কুরআনি নির্দেশই। প্রমাণিত হলো,

(৬) ذكر قلبى বা মোরাকাবা করে। অন্তরে-অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকো। এই মনের যিকিরের কথাও কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ

'তোমার প্রভুকে তোমার অন্তরে স্মরণ করো।'[৩]

কীভাবে স্মরণ করবে? আল্লাহ বলেন–

تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

'অনুনয়বিনয় করে অত্যন্ত গোপনে।'[৪]

---

১. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ২০
২. সূরা নিসা : আয়াত ১০৩
৩. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫
৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫

তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআনে আল্লামা শফী (রহ.) বলেন, تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً দ্বারা ذكر قلبى প্রমাণিত হয়। এখানেও اذكر আদেশসূচক ক্রিয়া। তবে কি কাউকে ذكر قلبى এর নির্দেশ দিলে এটা বিদায়াত হলো?

(৭) মাশায়েখে কেরামের সান্নিধ্য গ্রহণ করো। পবিত্র কুরআনে পুণ্যবানদের সান্নিধ্য গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো।'[১]

এখানেও كونوا আদেশসূচক ক্রিয়া। সুতরাং এটিও কুরআনের নির্দেশমতোই হয়েছে। অতএব, প্রমাণিত হলো, আমাদের মাশায়েখগণের নির্দেশিত ছয়টি আমলই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

অথচ আজ কিছু কুচক্রী মহল এই পন্থাকে বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করছে। সুতরাং আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, আমাদের তরিকার বর্ণিত ছয়টি আমলই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যারা এ কাজকে বিদায়াত বলবে নিঃসন্দে তারা মূর্খ। তারা আলেম হতে পারে না। আলেম হলে এগুলোকে বিদায়াত বলত না। আরো স্মরণ রাখবেন, আমাদের মাশায়েখগণ নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেননি। কুরআন ও হাদীছ থেকে সংগ্রহ করেই আমাদের উপহার দিয়েছেন। এর ওপর আমল করো, আল্লাহ বরকত দান করবেন। ফলে আমাদের রুহানি রোগ থেকে শেফা পাব।

রুহানি ব্যাধিসমূহের হাকীকত

মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, বাস্তবেই কি রুহানি ব্যাধি হয়ে থাকে? এর জবাব হলো, হ্যাঁ ভাই! রুহানি বিমার হয়। পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা পর্দা করো। এমন যেন না হয় যে,

فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

'তোমাদের দেখে আকাঙ্ক্ষা করে ওই সমস্ত লোক, যাদের অন্তরে বিমার রয়েছে।'[১]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, গায়রে মাহরাম, তথা পরনারীকে দেখে যাদের লালচ হয়, কাম ভাবনা সৃষ্টি হয়, তাদের অন্তরে বিমার রয়েছে। এবার যদি সে মসজিদ থেকে নামায আদায় করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এদিকের মহিলার প্রতিও তাকায়, সেদিকেও তাকায়, তাহলে তো নিশ্চিত হয়ে গেল, তার অন্তরে রোগ রয়েছে। তারা আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে; তবে মহান পালনকর্তাকে ফাঁকি দেবে কীভাবে? তিনি তো সব দেখছেন, সবকিছু জানেন। বিমানে আরোহণ করে তুমি বিমানবালার প্রতি তাকাচ্ছ কিনা।

বাসে সফর করার সময় পথিক মহিলাদের প্রতি তাকাচ্ছ কিনা।

রাস্তায় চলতে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছ কিনা।

ব্যবসায়ী ভাই আগন্তুক গ্রাহকের প্রতি কীভাবে তাকাবেন ইত্যাদি।

এবার সুস্থ মস্তিষ্কে বিবেচনা করে দেখুন, রুহানি বিমার অবশ্যই আছে। অতএব রুহানি ব্যাধি যখন নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন তার চিকিৎসা করা একান্ত জরুরি। বরং বিজ্ঞানীরা বলেন, সবচেয়ে বড় রোগী সে, যে নিজেকে রোগী মনে করে না। কেননা, যাদের হেপাটাইটিস রোগ হলো, সে তার কোনো চিকিৎসা করল না; ভাবল, এমনিতেই সেরে যাবে, তাহলে কয়েক মাসের মধ্যে দেখবেন, তার অঙ্গ শুকিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে যায়। রুহানি ব্যাধির উদাহরণও এরকমই। যে-ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারল, আমার চোখ পবিত্র নয় অতঃপর তার চিকিৎসা করল না, কোনো আল্লাহওয়ালার শরণাপন্ন হলো না, পরিশেষে ওই ব্যক্তির ঈমান মারা যাবে। কেননা, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, খারাপ দৃষ্টির খুবই ক্ষতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবে না। মৃত্যুর সময় যাদের ঈমান নসীব হবে না, তাদের অধিকাংশ হলো যারা দৃষ্টিকে হেফাযত করতে পারে না।

একবার দৃষ্টি হেফাযত না করার পরিণাম সম্পর্কে কিছু ঘটনা আমার স্মরণ হলো। যেমন– হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) তাঁর শাগরেদদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। তখন তাদের সামনে দিয়ে এক সুদর্শন বালক আগমন করল। তাকে দেখে এক শাগরেদ বলল, হুজুর! এমন সুন্দর

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৩২

মানুষকেও কি আল্লাহ জাহান্নামে দেবেন? শায়েখ বললেন, মিয়া! তুমি এই বালকের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছ; সুতরাং তাওবা করো। সে বলল, না হুজুর! আমি এমনিই বলছি। সে তাওবা করল না। আল্লামা জাওযি (রহ.) বলেন, ওই লোকটি হাফেয ছিল। কিন্তু পরিণাম এমন হলো যে, বিশ বছর পর সে সারা কুরআন শরীফ ভুলে গেল। আল্লামা জাওযি (রহ.) আরেকটি ঘটনা বলেছেন। এক মুয়ায্যিন আযান দেওয়ার জন্য মিনারায় উঠল। এমন সময় পাশের বাড়ির এক যুবতির প্রতি তার খারাপ দৃষ্টি পড়ে গেল। এর পরিণামে সে মৃত্যুর সময় কালেমা হারিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল।

যাহোক এ সমস্ত ঘটনা স্মরণ করে আমার শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর! চুরি, ডাকাতি, হত্যা, জিনা ইত্যাদি গোনাহের ক্ষেত্রে ঈমান হারানোর কথা বলা হয়নি, অথচ সেগুলোর তুলনায় দৃষ্টি সাধারণ ব্যাপার, তাহলে এ খারাপ দৃষ্টির পরিণাম এত ভয়াবহ কেন? এতে ঈমান হারানোর আশঙ্কা কেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ ভাই! এখানে অন্যের প্রতি আসক্তি বিদ্যমান। আল্লাহ অন্যের প্রতি আসক্তি সহ্য করতে পারেন না। তুমি যখন অন্যের সৌন্দর্যের প্রতি তাকিয়ে আকৃষ্ট হলে, তখন আল্লাহ বলেন, তুমি সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হলে আর সুন্দরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে উদাসীন হয়ে গেলে। সুতরাং আমার দৃষ্টি তোমার ওপর থেকে সরিয়ে নিলাম। আপনারা দেখেন না, স্ত্রী তার স্বামীর সকল নির্যাতন সহ্য করে; কিন্তু তাকে রেখে স্বামী অন্যের প্রতি আসক্ত হবে এটা সহ্য করতে পারে না। আল্লাহর মোয়ামালাও এরকমই। নবীজি ইরশাদ করেছেন–

اَنَا اَغْيَرُ وُلْدِ اٰدَمَ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّى

'সমস্ত আদম সন্তানের মধ্যে আমি সবচেয়ে আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহ আমার চেয়ে আরো বেশি আত্মমর্যাদাশীল।'

কাজেই খারাপ দৃষ্টি অনেক বড় ব্যাধি। এ রোগ হলে দ্রুত চিকিৎসা করা দরকার। বাতেনি বিমারের আরেকটি দলিল হলো, আমরা যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন প্রথম তাকবীর বলে হাত বাঁধার পর থেকে যদি সালাম ফেরানো পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে থাকতে পারি; যেমন– বলা হয়েছে–

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

এভাবে ইবাদত করা যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, তাহলে আমাদের ঈমান শুদ্ধি হয়ে গেছে। আর যদি নামায শুরু করার পর থেকেই পেছনের

সমস্ত কাজ এসে তোমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহলে বুঝতে হবে, তোমার ভেতরে বিমার রয়েছে। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, বেচারা নামাযে থেকেই গোনাহের চিন্তা করতে থাকে। নাউযুবিল্লাহ!

একবার আমি কোনো এক শহরে এ-রকম নামাযের বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বয়ান শেষ করার পর সাদা দাড়ি ও সাদা চুল এবং ভ্রূবিশিষ্ট একজন আলেম এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, হুজুর! আমি বিগত চব্বিশ বছর যাবৎ বোখারি শিক্ষা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি যে-নামাযের কথা বললেন, এমন নামায আমার জীবনে কোনোদিন আদায় করতে পারিনি। যাক তার সঙ্গে আরো কথা হলো। আমি তাকে অনেক কিছু বোঝালাম। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, পাশের গ্রামে লা-মাযহাবীদের এক মাদরাসায় তিনি বোখারি শরীফের দরস দিচ্ছেন। তিনি ওই মাদরাসার শায়খুল হাদীছ।

এবার চিন্তা করুন, যেলোক চব্বিশ বছর যাবৎ বোখারি শরীফ শিক্ষা দিল, সে নিজে স্বীকার করছে, আমার জীবনে এমন নামায আদায় করতে পারিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নামায শিক্ষা করার জন্য কারো নিকট গিয়েছ? বলল, না। আমি বললাম, তাহলে তোমরা তাছাওউফের পন্থাকে বিদায়াত বলছ কেন, যে পন্থা অন্তরকে পরিষ্কার করে? একে বিদয়াত আখ্যায়িত করার জরুরত কী? আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে আসো। কিছুদিন তাদের সঙ্গে সময় দিয়ে দেখো তোমার নামাযের অবস্থা কেমন হয়। আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে সৃষ্টি হয়। এমন ভালোবাসা পাবে, যার ফলে তাহাজ্জুদের নামাযে সেজদা দিলে আর মাথা উঠাতে মন চাইবে না। আমাদের মাশায়েখগণ এরকম নামায আদায় করেন।

অতএব ভাই! দৈহিক ব্যাধির জন্য যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, তেমনি রূহানী ব্যাধির জন্যও চিকিৎসার প্রয়োজন। এমন যেন না হয় যে, বান্দা মৃত্যুর সময় ঈমানহারা হয়ে যায়।

ফিকহে যাহের ও ফিকহে বাতেন

শরীয়ত কিছু কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে আর কিছু কাজ না করার নির্দেশ দিয়েছে। যেগুলো করার নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলোকে مأمورات বা আদেশকৃত বিষয় বলা হয়। আর যেগুলো বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলো منهيات বা নিষেধকৃত বিষয় বলা হয়। আদেশকৃত বিষয় আবার দুই প্রকার। কতিপয় বিধানের সম্পর্ক বাহ্যিক বা যাহেরি আর কতিপয় বিধানের

সম্পর্ক বাতেনি। উদাহরণ দেখুন, নামায পড়ো। এর সম্পর্ক যাহেরি। রোযা রাখো যাহেরি, হজ করো যাহেরি, যাকাত যাহেরি, কুরবানি করো যাহেরি। এগুলোর সম্পর্ক যাহেরি।

কিছু বিধান আছে, যেগুলোর সম্পর্ক বাতেনি। যেমন– তাওয়াক্কুল করো। এর সম্পর্ক বাতেনি। ধৈর্য ধারণ করো। এটি বাতেনি। শুকরিয়া আদায় করো। এটি বাতেনি। কেননা, এগুলো বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। এগুলো মুমিনগণের অবস্থার নাম। এমনিভাবে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহও দুই প্রকার। কিছু বিষয়ের সম্পর্ক যাহেরি, কিছু বাতেনি। যেমন– শরীয়ত বলেছে, চুরি, ডাকাতি, মদ, গাজা জুয়া, যিনা, এগুলো করো না। এগুলোর সম্পর্ক যাহেরি। শরীয়ত আরো কিছু বিষয় নিষেধ করেছে। সেগুলোর সম্পর্ক বাতেনি। যেমন– বলা হয়েছে, হিংসা করো না। এবার বলুন তো, এটা কজনে দেখেন? একমাত্র আল্লাহই জানেন কার ভেতরে এই রোগ বিদ্যমান রয়েছে। কারো প্রতি বিদ্বেষ রেখো না। কে জানে কার ভেতরে কার প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে? অহংকার থেকে বেঁচে থাকো। এটাও বাতেনি রোগ, যা চোখে দেখা যায় না। এ সকল বিষয়ও শরীয়ত নিষেধ করেছে। অতএব যে সমস্ত বিধান বাহ্যিক দেখা যায়, চাই আদেশকৃত হোক বা নিষিদ্ধ হোক এগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় ফিকাহ বলা হয়, এগুলো যাহেরি ফিকাহ। আর যে সমস্ত বিধানের সম্পর্ক বাতেনি, সেগুলোকে তাছাওউফ বলে। আর এগুলোই হচ্ছে বাতেনি ফিকাহ।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

এসবকিছুর মাকসাদ হলো, যাতে মানুষের মনের বিমার দূর হয়ে যায়। কাপড়ে ময়লা লাগলে সেটা ধুতে হয়। এরও একটা নিয়ম আছে– পানি ঢালো, সাবান লাগও, ঘষা দাও, নিংড়াও; ময়লা দূর হয়ে যাবে। এমনিভাবে মানুষের অন্তরে গোনাহের ময়লা পড়ে। সেই গোনাহ দূর করার নাম হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

'নিশ্চয় সে কৃতকার্য হয়েছে, যে আত্মশুদ্ধি হাসিল করেছে।'[১]

সুতরাং যে-ব্যক্তি তার অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করে ফেলবে, সে কৃতকার্য হবে। এমনকি আল্লাহ এক জায়গায় সাতবার কসম খেয়ে বলেন,

---

১. সূরা আ'লা : আয়াত ১৪

আত্মশুদ্ধি হাসিলকারীরা কৃতকার্য হবে। একজন বিশ্বস্ত মানুষ একবার শপথ করলেই যথেষ্ট হয়, তার দ্বিতীয়বার শপথ করার প্রয়োজন হয় না। অথচ আল্লাহ একটানা সাতবার কসম খেয়েছেন

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ۝١

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝٢

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝٣

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝٤

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨

এরপর আল্লাহ বলেন–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩

সাতবার কসম খেয়ে বলছেন, যে-ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি হাসিল করবে, সে কৃতকার্য হবে। এবার আমরা নিজেরাই বিবেচনা করি যে, এই আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব কতখানি। আত্মশুদ্ধি নবুওতের মাকসাদের একটি অংশ। কেননা, নবীজির আগমনের সময় নবুওতের চারটি মাকসাদ বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো

وَيُزَكِّيْهِمْ

'তিনি তাদের আত্মশুদ্ধি করে দেবেন।'

এতেও প্রমাণিত হয়, বাস্তবিকভাবেই মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সাধনা করা জরুরি এবং এর প্রচেষ্টায় লেগে থাকা আবশ্যক।

তাছাওউফ একটি হাকীকত

একথাটি আপনাদের সামনে অন্যভাবে উপস্থাপন করছি। একটি বিষয় হলো নবুওতের শিক্ষা, আরেকটি হলো নবুওতের অবস্থা। নবুওতের শিক্ষাকে

শরীয়তের ইল্‌ম বলে। আর নবুওয়তের অবস্থাসমূহকে علم الاحسان বলে। এই এলমে এহসানের আরেক নাম তাছাওউফ। ভাই! আমরা একে তাছাওউফ বলে দিলাম। এই নামের কারণে যদি আপনার রাগ এসে যায়, তাহলে আপনি একে علم الاحسان কিংবা تزكية বলে দিতে পারেন। এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কারণ, এটি কুরআন-হাদীছের শব্দ। আল্লাহ বলেছেন–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

'আল্লাহ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।'[১]

এবার আপনার পছন্দের নাম দিলেও আল্লাহ যেটি চয়ন করেছেন, সেটিই প্রসিদ্ধি পাবে। এমনিভাবে তাছাওউফ নামটিও প্রসিদ্ধি পেয়ে গেছে। নতুবা প্রাথমিক অবস্থায় একে علم الاحسان ই বলা হতো। تزكية এর ইল্‌মই বলা হতো। ভাই! নাম দিয়ে কাম কী? মূলত তার হাকীকত দেখা চাই। কোনো বস্তুর নাম কেউ A কেউ B কেউ C বলে অখ্যায়িত করে। এতে বস্তুর কী হলো? সে তো একটা বস্তুই রয়ে গেল। সুতরাং তাছাওউফও একটি হাকীকত। এটি মেনে নেওয়া ব্যতীত উপায় নেই।

নামায শিক্ষা করে পড়ো

যারা তাছাওউফের বিরোধিতা করে, এমন বান্দা কখনো অন্তকে হাজির করে নামায আদায় করতে পারবে না। নামায পড়বে; কিন্তু মনের বিভিন্ন ধারণা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। এবার যদি এমন নামায প্রেরণ করতে চান, তাহলে এটি আপনাদের ইচ্ছা। নতুবা নামায শিক্ষা করার চেষ্টা করো। হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.) হযরত শাহ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হুজুর! আমি আপনার দরবারে এ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি যে, আমাকে সাহাবায়ে কেরামের একটি নামায পড়িয়ে দেবেন। আর বাইয়াতের আসল উদ্দেশ্যও এটিই। কত সুন্দর কথা! তখন শায়খ বললেন, ঠিক আছে। রাতের বেলা এখানে এসো। আমি শায়খের দরবারে অবস্থান করলাম। রাতের শেষ প্রহরে তিনি নাম ধরে ডাক দিলেন, ইসমাঈল! ঘুম থেকে উঠেছ? বললাম, জি হুজুর! তিনি বললেন, যাও; আল্লাহর জন্য উজু করো। তিনি বলেন, শায়খ যখন বললেন, যাও; আল্লাহর

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৪

জন্য উজু করো, তখনই আমার অন্তরে আল্লাহর সত্তার উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলাম। আল্লাহই জানেন শায়খের একথার মধ্যে কী প্রভাব ছিল! আমার অন্তর নরম হতে লাগল। চোখ দ্বারা অঝোরধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আমি উজু করে আরজ করলাম, জি হুজুর! অজু করেছি। বললেন, যাও; আল্লাহর জন্য দু-রাকাত নামায আদায় করো। শায়খের কথায় আমি নামাযে দাঁড়ালাম– আল্লাহু আকবার। আল্লাহর জন্য দু-রাকাত নামায আদায় করো। এর মধ্যে কী রহস্য লুকায়িত ছিল তা আমি বলতে পারব না।

আমি নামাযের নিয়ত করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সারা দুনিয়ার সব কিছু আমি ভুলে গেলাম। একেবারে শেষ পর্যন্ত আমার অন্তরে শুধু আল্লাহর ধ্যানই ছেয়ে ছিল। আমি নামায আদায় করলাম। আমার জীবনে এমন নামায কোনো দিন আদায় করিনি।

এক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞেস করল, হুজুর! নামাযের মধ্যে আমাদের যেমন দুনিয়ার বিভিন্ন ধারণা এসে উপস্থিত হয়, এভাবে কি আপনারও হয়? তিনি বললেন, শুধু নামাযে নয়, বরং নামাযের বাইরেও দুনিয়ার কোনো চিন্তা আমাকে আল্লাহর ধ্যানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না। এটিই হলো আত্মশুদ্ধির উপকারিতা। ভাই! আমাদেরও তো মন চায়, জীবনে এমন দু-রাকাত নামায আদায় করি, যার মধ্যে একমাত্র আল্লাহর ধ্যান ছাড়া কিছু উপস্থিত থাকবে না। আহ! যদি এমন নামায আদায় করতে পারতাম! স্মরণ রাখবেন, বুযুর্গদের সান্নিধ্য ছাড়া এমন নামাযের সৌভাগ্য হয় না। অনেক লোক এসে বলে, হুজুর! চেষ্টা করি; কিন্তু এমন নামায আদায় করতে সক্ষম হই না। নফস ও শয়তান এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং চেষ্টা করতে হবে, যাতে নবীজির অনুগ্রহ আমাদের সৌভাগ্য হয়। নবীজি হযরত বেলাল (রাযি.)কে বললেন–

أَرِحْنِيْ يَا بِلَالُ

'হে বেলাল! আমার চোখকে ঠান্ডা করো আযানের মাধ্যমে।'

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ আযানের ধ্বনি বেজে উঠল। তিনি মসজিদে চলে যাচ্ছেন। কোনো প্রয়োজনে আমি সামনে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বললাম, আমি আয়েশা। আয়েশা কে? আবু বকরের মেয়ে। আবুবকর কে? তখন আমি বুঝে গেলাম, আযানের ধ্বনিতে আল্লাহর ভালোবাসা তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

ইল্‌মে শারায়ে' ও ইল্‌মে ইহসান বা তাছাওউফ

নবীজির যে-সমস্ত শিক্ষা তাঁর মুবারক জবান থেকে শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিক্ষা করেছেন আর পরবর্তী কালে সেগুলো হাদীছের রূপ ধারণ করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে ইল্‌মে শারায়ে' বা শরীয়তের জ্ঞান বলে। যে-সমস্ত অবস্থা সাহাবায়ে কেরাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসে অবলোকন করেছেন আর সেগুলো তাঁদের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেগুলোকে ইল্‌মে ইহসান বা তাছাওউফ বলে। এবার যারা তাছাওউফের এই অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, তাদের জন্য এ-সমস্ত রেওয়ায়েতই যথেষ্ট। এতে তাদের চোখের পর্দা অপসারিত হয়ে সুস্পষ্ট অনুভূতি আসবে।

মুনাফিকির ভয়

হযরত হানযালা (রাযি.) ঘরে বসে-বসে ভাবছেন, নবীজির সামনে বসলে আমার অন্তরের যে-অবস্থা হয়, বাড়িতে বিবি-বাচ্চার সামনে বসলে তো আমার হৃদয়ের সেই অবস্থা থাকে না। তাহলে তো আমার হৃদয়ে মুনাফিকির ছাপ আছে। এই ভেবে তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হানযালা তো মুনাফেক হয়ে গেছে। একথা বলতে-বলতে নবীজির দরবারে চলে গেলেন। রাস্তায় হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

কোথায় যাচ্ছ হানযালা?

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে।

কেন?

ভাই! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।

কীভাবে?

কারণ, নবীজির সামনে থাকলে অন্তরের যে-অবস্থা হয়, বাড়িতে এলে সেই অবস্থা থাকে না। তাই এটা মুনাফিকির আলামত মনে করছি।

এবার আবুবকর (রাযি.) বললেন, ভাই! আমারও তো একই অবস্থা। তাহলে চলুন; আমিও যাব। উভয়ে মিলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, এটা নবীর দরবারের প্রভাব। বাইরে গেলেও যদি তোমার এই অবস্থা থাকে, তাহলে রাস্তায় ফেরেশতারা এসে তোমার সঙ্গে মুসাফাহ করবে, হাত মিলাবে।

একটি প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক জবাব

ছাত্রদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান কি ঘরে থাকতে কমে যেত আর নবীজির দরবারে গেলে বেড়ে যেত? এর জবাব হলো, বিষয়টা কখনো এরকম নয়। তাঁদের ঈমান অবশ্যই পূর্ণ ছিল। তবে বাহ্যিক পার্থক্য হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। উদাহারণস্বরূপ দেখুন, সমুদ্রে যখন জোয়ার-ভাটা কিছু থাকে না, তখন তার অবস্থা সমতল ছাদের মতো হয়। কিন্তু পূর্ণিমার সময় যখন সমুদ্রে জোয়ার এসে যায়, তখন সমুদ্রের পানি পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে যায়। অথচ সমুদ্রের পানি তো ভাই! সমানই আছে। ঠিক তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান নিজের ঘরে থাকা অবস্থায় সমুদ্রের সমতল পানির মতো আর যখন তাঁরা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের সূর্য দেখতেন, তখন তাদের ঈমানে উত্তাল সৃষ্টি হয়ে যেত। তাই পার্থক্য দেখা যেত।

ফেকাহ্ ও তাছাওউফের ঈমান

যারা শরীয়তের ইল্‌ম শিক্ষা দেন, তাদেরকে বলা হয় উলামায়ে কেরাম। আর যারা এল্‌মে এহসান শিক্ষা দেন, তাদেরকে বলা হয় মাশায়েখে কেরাম এবং কুরআন ও হাদীছে তত্ত্ব ও গবেষণা করে যারা মাসায়েল বের করেছেন, তাদেরকে বলা ফিকহের ইমাম। তৎকালের মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাঁদের অনুসরণ করতেন। কারণ, তাঁরা কুরআন ও হাদীছের সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে ওলামায়ে কেরামকে উপহার দিয়েছেন। তাদের এ-কাজ কুরআন-হাদীছের মোতাবেক ছিল। কুরআন মাজীদেই এর জন্য স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার হয়েছে

يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ

'তারা সংগ্রহ করে।'

অতএব যারা এলমে এহসানে ডুব দিয়ে রুহানি ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা ও জবাব বের করেছেন, তাদেরকে তাছাওউফের ইমাম বা মাশায়েখ বলা হয়।

রংবিক্রেতা ও রংমিস্ত্রী

ভাই! কুরআন-হাদীছ হলো রং আর ওলামায়ে কেরাম হচ্ছেন রংবিক্রেতা এবং মাশায়েখে কেরাম হলেন রংমিস্ত্রী। ওলামায়ে কেরাম মানুষদের মাসায়েলের বিস্তারিত বিবরণ বলে দেন যেন তারা রং বিক্রয় করছেন।

বাজারে রংমিস্ত্রীর দোকান থাকে। তুমি কোনো কিছু রং করাতে হলে তাদের নিকট নিয়ে যাবে; তারা সেটা রং করে দেবে। অতএব স্মরণ রাখবেন, কুরআন ও হাদীছ হচ্ছে রং। ওলামায়ে কেরাম রংবিক্রেতা আর মাশায়েখে কেরাম রংমিস্ত্রী। সুতরাং যারাই মাশায়েখে কেরামের সান্নিধ্যে আসবে, তাদেরকে মাশায়েখগণ রঙিন করে দেবেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

'আল্লাহর রং। আল্লাহর রং থেকে উত্তম কোনো রং নেই।'[১]

যিকিরকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার হুকুম

আল্লাহ আমাদেরকে ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে কেরাম উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে মাসায়েল শিক্ষা করো এবং মাশায়েখগণের সঙ্গে সম্পর্ক করে ইল্‌মে বাতেন শিক্ষা করো। আল্লাহ বলেন–

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾

'যদি তোমরা না জান, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।'[২]

এখানে ওলামায়ে কেরাম اهل ذكر দ্বারা আহলে ইল্‌ম উদ্দেশ্য বলেছেন। এখানেও اسئلوا আদেশসূচক ক্রিয়া। এর উদ্দেশ্য হলো ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তাদের থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করো। শরীয়তের বিধান শেখো, আমাদের প্রত্যেককে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এমনিভাবে নির্দেশ হচ্ছে–

اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীগণের সান্নিধ্য গ্রহণ করো।'[৩]

দেখুন, এখানে كُوْنُوْا আদেশসূচক ক্রিয়া, এতে প্রতিভাত হয় যে, মাশায়েখগণের সান্নিধ্যে আসার হুকুম দেওয়া হয়েছে। মাদরাসায় গিয়ে ওলামায়ে কেরামের নিকট শরীয়তের মাসায়েল শিক্ষা করব এবং খানকায়

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩৮
২. সূরা নাহল : আয়াত ৪৩
৩. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

গিয়ে মাশায়েখে কেরারে কাছে এল্‌মে বাতেন শিক্ষা করব। তবে কোনো-কোনো মাশায়েখ উভয় ক্ষেত্রে মাণিক্য ছিলেন। তারা যেন مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ এর মতো ছিলেন। যাহেরি ইল্‌মে ছিলেন ইল্‌মের পাহাড় এবং বাতেনি ইল্‌মেও ছিলেন পরিপূর্ণ। যেমন– কাসেম নানুতবি (রহ.), রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.), শায়খুল হিন্দ (রহ.), হযরত মাদানী (রহ.) প্রমুখ। তারা উভয় ক্ষেত্রে ইমাম ছিলেন। সুতরাং যাহেরি ইল্‌ম শিক্ষার স্থান হলো মাদরাসা এবং বাতেনি ইল্‌ম শিক্ষার স্থান হলো মাশায়েখে কেরামের খানকা।

শরীয়ত ও তাছাওউফ উভয় ক্ষেত্রে ইমাম চারজন কেন?

এটি আল্লাহরই নীতি। দেখুন, আল্লাহ আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন ৪টি– তাওরাত, যাবুর, ইনজীল, কুরআন। নবীজির প্রধান খলিফা ৪ জন– আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাযি.)। এরপর দেখুন অনেক ইমামের অনুসরণ করা হতো। যেমন ইমাম আওযায়ি, সুফিয়ান ছাওরি ও হাম্মাদ (রহ) প্রমুখ। কিন্তু আল্লাহ কয়জনকে কবুল করেছেন? চারজনকে। ইমাম আবুহানীফা, ইমাম শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)।

এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে, দীনের মধ্যে এ চার ইমাম কেন? এর জবাব এভাবেই দেওয়া হবে যে, যদি কারো ১২ জন সন্তান থাকে, আর মরতে মরতে চারজন বাকি থাকে, তাহলে তার ত্যাজ্যসম্পত্তি কজনের মধ্যে বণ্টন হবে? চারজনের মধ্যে। এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে, চারজনের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন হবে কেন? তাহলে জবাব দেওয়া হবে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা। সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নেরও জবাব হলো, এটি আল্লাহর ইচ্ছা। এটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপার। এমনিভাবে এল্‌মে এহসান বা তাছাওউফের ক্ষেত্রে ইমাম চারজন। তাঁদের একজন হলেন শায়খ আবদুল কাদের জিলানি, একজন শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি, একজন শায়খ বাহাউদ্দীন নকশবন্দি, একজন শায়খ খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)। এর পর যার-যার নাম অনুসারে তরিকা প্রসিদ্ধ হয়ে গেল

এসব হাদীস নয় ১/৮০

ইল্‌মুল ইহ্‌সান বা তাছাওউফের প্রমাণ

যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাছাওউফের ভিত্তি কোথা থেকে এল? ইল্‌মে শরীয়তের ব্যাপারে তো নবীজি ইরশাদ করেছে–

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম শিক্ষা করো।'

তিনি আরো বলেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ

'এল্‌মে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক নর ও নারীর ওপর ফরজ।'

তবে ইল্‌মে ইহসানের ভিত্তি কোথায়? হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত বোখারি শরীফে একটি হাদীছ রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম একে হাদীছে জিবরাঈল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবীজির দরবারে বসে আছি। এমন সময় একলোক আগমন করল। তার জামাকাপড় খুব পরিষ্কার। মাথার চুল কালো। গায়ে কোনো প্রকার ময়লা নেই। এতে বোঝা যায়, সে বেশি দূর থেকে আসেনি। কেননা, দূর থেকে এলে তার গায়ে ধুলাবালি থাকত। ক্লান্তি ও অবসন্নতার লক্ষণ থাকত। সে খুবই পরিচ্ছন্ন ছিল। এভাবে আসার কারণে আমরা ভাবলাম, অবশ্যই সে কাছে থেকেই এসেছে। কিন্তু তখন যারা বসা ছিল কেউ তাকে চেনেনি। এতে প্রমাণিত হয়, আগন্তুক নিকটবর্তী কোনো লোকালয়ের নয়। কাছের হলে তো কেউ-না-কেউ তাকে চিনত। তিনি বলেন, এতে আমরা খুব অস্থির। সে এসে নবীজির সম্মুখে নিজের হাঁটুর সঙ্গে নবীজির হাঁটু মিলিয়ে বসে গেল। এরপর নবীজিকে প্রশ্ন করল–

مَا الْاِيْمَانُ

ইমাম কাকে বলে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঠিক জবাব দিলেন।

সে বলল

صَدَقْتَ

আপনি সঠিক বলেছেন।

তার কথা শুনে আমরা অবাক। এটা কী ব্যাপার! এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যেন সে কিছুই জানে না আবার জবাব শুনে বলল, আপনি সঠিক বলেছেন। এতে বোঝা যায়, সে আগে থেকেই ইমান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। তারপর জিজ্ঞেস করল–

مَا الْاِسْلَامُ

ইসলাম কী?

উত্তর শুনে তিনি বললেন।

صَدَقْتَ

আপনি সত্য বলেছেন।

আমরা আরও বিস্মিত হলাম।

তারপর প্রশ্ন করল

مَا الْإِحْسَانُ

ইহসান কী?

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তোমার এমন অবস্থা না হয়, তাহলে এভাবে ইবাদত করো যেন তিনি তোমাকে দেখছেন।

উত্তর শুনে এবারও সে বলল–

صَدَقْتَ

আপনি সত্য বলেছেন।

এতে আমরা আরো বেশি হতভম্ব হলাম।

ভাই এ হচ্ছে এহসান। এই এহসান শব্দ স্বয়ং আল্লাহ পছন্দ করেছেন। সেই অচেনা লোক এই তিনটি প্রশ্ন করে চলে গেল। নবীজি আমাদের বললেন–

هٰذَا جِبْرَائِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ

'ইনি জিবরাঈল; তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।'[১]

কেননা, কোনো-কোনো লোক সবকিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। তাই আল্লাহ তাকে মাধ্যম বানিয়ে সব কিছু তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এবার দেখুন। নবীজি নিজেই বলেছেন–

---

১. মুসলিম ১/২

يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ

'তোমাদের দীন শিক্ষা দিচ্ছেন।'

সুতরাং ইল্‌মে এহসান দীনের একটি অংশ। সুতরাং যারা বলে, এটা বিদয়াত, তাদের এই কথায়ই অনুধাবন করা যায়, তাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান কতটুকু রয়েছে। কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে তাদের দক্ষতা কতখানি। অতএব, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো, ইল্‌মে এহসান বা তাছাওউফ এটি বাতেনি গুণ। এটিই আত্মশুদ্ধি বা ইল্‌মুল ইহসান। এটি দীনের বহির্ভূত বিষয় নয়।

হাদীছে জিবরাঈল-এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর ওপর এক নজর

এবার এই হাদীছে একটু গভীর মনোযোগ দাও। এখানে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন করা হয়েছে। (১) ঈমান (২) ইসলাম (৩) ইহসান। এবার দেখুন :

ঈমান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা হলো মানার বিষয়। ঈমান বলা হয় মেনে নেওয়াকে।

ইসলাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা হলো আমল করা সম্পর্কে।

ইহসান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা হলো অনুধাবন করা সম্পর্কে। সুতরাং যদি অনুধাবন ছাড়া ঈমান হয়, তাহলে সেটা দুর্বল হবে। আর অনুধাবনসহ থাকলে সেটা হবে দৃঢ় ও মজবুত। দুজন লোক বিতর্ক করছে। একজন বলল, আমি কিছু সময়ের জন্য আমাকে মুসলমান মনে করলাম। আর তুমি কিছু সময়ের জন্য তোমাকে কাফের মনে করো। তখন সে বলল, ঠিক আছে; আমি তা মেনে নিলাম। ওলামায়ে কেরাম বলেন, এই গ্রহণকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে। কারণ, সে কুফরিকে কিছু সময়ের জন্য স্বীকার করেছে। এটা কেন হলো? তার বুঝ কম। কেননা, সে একথা বুঝতে পারছে না যে, কিছু সময়ের জন্য আমি কুফরি মেনে নিলে কাফের হয়ে যাব। ভাই! এই ঈমান আমাদের পরনের পোশাকের মতো। পোশাক খুলে নিলে যেমন তাকে উলঙ্গ বলা হয়, তেমনি ঈমান খুলে নিলে সে কাফের হয়ে যায়। আল্লাহ এমন কথা থেকে আমাদের হেফাযত করুন।

একটি কথা স্মরণ রাখবেন যে, বুঝেশুনে ঈমান গ্রহণ করলে সেটি মজবুত হয়। বস্তুর মূল্য যার জানা নেই, সে বস্তুর হেফাযত করবে কীভাবে?

শেখ সাদী (রহ.) বলেন, শৈশবকালে আম্মাজান আমার আঙুলে একটি সোনার আংটি পরিয়ে দিলেন। সেটি নিয়ে আমি বাইরে গেলাম। এক প্রতারক আমার নিকট এসে তার হাতে রাখা গুড় আমাকে খেতে দিল। আমি

সেটা চুষলাম। তখন সে বলল, এবার তোমার হাতের আংটিটা চুষে দেখো তো এর মতো মিষ্টি লাগে কিনা। আমি আংটিটা চুষে বললাম, না। এবার সে বলল, তাহলে এই মিষ্টি গুড় নেবে? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন সে বলল, তাহলে তোমার হাতের এই আংটিটা দিয়ে দাও।

আমি সোনার আংটিটা দিয়ে গুড়ের পোটলা নিয়ে গেলাম।

অতএব ভাই! যারা না বুঝে ঈমান গ্রহণ করবে, তাদের ঈমানের এই অবস্থা-ই হবে। অতি শীঘ্র তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই জেনে রাখবেন, এহসান হলো ঈমানের সংরক্ষণকারী। এহসানপূর্ণ ঈমান যে হাসিল করেছে, সে অতি সহজে ঈমানহারা হবে না।

আল্লামা মোল্লা জিওন (রহ.) বলেন, ঈমানের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মৃত্যুর সময়। তখন শয়তান এসে বিভিন্ন প্রকার কুফরি বিষয় তার সামনে সুশোভিত করে তোলে, নানাভাবে প্রতারণা দেয়, যাতে সে ঈমানহারা হয়ে যায়। সুতরাং ভাই! যাদের ঈমানের সঙ্গে এহসান আছে, মৃত্যুকালে তাদের ঈমান হেফাযতে থাকবে। তখন তোমাদের যাহেরি দলিল কাজে আসবে না।

মৃত্যুকালে শয়তানের আক্রমণ

এক শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযি (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মৃত্যুর সময় শয়তান এসে তাঁকে বলতে লাগল, ফখরুদ্দীন! আল্লাহ বলতে কেউ নেই। তুমি কেন আল্লাহ বিশ্বাস করছ? তিনি আল্লাহর অস্থিত্ব সম্পর্কে দলিল পেশ করলেন। শয়তান তার দলিল খণ্ডন করে দিল। তিনি পুনরায় আরেকটি দলিল দিলেন। শয়তান সেটিও খণ্ডন করে দিল। এভাবে তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর ১০০টি দলিল পেশ করলেন। শয়তান সব কটি দলিলের উল্টা যুক্তি দিয়ে সেগুলো খণ্ডন করে দিয়েছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর অলি ছিলেন। আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। ওই সময় তাঁর শায়খের চেহারা তাঁর সামনে ভেসে উঠল। শায়খ ওই সময় আল্লাহর সান্নিধ্যে অন্তরদৃষ্টিবান ছিলেন। তিনি রাযিকে বললেন, ফখরুদ্দীন! তুমি বলে দাও, বিনা দলিলে আল্লাহ এক। আল্লাহ এক হওয়ার জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এ কথা বলার পর শয়তান তার সামন থেকে চলে গেল। তার ঈমান হেফাযত হয়ে গেল, তার একথা খণ্ডন করার মতো কোনো যুক্তি শয়তানের নিকট রইল না।

অতএব ভাই! মৃত্যুর সময় ঈমানের ওপর শয়তানের হামলা হয়। তখন ঈমানের সঙ্গে এহসান থাকলে ঈমানের হেফাযত হয়। এজন্যই বর্ণিত আছে, আমাদের মাশায়েখগণ মৃত্যুর সময় হাসতে-হাসতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ শয়তানকে দূরে রেখেছেন। দুনিয়ার নিয়মও এটাই যে, কারো প্রিয়জনের নিকট চোর ডাকাত আসতে কেউ পছন্দ করে না। তেমনিভাবে আল্লাহও তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাযত করেন।

সুতরাং ভাই! এই ঈমান সারক্ষণের জন্য। আমরা এক সেকেন্ডের জন্যও বলতে পারব না, আমরা ঈমান ছেড়ে দিলাম। কাজেই আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর গোলামিকে আঁকড়ে ধরব।

শরীয়তই হচ্ছে মূল

তরীকত হলো মূলত শরীয়তের সংরক্ষক বা খাদেম। এটি শরীয়তের বাইরের কোনো বিষয় নয়। এহসান বা তরীকত থাকলে তোমার নামাযের হেফাযত হবে, রোযার হেফাযত হবে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে। মূল বিষয় তো হলো শরীয়ত।

পুণ্যবানদের সান্নিধ্য রিয়াবিহীন ইবাদত থেকে উত্তম

একবার পাকিস্তানের প্রধান মুফতী আল্লামা শফী সাহেব (রহ.) আল্লামা থানবি (রহ.)কে বললেন, হুজুর! কবিগণ মনের আবেগে অনেক কিছু বলে ফেলে। কিছু বিষয়ে শিথিলতা করেন আবার কিছু বিষয়ে অতিরঞ্জিত করেন। তিনি বললেন, কীভাবে? বললেন, দেখুন, আল্লামা রুমী (রহ.) বলেছেন–

یک زمانہ صحبت با اولیا

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

'আউলিয়ায়ে কেরামের এক মুহূর্তের সান্নিধ্য শত বছর রিয়াবিহীন ইবাদতের চেয়েও উত্তম।'

এখানে তো অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আল্লাহওয়ালাদের এক মুহূর্তের সান্নিধ্য শত বছর রিয়াবিহীন ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় কীভাবে? শুধু বছরের ইবাদত বললেও মেনে নেওয়া যেত। তখন আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমি এই কবিতাটি পাঠ করি।

তিনি পাঠ করলেন–

یک زمانہ صحبت با اولیا

بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا

'আল্লাহওয়ালাদের এক মুহূর্তের সান্নিধ্য লাখ বছর রিয়াবিহীন ইবাদতের চেয়েও উত্তম।'

এবার তিনি আরো অবাক হলেন। একশ বছরে কথা আমি মেনে নিতে পারছি না। আর তিনি বলছেন লাখো বছরের চেয়ে উত্তম। ফলে থানবি (রহ.) তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, দেখো, লাখো বছর রিয়াবিহীন ইবাদত করার পরও কেউ ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারবে বলে কোনো নিশ্চয়তা নেই। শয়তান হাজার বছর ইবাদত করে পরিশেষে অভিশপ্ত হলো। বালআম বাউরা তিনশো বছর ইবাদত করে লাথি খেয়ে অলির তালিকা থেকে বের হতে হলো। সুতরাং এভাবে হিসাব করলে বলা যাবে, লাখো বছর ইবাদত করলেও কেউ নিশ্চিত হতে পারবে না, সে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারবে। কিন্তু যারা আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে, তাদের ব্যাপারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

هُمْ رِجَالٌ لَايَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

'তারা (অলিরা) এমন লোক যাদের সাথিরা হতভাগা হবে না।'

আর হতভাগা কারা হয়? যারা মৃত্যুর সময় ঈমানহারা হয়। সুতরাং যাদের ব্যাপারে নবীজি সাক্ষ্য দিয়েছেন, এরা হতভাগা হবে না। এর মর্ম হলো, তারা মৃত্যুর সময় ঈমানহারা হবে না। আল্লাহ তাদের ঈমান হেফাযত করবেন। সুতরাং লাখো বছর ইবাদতের ব্যাপারে ঈমান নিয়ে যাওয়ার গ্যারান্টি নেই। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যের ব্যাপারে নবীজি গ্যারান্টি দিয়েছেন। অতএব আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যই উত্তম।

নিয়তের এখলাছের নাম তাছাওউফ

যারা বলে, তাছাওউফ বিদয়াত, আমি তাদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। বলুন তো ভাই! আমলের ভিত্তি কীসের ওপর? বোখারি শরীফের প্রথম হাদীছ হলো

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

সুতরাং নিয়ত সংশোধন করা জরুরি কিনা? বেচারা বোখারি শরীফের নাম তো শুনেছে; তাহলে কত ভালো হতো যদি সে বোখারি শরীফের প্রথম হাদীছের ওপর একটু গবেষণা করত। সেখানে বলা হয়েছে, সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর নিয়তকে খাঁটি করার নাম হচ্ছে তাছাওউফ। আমাদের মাশায়েখগণ দীর্ঘ আট/দশ বছর তাদের শায়খের খেদমত করার পর বলতেন, এইমাত্র আমাদের নিয়তটা সামান্য সংশোধন হয়েছে। এই নিয়ত ছোট একটি শব্দ। কিন্তু সেটি অর্জন করা এত সহজ নয়। এটি মাশায়েখে কেরামের জুতা বহন করার মাধ্যমে হাসিল হয়। আরো স্মরণ রাখবেন, ভারতবর্ষে ইসলাম এসেছে মাশায়েখগণের মাধ্যমে। আর এ দেশে ইসলাম আলোকিত হয়েছে ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে। এজন্যই আমরা ওলামায়ে কেরামকেও মূল্যয়ন করি এবং মাশায়েখে কেরামকেও সম্মান করি।

তাছাওউফের সেলসেলাগুলোর স্তর

তাছাওউফের সমস্ত সেলসেলার গন্তব্য এক। এটা কীভাবে? দেখুন, পাহাড়ের চূড়ায় একটা ঘাঁটি নির্মাণ করা হলো। কিন্তু সেখানে আরোহণ করার জন্য পাহাড়ের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রাস্তা প্রস্তুত করা হলো। এবার সব রাস্তার গন্তব্য কী? পাহাড়ের চূড়ার ঘাঁটি। তেমনিভাবে আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন সেলসেলা দেখা গেলেও সব সেলসেলার গন্তব্য এক। সেটা হলো আল্লাহকে পাওয়া। শায়খুল ইসলাম (রহ.) বলেন, কেউ নকশবন্দি, কেউ কাদেরি, কেউ সোহরাওয়ার্দি, কেউ চিশতি। যদি অন্তরে এক খোদার স্মরণ থাকে, তাহলে সবই হবে। নতুবা কিছুই নয়। সুতরাং সব সেলসেলার মাকসাদ হলো আল্লাহকে পাওয়া আর আল্লাহকে পেতে হলে নিয়তকে খাঁটি করা প্রয়োজন। আর নিয়তকে খাঁটি করতে হলে মাশায়েখের সান্নিধ্য আবশ্যক। আর এ নিয়তের প্রেক্ষিতেই আমলের প্রতিদান পাওয়া যায়।

গোসল করার মধ্যে নিয়তের প্রভাব

শায়খুল হাদীছ (রহ.)-এর আব্বা আল্লামা ইয়াহয়া (রহ.)-এর আশ্চর্য একটি ঘটনা রয়েছে। গ্রীষ্মকালে তিনি আছরের সময় মাদরাসা ছুটি হওয়ার পর একটি কূপের নিকট বসে ছাত্রদের বলতেন, আমার ওপর পানি ঢালো। ছাত্ররা তার ওপর শত-শত বালতি পানি ঢেলে দিত। একদিন তাঁর এক সাথি জিজ্ঞেস করল, জনাব, আমাদেরকে অপচয়ের ওয়াজ করেন আর নিজে শত

বালতি পানি ব্যবহার করেন। এটা অপচয় না কি? যেহেতু তিনি সাথি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন. তাই তাকে বললেন, হ্যাঁ এই অপচয় আমার জন্য জায়েয আর তোমার জন্য হারাম।

তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার কারণে আরেকদিন বিনয়ের স্বরে বললেন, জনাব! আপনার ওই দিনের কথা আমি বুঝতে পারিনি? আমার জন্য হারাম আর আপনার জন্য জায়েয হয় কীভাবে একটু খুলে বলুন। তিনি বললেন, তোমরা কূপের নিকট আসার সময় কী নিয়তে আস? বললেন, গোসলের নিয়তে। তিনি বললেন, এজন্যই তোমাদের জন্য পাঁচ বালতির বেশি ব্যবহার করা অপচয়। বললেন, তাহলে আপনি কী নিয়ত করেন? তিনি বললেন, শোনো! আমি অসুস্থ মানুষ। গরম বেশি লাগে। তাই সেই গরম থেকে শীতলতা অর্জনের জন্য আমি কূপে আসি। এবার আমার শরীর শীতল হওয়ার জন্য যত বালতির প্রয়োজন, তত বালতি পানি আমি ব্যবহার করতে পারি। এতে অপচয় হবে না। এটা আমার জন্য জায়েয।

দেখুন, ছোট একটা কাজ। সাধারণ মানুষ করলে এটা অপচয় হয়ে যায় আর একজন আলেম জ্ঞানের দরুন নিয়তের পরিবর্তন করার দ্বারা সেটা জায়েয হয়ে যায়। সুতরাং নিয়ত সংশোধন করা জরুরি।

অন্তরের স্থিরতার মধ্যে সাহায্য আসে কীভাবে?

আচ্ছা ভাই! বলুন তো বিমানে আরোহণের সময় কোন দু'আ পড়তে হয়, এটা কি আমাদের স্মরণ থাকে? কেন থাকে না। কারণ হলো, আমাদের অন্ত র স্থির নেই। এই স্থিরতা আসে শায়খের সান্নিধ্যে। সুতরাং স্মরণ রাখবেন, যেকোনো বাহনে আরোহণ করে নিম্নের দু'আটি পাঠ করা সুন্নত।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার রব অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ ও নেহায়েত দয়ালু।'[১]

তবে লিফটের সুইচ চাপ দেওয়ার সময় তা স্মরণ থাকে না। স্মরণ হবে কোন সময়? শায়খ তোমাকে জানিয়ে দিলে। হজ-ওমরাহ আদায় করতে কত লোক মক্কায় যায়। হারাম শরীফে নামায আদায় করার পর ঘোষণা দেওয়া হয়–

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৪১

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْاَمْوَاتِ

'জানাযার নামায হবে।'

আচ্ছা বলুন তো এ ঘোষণা শুনে কজন اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করে? মৃত্যুর সংবাদ কিংবা যেকোনো বিপদ হলে এ দু'আটি পাঠ করা সুন্নত। কিন্তু সাধারণ লোক তো আছেই অনেক আলেমকে দেখা যায়, এই ঘোষণা শুনেও নিজপথেই হাঁটছেন। এ দু'আটিও পাঠ করছেন না। এর জন্য অন্তরের স্থিরতা দরকার। আর সেটি হাসিল হয় শায়খের সান্নিধ্যে। এতে অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মাশায়েখগণের নিকট ইল্‌মের মূল্যয়ান ও স্তর

মাশায়েখগণের ওপর অহেতুক একটি অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা নাকি ইল্‌ম পছন্দ করেন না। এটা ভুল ধারণা। আমাদের মাশায়েখগণ সবাই ইল্‌মের অলংকারে ভূষিত ছিলেন। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো মাশায়েখ বিশেষ জযবার অবস্থায় ইল্‌ম সম্পর্কে কিছু বলে থাকেন, তাহলে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে এটা সত্য যে, যারা শুধু ইল্‌মকেই যথেষ্ট মনে করেন, তাদের এই ধারণাকে মাশায়েখগণ পছন্দ করেন না। নতুবা আমাদের সকল মাশায়েখই ইল্‌ম শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, জোরালো আদেশ প্রদান করতেন।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেন, যারা কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করে না, আমাদের তরিকায় তারা অনুসরণযোগ্য নয়।

মাকতুবাতে সদীতে বলা হয়েছে, কুরআন-হাদীছের জ্ঞান শিক্ষা না করে এ রাস্তায় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়।

ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন, তাছাওউফের অগ্রনায়ক যারাই ছিলেন, তাঁরা সকলেই কুরআন-হাদীছ ও ফিকহের ক্ষেত্রে শীর্ষে ছিলেন। এই উক্তিটি তালবীসুল ইবলীসে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং জানা গেল, ওই মহামনীষীগণ সুফিয়ায়ে কেরামদের ভালোবাসতেন।

মাশায়েখগণের ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন?

এখানে প্রশ্ন জাগে, মাশায়েখগণের ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন? অনেক সময় দেখা যায়, কিছু বিষয় অনুধান করার যোগ্যতা মানুষের থাকে না। যখন কোনো কিছু বোঝার যোগ্যতা থাকে না, তখন সাধারণ নিয়ম হলো

اَلنَّاسُ اَعْدَاءٌ لِّمَا جَهِلُوْا

'মানুষ যা বোঝে না তার শত্রু হয়ে যায়।'

এজন্যই বড়-বড় মাশায়েখগণের বিরোধিতা করা হয়েছে। যেমন– দেখুন, একটা সময় এমন হয়েছিল যে, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালি (রহ.)-এর রচিত কিতাবগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। পরবর্তী কালে কতিপয় ওলামায়ে কেরাম এসে তাঁর কথাগুলোর ব্যাখ্যা করার পর মানুষের ভুল ধরা পড়ল। আগে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো কেন? তাঁর উক্তির মর্ম অনুধাবন করতে পারেনি তাই।

'কিতাবুশ শেফা'-এর প্রণেতা আল্লামা আয়াজ (রহ.) সম্পর্কে ইহুদি হওয়ার অপবাদ পর্যন্ত আরোপ করা হয়েছে। পরিশেষে যখন তাঁর লেখার মর্ম উদ্‌ঘাটন করা হলো, তখনই কিতাবকে 'শেফায়ে শরীয়ত' বলা হয়েছে। কেননা, নবীজির ব্যাপারে এর পূর্বে এমন কোনো কিতাব রচিত হয়নি।

শায়খ আহমদ কবীর রেফায়ি (রহ.)কে একসময় নাস্তিক ও মুরতাদ পর্যন্ত বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ বলা হয়েছে। কারণ কী ছিল? কারণ হলো, তার কথার মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। কাজেই আসল ব্যাপার হলো, কথা যে বলে, সে-ই তার কথার মূল ভাবার্থ বলতে পারে। এবার যদি অন্য কেউ তার কথা বলে আর আরেকজন শোনে এবং তার কথার ভিন্ন মতলব নেওয়া হয়, তাহলে তো সমস্যা আসবেই। একে আরবি বাগ্‌ধার বলা হয়

تَوْجِيْهُ الْقَوْلِ لِمَا لَا يَرْضٰى بِهِ الْقَائِلُ

'কারো বাণীর এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা করা, যে সম্পর্কে বক্তা সম্মত নয়।' বক্তা বলল, 'বারণ করো; যেতে দিও না'। এখানে যদি উদ্দেশ্য এভাবে নেওয়া হয় যে, 'বারণ করো না; যেতে দাও', তাহলে এতে বক্তার দোষ কোথায়? সুতরাং মাশায়েখে কেরামের ক্ষেত্রে এমন আচরণই করা হয়েছে।

পূত-পবিত্র মাশায়েখে কেরামের পক্ষে প্রতিরোধ

আল্লাহ পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করেছেন, যারা এ সমস্ত পুণ্যাত্মা মনীষীগণের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেছেন। যেমন–

ইবনে জাওযি (রহ.) মাশায়েখগণের শানে 'সাফওয়াতুস সাফওয়াহ' রচনা করেছেন।

আল্লামা শাসসুদ্দীন যাহাবি (রহ.) রচনা করেছেন 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'।

আল্লামা আবদুর রহমান জামি (রহ.) রচনা করেছেন 'নাফাখাতুল উন্‌স'।

আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) রচনা করেছেন 'আখবারুল আখয়ার'।

আল্লামা আবদুল ওহহাব শা'রানি একটি কিতাব রচনা করেছেন 'আততাবাকাতুল কুবরা'। তাতে তিনি সূফিয়ায়ে কেরামের জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার দ্বারা সুফিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সংশয় দূর করেছেন এবং মাশায়েখগণকে অপবাদ থেকে পবিত্র করেছেন। এ ছাড়া তাছাওউফের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন ছিল, আল্লামা মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) এসে সেগুলোর ধুলাবালি আপসারণ করেছেন তাঁর রচিত মাকতুবাত অধ্যয়ন করে দেখুন, বাস্তবিকই তিনি শরীয়ত ও তরীকতের ধারক-বাহক ছিলেন। কিছু দিন পূর্বেকার শায়খ আল্লামা থানবি (রহ.)-এর জীবনী ও রচনা দেখুন। তিনি যাহেরি ইল্‌মের ওপর দুহাজারেরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর লিখিত তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পাঠ করে দেখুন। এর পার্শ্বটীকায় তিনি মাসায়েলে সুলুক বা তাছাওউফসংক্রান্ত মাসায়েল কুরআনের আয়াত থেকে সংগ্রহ করেছেন। এটি পড়লে আপনারা অবাক হবেন যে, বাস্তবেই আল্লাহ তাঁকে মারেফত দান করেছিলেন।

মধ্যম পন্থা

আমাদের তরীকা মধ্যম পন্থার রাস্তা। আমরা ইল্‌মের পেছনে এত ধাবিত হই না যে, মাশায়েখগণকে হিসাবের বাইরে রাখব। আবার মাশায়েখগণের পেছনেও এত বেশি ধাবিত হই না যে, ইল্‌মকে খারাপ মনে করব। উভয়ের সমন্বয়ে আমাদের তরীকা। তাই তো কবি বলেছেন–

در کف جام شریعت در کف سندان عشق

ہر ہوسناکے نہ داند جام وسندان باختن

'এক হাতে শরীয়তের পেয়ালা, এক হাতে হামানদিস্তা (পান ইত্যাদি গুঁড়ো করার পাত্র বিশেষ)। সব সালেকই পিয়ালা ও হামান দিস্তার মূল্যায়ন জানে না।'

সবাই এ-কাজ করতে পারে না। আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দকে আল্লাহ এই নেয়ামত দান করেছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত যারা 'ইল্‌ম সবচেয়ে বড় পর্দা' এই স্লোগান দিয়ে কামেল ওলামায়ে কেরামকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছিল। আমরা তাদেরও সাথি নই, যারা তাছাওউফকে অনারবি ঘোষণা দিয়ে নামাযের নম্রতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্যই আমাদের মাশায়েখগণ হাদীছের মসনদে বসলে আসকালানি, কাসতলানি প্রমুখের রূপ ধারণ করতেন এবং খানকায় বসলে বায়েযীদ বোস্তামি ও জুনায়েদ বাগদাদির অবস্থান গ্রহণ করতেন।

তাছাওউফের উদ্দেশ্য

তাছাওউফের উদ্দেশ্য তিনটি বিষয়। (১) আল্লাহর ভয় (২) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ (৩) নফস ও রিপুর বিরোধিতা। যে-ব্যক্তি এই তিনটি বিষয় অর্জন করেছে, সে তাছাওউফের মাকসাদ অর্জন করেছে। আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে বসলে তা হাসিল হয়। এবার বলুন তো, এই তিনটি বিষয় থেকে শরীয়তের বাইরে কোনটি। একটিও নয়। তাহলে তাছাওউফের বিরোধিতা কেন? হযরত থানবি (রহ.)কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, হুজুর! তাছাওউফের মাকসাদ কী? তিনি অত্যন্ত সুন্দর জবাব দিলেন যে, তাছাওউফের মাকসাদ হলো মানুষের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা থেকে গোনাহের ময়লা অপসারণ করা।

মাশায়েখে কেরামের দরজায় ওলামায়ে কেরাম

বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম মাশায়েখে কেরামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। যেমন– আল্লামা শামি (রহ.) শায়েখ খালিদ রুমি (রহ.)-এর নিকট বাইয়ত হয়েছেন। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) শায়খ মির্জা জানেজানাঁ (রহ.)-এর নিকট বাইয়াত হয়েছিলেন।

হযরত আশরাফ আলী থানবি (রহ.) শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নিকট এবং হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) শায়খ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর নিকট বাইয়াত হয়েছিলেন। লাহোর জামেয়া আশরাফিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব হযরত থানবি (রহ.)-এর নিকট বাইয়াত হয়েছিলেন।

এ ছাড়াও কারী তৈয়্যব সাহেব (রহ.), মুফতী শফী সাহেব (রহ.), হযরত বিন্নুরি (রহ.) ও হযরত জলন্ধরি (রহ.)ও তাঁদের আপন-আপন

শায়খের নিকট বাইয়াত হয়েছিলেন। এটি আমাদের রাস্তা, যাকে আমরা মধ্যম পন্থার রাস্তা বলি। কেন? কারণ, এ তরিকায় আমাদের আমল নসীব হয় এবং আমলের অবস্থা ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

চরিত্রের ওপর অধিক পরিমাণে মেহনত চাই

দেখুন, এক হলো বাঁশ, আরেক হলো আঁখ। নতুন একটা বাঁশ আর একটা আঁখ পাশাপাশি রাখলে দেখতে একই রকম দেখা যায়। কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? একটার মধ্যে মিষ্টি রসে ভরা, আরেকটাতে তিক্ত পানি ভরা। ঠিক তেমনই পার্থক্য হলো তাছাওউফ ও তাছাওউফবিহীন অবস্থার। যারা তাছাওউফ অর্জন করে আমল করে, তারা আখের মতো আর যারা তাছাওউফ শিক্ষা না করে আমল করে, তারা বাঁশের মতো। আপনি যদি সাধারণ একজন শ্রমিককে আপনার বিছানা ঝাড় দেওয়ার জন্য আনেন, তাহলে সে বিছানা ঝাড় দিয়ে চলে যাবে। সে মনোযোগের সাথে কাজ করবে না। পক্ষান্তরে দেখুন, এক প্রেমিক ছিল ফরহাদ। কেউ তাকে বলল, যদি পাহাড় কেটে শিরির বাড়ি পর্যন্ত নদী প্রবাহিত করতে পার, তবে তাকে পাবে। সে কী করল? পাহাড় কেটে নদী জারি করে দিল। এ ছিল আন্তরিক ভালোবাসা।

বর্তমানে আমরা শ্রমিকতুল্য নামায আদায় করছি। অথচ মাশায়েখে কেরাম আমাদের ডাকছেন, এসো ফরহাদতুল্য নামায আদায় করো। আমরা এই উদাসীনতার নামায কত দিন আদায় করব? নিজের অন্তরটা পরিষ্কার করে নাও; তাহলে এরকম নামাযের সৌভাগ্য হবে–

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো যেন তাঁকে দেখছ। যদি এই স্তরে পৌঁছতে না পার, তাহলে এতটুকু মনে রাখো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। তখন তোমার সৌন্দর্য থেকে চরিত্রের ওপর মেহনত বেশি হবে।

মৃত অন্তর অন্তর নয়

আল্লাহ আমাদেরকে অন্তর জাগ্রত করার তাওফীক দান করুন। কোনো কবি বলেন–

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ * کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ

'মৃত অন্তর অন্তর নয়। একে দ্বিতীয়বার জিন্দা করো। এটাই হলো মরা উম্মতের পচা বিমার থেকে নিষ্কৃতির উপায়।'

অন্তর জিন্দা হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে থাকে। কাজেই আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, আমরা কাঁদিও না, কাঁদাইও না। উড়িও না, উড়াইও না। আমরা শুধু ক্রোধান্বিত বন্ধুকে রাজি করিয়ে থাকি। আর আল্লাহ তখনই রাজি হন, যখন মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় সঞ্চারিত হয়। তার আমলের মধ্যে নবীজির সুন্নতের অনুসরণ থাকবে। নিজের নফস বা আত্মার বিরোধিতা থাকবে।

আল্লাহ আমাদের অন্তরে আত্মশুদ্ধির স্পন্দন দান করে দিন। অন্তরে যখন আগুন লেগে যাবে, উদ্দীপনা এসে যাবে, তখন এই রাস্তায় সময় ব্যয় করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হৃদয়ের ব্যাধি দূর করে দিন। আমাদেরকে তাঁর সত্যিকারের ভালো বাসা দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

– ২২তম খণ্ড সমাপ্ত –